নজরুল কাব্যগীতি : বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন

বাঁধন সেনগুপ্ত

এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ :
২০শে জুলাই, ১৯৬০

প্রকাশক :
মজহারুল ইসলাম
নবজাতক প্রকাশন
এ৬৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-৭

মুদ্রক :
শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য্য
ব্লক এণ্ড প্রিণ্টিং কনসার্ন
৫৯এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
খালেদ চৌধুরী

শ্রী ভবেশচন্দ্র সেনগুপ্ত

শ্রীচরণকমলেষু—

প্রকাশকের নিবেদন

বছর আটেক আগে তরুণ গবেষক ডঃ বাঁধন সেনগুপ্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ। এই গবেষণায় তাঁর গভীর উৎসাহের ফলে তিনি শ্রী সেনগুপ্তকে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁরই অনুরোধে আমি এই গবেষণাপত্রটি প্রকাশের ব্যাপারে উৎসাহিত হয়েছিলাম। সেদিন তাঁকে দেওয়া সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পেরে আজ আমি তৃপ্ত।

পশ্চিমবাঙ্‌লার বহু সুধীজন সমন্বিত 'পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমি'র মাধ্যমে আমরাই দীর্ঘকাল আগে প্রথম নজরুল সাহিত্য, কাব্য ও সংগীতের উপযুক্ত প্রচার ও মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছিলাম। সেদিন নজরুলকে অনেক মহলে উপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হোতো না। কিন্তু নজরুল একাডেমির মাধ্যমেই সর্বপ্রথম নজরুলের পুনর্মূল্যায়ন শুরু হয় এবং আজ নজরুল-কাব্যকৃতি ও সংগীতের জনপ্রিয়তা সাফল্যের সর্বোচ্চ সীমাকেও অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। আজ তাঁর কীর্তি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও স্বীকৃত।

ডঃ সেনগুপ্ত নজরুলের কাব্যগীতি সম্পর্কীয় ব্যাপক আলোচনার মাধ্যমে কবির সেই কীর্তি ও সাফল্যের বহুবিধ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে তাঁর মননশীল চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দান করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত প্রথম নজরুল-কাব্য বিষয়ক বর্তমান গবেষণাগ্রন্থটি প্রকাশ করতে পেরে আমরা আনন্দিত।

মজহারুল ইসলাম

ভূমিকা

ডঃ ধাঁধন সেনগুপ্ত 'নজরুলের কাব্যগীতি : বৈচিত্র্য ও মূল্যায়ন' নামক গবেষণা-নিবন্ধটির জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। আজকাল গবেষণা-নিবন্ধ ছাপাবার প্রকাশক পাওয়া যায় না। ডঃ সেনগুপ্তের গবেষণা-নিবন্ধট এই প্রকাশন সঙ্কটের সময় যে প্রকাশিত হচ্ছে তা' বিশেষ আনন্দের বিষয়। সাধারণত গবেষণা নিবন্ধগুলি বহুজ্ঞাত তথ্য এবং নীরস ও অসার পাণ্ডিত্যে পূর্ণ থাকে। কিন্তু মাঝে মাঝে দু'একটি এমন নিবন্ধ দেখা যায় যেগুলি মৌলিক বক্তব্য এবং তীক্ষ্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনাভঙ্গির জন্য স্থায়ী সমালোচনা-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে পড়ে। ডঃ সেনগুপ্তের নিবন্ধটি এই শ্রেণীর গবেষণা নিবন্ধের পর্যায়ে ফেলা চলে। সেজন্য এটি প্রকাশিত হ'লে বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন রূপেই স্বীকৃত হবে বলে আমি মনে করি।

ডঃ সেনগুপ্ত তার গবেষণার জন্য যে বিপুল তথ্যসম্ভার সংগ্রহ করেছিলেন তা সম্পূর্ণভাবে তিনি তাঁর নিবন্ধে ব্যবহার করতে পারেন নি। বাংলা দেশে নজরুল সাহিত্য নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে। ডঃ সেনগুপ্ত দীর্ঘকাল বাংলা দেশে থেকে সেই সব গবেষণা বিষয়ক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন। নজরুলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের কাছ থেকেও তিনি অনেক মূল্যবান সংবাদ পেয়েছেন। নজরুল গীতির গায়ক-গায়িকাদের কাছ থেকেও তিনি বহু উপাদান লাভ করেছেন। তাঁর ধৈর্য, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় সত্যই প্রশংসনীয়।

লেখক নজরুলের কাব্যবিচারে কবিজীবনের বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করেছেন। সেজন্য এ-গ্রন্থে কবির জীবন বিশ্লেষণ ও কাব্যবিচার পরস্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়ে পড়েছে। কবির রচনা থেকে তিনি এত বেশি তথ্য দিয়েছেন যে মাঝে মাঝে তাঁর রচনা একটু বেশি তথ্য কন্টকিত বলে মনে হয়। বহু জায়গায় তিনি দেশী ও বিদেশী কবিদের সঙ্গে নজরুলের তুলনা করেছেন। সেই সব অংশে তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও প্রখর বিচারশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। নজরুলকাব্যের শুধু তাত্ত্বিক আলোচনা নয়, তার ভাষা, সুর, ছন্দ, চিত্রকল্প ও প্রতীক প্রয়োগের দিক গুলি নিয়ে তিনি বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি বিদগ্ধ মহলে প্রশংসিত হবে, এ-বিশ্বাস আমার আছে।

অজিতকুমার ঘোষ

লেখকের নিবেদন

সাহিত্যের গবেষণায় আমাদের দেশে সুদূর অতীতের প্রতি বিশেষ এক প্রবণতাব প্রাধান্য নিরন্তর বর্তমান। প্রধানতঃ অতীতের ধূসর কোনো অধ্যায়ের প্রতি সেই কারণেই গবেষকদের দৃষ্টি মূলতঃ সীমাবদ্ধ থাকে। ফলে গবেষণা কর্মের পরিধি অনেকাংশেই সংকুচিত। সেই তুলনায় আধুনিক মানসের লক্ষণযুক্ত কোন কবিকৃতি, নবীন গবেষকদের যা সাগ্রহে মর্যাদা পাবার যোগ্য তার প্রতি অনীহা সেই কারণেই ক্রমবর্ধমান। আসলে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নবীন গবেষকগণ নিজস্ব মৌলিক ভাবনা চিন্তার মর্যাদা বা স্বীকৃতিলাভে ব্যর্থ হবার সম্ভাবনায় আশংকিত হয়ে অতীতের দিকে চোখ ফেরাতে বাধ্য হন।

বর্তমান লেখকের ক্ষেত্রেও এই অভিজ্ঞতার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালযে এই গবেষণার প্রাথমিক পর্ব সমাপ্ত হবার পর বিভিন্ন কারণে এবং প্রধানতঃ দর্শনাচার্য ডঃ সরোজকুমার দাস এম. এ, পি. আর. এস., পি, এইচ, ডি (লণ্ডন) ও তাঁর ছাত্রী রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালযের তৎকালীন উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী'র আগ্রহাতিশয্যে গবেষণা কর্মটি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সম্পাদিত হয়। সুখের কথা, বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও কাজী নজরুল ইসলামের কবিকৃতি স্বীকৃত ও সম্মানিত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের বর্তমান বিভাগীয় প্রধান ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি এই গবেষণা পত্রেরও অন্যতম পরীক্ষক, গবেষণার ক্ষেত্রে তিনি নতুন দিগন্তের অনুসন্ধানী হিসেবে সুপরিচিত। যোগ্যতা সম্পন্ন নবীন পরিশ্রমী গবেষকদের কাছে এটি নিঃসন্দেহে সুসংবাদ।

নজরুলের কবিকৃতি বিষয়ক গবেষণার সম্ভাব্যতাকে সর্বপ্রথম স্বীকৃতি জানিয়েছিলেন ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত। পরবর্তীকালে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ও এ বিষয়ে অনুরূপ উৎসাহ জ্ঞাপন করেছিলেন। অথচ, চল্লিশোত্তর কাল থেকেই কাজী নজরুল ইসলাম জীবিত কবিদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। তাঁর কাব্যপ্রতিভা এবং কাব্যিক সাফল্য নিঃসন্দেহে সুদীর্ঘকাল ধরে সুপ্রতিষ্ঠিত। মাত্র বাইশ বছরের সুবিশাল কবিকৃতি পাঠকের কাছে আজ বিস্ময়ের বস্তু। পাশাপাশি, সাহিত্যের আঙিনায় একদা অনেকে জনপ্রিয় হয়েও সময়ের নিরিখে

আজ তাঁদের কীর্তি ধূসর হয়ে এসেছে। কিন্তু যে সব কবিকৃতি সময়ের গণ্ডী পেরিয়ে দেশ বিদেশের পাঠকমনে স্থায়ীভাবে শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত নজরুল ইসলাম তাঁদের অন্যতম। এই গ্রন্থে প্রধানতঃ নজরুলের কাব্যগীতির শ্রেষ্ঠত্ব ও সাফল্যের বিভিন্ন কারণ ও তার ব্যাখ্যাই প্রাধান্য পেয়েছে। উপরন্তু, সামগ্রিক আলোচনার স্বার্থে সমগ্র নজরুল কাব্যচেতনা, জীবন ও ব্যক্তি মানসের বহুবিধ গতি-প্রকৃতির সংবাদও এই গ্রন্থে অনুপস্থিত নয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, এ জাতীয় গবেষণার ক্ষেত্রে নজরুলের পূর্ণাঙ্গ জীবনী বিষয়ক প্রামাণ্য পুস্তক ও দলিল পত্রের অভাব নিঃসন্দেহে পীড়াদায়ক। কবি জীবনের অস্থিরতা, অনিয়ম ও উচ্ছ্বাস-প্রাবল্যের ফলশ্রুতি হিসেবেই সম্ভবতঃ এমনটি ঘটেছে। অন্যদিকে,অধিকাংশ জীবনী গ্রন্থই আবেগে পরিপূর্ণ ও লেখকদের ব্যক্তিবিষয়ক ঘটনার প্রাধান্যে পীড়িত; এবং ফলতঃ সেগুলি প্রকৃত জীবনী হিসেবে অসম্পূর্ণ। তবুও যে দুটি গ্রন্থ এ জাতীয় ত্রুটি থেকে অনেকাংশে মুক্ত সেগুলি হোলো, 'কাজী নজরুল স্মৃতিকথা' (মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ) ও 'কাজী নজরুল' (প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়)। এছাড়া, নজরুল বিষয়ক এ পর্যন্ত প্রকাশিত অজস্র গ্রন্থের মধ্যে প্রধানতঃ 'নজরুল চরিত মানস' (ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত) ও 'বাংলা সাহিত্যে নজরুল' (আজাহারউদ্দীন খান) গ্রন্থ দুটি এই গবেষণার কার্যে যথেষ্ট সহায়ক বলে মনে হয়েছে।

বর্তমান লেখকের মতে, যেহেতু এটি নজরুল কাব্যবিষয়ক সামগ্রিক আলোচনার প্রথম প্রয়াস, সেইজন্যে এই গ্রন্থ প্রণয়নে যথেষ্ট আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও এটিকে পুরোপুরি ত্রুটি মুক্ত বা স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা বলে দাবী করার কোনো কারণ নেই। বরং এ সম্পর্কে যে কোনো গঠনমূলক প্রস্তাব ও পরামর্শ অথবা নতুন কোনো সূত্রের সংবাদ পেলে তা সাদরে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী সংস্করণে তাঁর স্বীকৃতি শ্রদ্ধার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখিত হবে।

বর্তমান গ্রন্থটি বছর দুই আগে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত লেখকের নজরুল বিষয়ক গবেষণাপত্র। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ-এর (কলা বিভাগের সর্বাধ্যক্ষ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) নির্দেশনায় সম্পাদিত এই গবেষণাপত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পি. এইচ. ডি. সম্মানপত্রের দ্বারা স্বীকৃত। ডঃ অজিতকুমার ঘোষ সমেত এই গবেষণাপত্রের অন্য দুইজন পরীক্ষক ছিলেন যথাক্রমে ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বাংলা বিভাগীয় প্রধান, কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়) এবং ডঃ ভূদেব চৌধুরী (বাংলা বিভাগীয় প্রধান, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন)। ডঃ অজিতকুমার ঘোষের সুচিন্তিত মতামত সম্বলিত ভূমিকাটি এ গ্রন্থে ব্যবহার করতে পেরে আমি গর্বিত।

নজরুল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল প্রায় দেড় শত ব্যক্তির সঙ্গে আমি যোগাযোগ করেছিলাম। এঁদের মধ্যে অনেকেই নজরুলের দীর্ঘদিনের বন্ধু, সঙ্গী অথবা স্নেহভাজন হিসেবে সুপরিচিত। তাঁদের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেছি, বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেছি এবং নজরুল কাব্যের বহুবিধ সম্ভাবনা ও সাফল্য নিয়ে আলোচনা করেছি। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই সাগ্রহে আমার অজস্র প্রশ্নের সাধ্যমতো উত্তর দিয়েছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে মূল্যবান অনেক সূত্রের সন্ধানও এঁদের কাছ থেকে পেয়েছি। কেউ কেউ তাঁদের মূল্যবান ব্যাক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকাদির সদ্ব্যবহারের যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন বহুদিন ধরে। নজরুলের কোনো কোনো রচনার মূল পাণ্ডুলিপি, পত্রাবলী, এখনো অপ্রকাশিত কয়েকটি রচনার মূল প্রতিলিপি, গান ও গানের স্বরলিপি কেউ কেউ শর্তাধীনে দেখার সুযোগ দিয়েছিলেন। অনেকে কাজীর নির্দেশিত স্বরচিত গানের দুঃস্প্রাপ্য রেকর্ড (যা গ্রামাফোন কোম্পানী স্বয়ং নজরুলের অনুরোধে আজ পর্যন্ত প্রকাশ করেননি) আমাকে দেখবার ও শোনবার সুযোগ দিয়েছিলেন। এঁদের সকলের কাছে আমি ব্যাক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ।

প্রারম্ভে এই গবেষণাকর্মে সবচেয়ে বেশী প্রেরণা ও সাহায্য দান করেছিলেন কাজীর সুদীর্ঘকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুহৃদ শ্রদ্ধেয় মোজাফ্‌ফর আহ্‌মদ। তাঁর মৃত্যুর আগের পাঁচটি বছর আমি এ কাজের সূত্রে তাঁর কাছে অসংখ্যবার গিয়েছি এবং আলোচনা করেছি। তিনি আশীত্তীর্ণ বয়সের ভার সত্বেও আমায় সব সময় নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। এছাড়া, তাঁর ব্যাক্তিগত পুস্তক সংগ্রহ-শালা থেকেও তিনি হাসিমুখে অসংখ্য মূল্যবান পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা ব্যবহারের সুযোগ দিয়েছিলেন দীর্ঘকাল ধরে। এমন কি মৃত্যুর আগের সপ্তাহেও কিম্বার নার্সিং হোমের কেবিনে শুয়ে শুয়ে এই গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে তিনি সোৎসাহে খোঁজখবর নিয়েছিলেন। তাঁর প্রতি আমার ঋণ অপরিশোধ্য।

অন্যদিকে, কাজীর একান্ত স্নেহভাজন সংগী আমার অন্যতম শুভাধ্যায়ী যিনি নজরুলের প্রথম জীবনীকার হিসেবে পরিচিত সেই প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রায় সব বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ পেয়ে আমি ধন্য। নজরুল বিষয়ক তাঁর ঈর্ষাযোগ্য ব্যাক্তিগত সংগ্রহশালা থেকে তিনি অনেক পুস্তক

ব্যবহারের অনুমতি সানন্দে দান করেছিলেন। তাঁর কাছেও আমি চির কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকালে দেশী বিদেশী অসংখ্য দুঃপ্রাপ্য বইপত্র দিয়ে এবং প্রথমাবস্থা থেকেই যিনি অনেক বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে নানাভাবে আমায় সাহায্য করেছেন তিনি হলেন এ কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি শ্রী বিষ্ণু দে। বিশেষ করে ক্রবাদরদের গীতিকবিতা সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমি যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি।

এছাড়া' নজরুল সম্পর্কে যারা সস্নেহে আমায বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায, পরিমল গোস্বামী, গোপাল হালদার, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায, বুদ্ধদেব বসু, প্রতিভা বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ সরোজকুমার দাস, কিশোরীচরণ দাশ (উড়িষ্যা), বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অধ্যাপক রঘুবীর চক্রবর্তী, মৃণাল সেন, কল্পতরু সেনগুপ্ত, সমরেশ বসু, সৈয়দ শাহেদুল্লাহ্, ডঃ জিষ্ণু দে, বিশ্বরঞ্জন সান্যাল, নচিকেতা ভরদ্বাজ, কাজী সব্যসাচী ও কাজী অনিরুদ্ধ।

নজরুলের গীতিকবিতা এবং সংগীত প্রতিভার বহুবিধ বৈচিত্র্য নিয়ে যাঁদের মতামত আমাকে এই গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেছে তাঁদের মধ্যে আছেন শ্রদ্ধেয় রাইচাঁদ বড়াল, শ্রীমতী ইন্দুবালা দেবী, শ্রীমতী আঙ্গুরবালা দেবী, শ্রীমতী কমলা ঝরিযা, শ্রীমতী রাধারানী দেবী, কমল দাশগুপ্ত, শ্রীমতী সুপ্রভা সরকার, ফিরোজা বেগম, অনিল বাগচী, সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায়, সুশীল চট্টোপাধ্যায় (যিনি দুঃপ্রাপ্য নজরুল গানের দুটি রেকর্ড আমায় দান করেছেন), বিমান ঘোষ, শ্রীমতী গৌরী বসু, দিলীপ সেনগুপ্ত (আকাশ বাণী, কলকাতা) ও দেবব্রত বিশ্বাস।

নতুন দিল্লী (করোল বাগ) প্রবাসী সুনীলকুমার বসু সাগ্রহে তাঁর পরলোকগতা ভগিনীর কণ্ঠের একখানি রেকর্ড (আজো যা অপ্রকাশিত) দিল্লীতে অবস্থানকালে আমায় শোনার সুযোগ দিয়ে ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।

গবেষণা পত্রটি সুসম্পাদনের উদ্দেশ্যে আমাকে ঢাকায় (বাংলাদেশ) যেতে হয়েছিল। সেখানে অবস্থানকালে যাঁরা আমাকে পরামর্শ ও পত্র-পত্রিকা দিয়ে নানাভাবে উপকৃত করেছিলেন তাঁদের ঋণ ভোলার নয়। এঁদের মধ্যে আছেন কাজীর অন্যতম সঙ্গী অধ্যাপক মোতাহার হোসেনের কন্যা সুগায়িকা সন্‌জিদা খাতুন, আহ্‌মদ ছফা, সেলিনা হোসেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ তালিম হোসেন, হবিবুল্লাহ্, শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ, রফিকুল ইসলাম, কবি শামসুর

রাহমান, ফজল-এ খোদা, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, বদরুদ্দীন উমর, সস্ত্রীক শিকদার আমিনুল হক, এবং সুপরিচিত নজরুল বিশেষজ্ঞ আবদুল কাদির।

নৈহাটী ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র কলেজের অধ্যাপক সুসাহিত্যিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় কিছু পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক দিয়ে সাহায্য করা ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে তাঁর সুচিন্তিত মতামত দিয়ে আমায় উপকৃত করেছেন।

প্রস্তুতিপর্বে দেবপ্রসাদ চক্রবর্তী, ভবেন পাল, অম্বিকাপ্রসাদ সাহা, সমিতকুমার বসু, তরুণ চট্টোপাধ্যায়, ঝর্ণা সাহা, মনীন্দ্রচন্দ্র দাস, মিতালী বর্ধন, জয়ন্তী দত্ত (নিয়োগী), শ্যামল সাহা, কুমকুম দাশগুপ্ত, সুজিত দত্ত, রামগোপাল গোস্বামী, প্রবীর বিশ্বাস ও পরিতোষ দাস নানাভাবে সাহায্য করায় আমি এঁদের প্রতি কৃতজ্ঞ।

গ্রন্থটি রচনাকালে ন্যাশনাল লাইব্রেরী (কলকাতা), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, নৈহাটী বঙ্কিম পাঠাগার, আনন্দবাজার ও দেশ পত্রিকা পাঠাগার (জ্যোতিষ দাশগুপ্তের সৌজন্যে), হালিসহর রামপ্রসাদ লাইব্রেরী, ট্রেজারী বিল্ডিংস ইন্‌সটিটিউট পরিচালিত গ্রন্থাগার (কলকাতা) ছাড়াও বাংলাদেশে ঢাকার বাংলা একাডেমি, নজরুল একাডেমি ও বুলবুল একাডেমি বিভিন্ন ব্যাপারে আমাকে সহযোগিতা করেছেন।

নজরুলের কয়েকটি অপ্রকাশিত গানের প্রথম লাইন ও তার স্বরলিপি ব্যবহারের অনুমতি দিয়ে কবির অন্যতম সহযোগী চিত্ত রায়ের পুত্র রতনকান্তি রায় ও কন্যা উমা রায় আমায় কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন।

পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে কবির সঙ্গী নলিনীকান্ত সরকার পত্রযোগে বিভিন্ন সময়ে আমার বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর প্রতি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি।

প্রীতিভাজন শ্রীমান সুব্রত মুখোপাধ্যায় তার ব্যাক্তিগত সংগ্রহ থেকে নজরুলের নিজের কণ্ঠে পরিবেশিত স্ব-রচিত হাসির নক্সার তিনটি রেকর্ড 'প্রীতি উপহার' যা এখন কোথাও পাবার সম্ভাবনা খুব কম তা শোনার সুযোগ আমায় দিয়েছেন।

গ্রন্থের প্রচ্ছদটি সযত্নে অঙ্কিত করে খ্যাতনামা শিল্পী খালেদ চৌধুরী নিঃসন্দেহে গ্রন্থটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন। অভিজ্ঞ কালীপদ দাস প্রুফ সংশোধনের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করে আমায় সাহায্য করায় আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে নজরুল বিষয়ক বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত প্রথম গবেষণাপত্রটি প্রকাশ করার দায়িত্ব ও ঝুঁকি গ্রহণ করে নবজাতক প্রকাশন-এর কর্ণধার বন্ধুবর মজহারুল ইসলাম আমাকে সম্মানিত করেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানানো অনাবশ্যক। কেননা, এ জাতীয় কাজে তাঁর অনুরাগ ও দুঃসাহস কারো অজানা নয়।

সর্বোপরি, প্রীতিভাজন সমীর সেনগুপ্ত ও করুণাপ্রসাদ দে এই গ্রন্থের নির্ঘন্ট সোৎসাহে প্রস্তুত করে দিয়ে তাদের সাহিত্য প্রীতির পরিচয় দান করেছেন। তাদের জানাই আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নিষ্ঠাবান কর্মী পরম পূজনীয় পিতৃদেবকে আমার প্রথম প্রকাশিত এই গ্রন্থটি উৎসর্গ করতে পেরে আমি ধন্য।

গ্রন্থটি অগণিত নজরুল দরদী পাঠকবৃন্দের কাছে আদৃত হলেই আমার এই প্রচেষ্টা সার্থক হয়েছে বলে মনে করব। ধন্যবাদান্তে,

সূচীপত্র

পূর্বভাষ

কবির কাব্য রচনার মূলে প্রায় সব ক্ষেত্রেই কিছু কিছু অজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সেইসঙ্গে অসংখ্য জিজ্ঞাসা আর রহস্যের প্রস্তুতি কবির মনে নীরবে কাজ করে যায়। গভীর অনুসন্ধিৎসার ফলে কোনো কোনো স্থলে ধরা পড়ে তাঁর অন্তহীন উৎসের ক্ষণিক আভাস। আবার ওই প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কবিরা অজ্ঞাত নয় বলেই কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ করে ভাবনার দিক থেকে তাঁরা প্রায়শঃই বহুমুখী দ্বন্দ্বের শিকারে পরিণত হন। জীবনের অন্তহীন রহস্যকে যিনি বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করেন তিনিও এই সম্ভাবনা থেকে কখনো পুরোপুরি মুক্তি পান নি। এমন কি স্থিতপ্রজ্ঞ এলিয়টকেও* একদা তা স্বীকার করতে হয়েছে। যদিও এর মধ্যেই কবিকে খুঁজে পেতে হয় স্ব-আবিষ্কৃত শুচি স্নিগ্ধ, অনুভবগ্রাহ্য, সামাজিক চৈতন্যমিশ্রিত ভিন্ন এক আনন্দ। এই আনন্দের আকর্ষণই সকল কবির সমগ্র প্রেরণার উৎস।

নজরুলের কাব্যধারার গতি-প্রকৃতি আলোচনা বা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পাঠককে কবি-প্রকৃতির এই ঐতিহ্যের কথাটি মনে রাখতে হবে। ব্যক্তিগত জীবনের গতিপ্রকৃতির ধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে কবির কাব্যচিন্তা তথা মানসিকতার বিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ফলে কবির সামগ্রিক কাব্যপ্রয়াসকে বিশ্লেষণ করার পূর্বে স্বভাবতঃই তাঁর বহু বিচিত্র মানসিকতার কথা স্মরণে রাখা উচিত।

* 'কবিরা কখনও কখনও কবিতা আরম্ভ করতে গিয়ে টের পেয়ে যান যে তাঁর জ্ঞানে ও অজ্ঞানে এমন একটা কিছু ঘটেছে এবং সেটার বাইরে গঠন পাবার, মূর্ত হয়ে আসার চাপটাও বোধ করেন। তিনি হয়তো তখনও সম্যক জানেন না সেটা ঠিক কি ব্যাপার ঘটছে, যদিচ তার প্রস্তুতি হয়েছে তাঁরই মনে। কিন্তু শেষ অবধি যে কবিতা তিনি রচনা করে বসেন, তাঁর সে কবিতাই তাঁকে একটা মুক্তির লঘিমা বেঁধে দেয়, শিশু যেমন মাতাকে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে সেই কবিতাই হয়তো প্রকাশ করে সেইসব আশা-আকাঙ্ক্ষাকে বা উদ্বেগ-ভয়, সেইসব সংশয় বা আস্তিক অনুভব যাতে তিনি সচেতন—অচেতনভাবেই অংশীদার বৃহৎ মানবসমাজের সঙ্গে এবং দেশের মানুষের সঙ্গে চৈতন্যে ক্রমান্বয়ে উত্তীর্ণ।'

—টি. এস. এলিয়ট। (অনুবাদ—বিষ্ণু দে)

বাল্যকালে চুরুলিযায দু'বছরে (১৯১১-১২) কয়েকটি পালাগান রচনা এবং পরবর্তী কালে প্রায় বাইশ বছরের নিয়মিত কাব্যচর্চার মধ্যে বিচিত্রমুখী মানসিকতা এবং পরস্পর বিপরীত মুখী প্রয়াসের ব্যাপ্তি তাঁকে অন্যান্য কবির তুলনায় পৃথকত্ব দান করেছে। লক্ষণীয়, সমসাময়িক কবিদের মধ্যে এই বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। সামগ্রিকভাবে এই আপাত দ্বন্দ্বমধুর প্রবণতার মধ্যে নজরুলের সুতীব্র নান্দনিক প্রকৃতি তাই সহজেই অনুভব করা যায়।

আলোচনার সুবিধার্থে নজরুলের সমগ্র কবিকর্মকে প্রাথমিকভাবে চারটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতিগত দিক থেকে নিঃসন্দেহে এই পর্বগুলি ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে পবিপূর্ণ।

প্রথম পর্ব ॥ রচনাব উন্মেষকাল (১৯১১-১৯২০)। এই পর্বে বাল্যকালেব কাব্যরচনার অনুশীলন, পালানাটক রচনা এবং মার্চ ১৯২০ খৃঃ অর্থাৎ সৈন্যবাহিনী থেকে ফিরে আসার আগে সৃষ্ট রচনাগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয পর্ব ॥ জাগরণের কবিতা বা উজ্জীবনী কবিতা রচনার কাল (এপ্রিল ১৯২০ ১৯৩০) 'বিদ্রোহী' এই পর্বের অন্তর্গত। বলতে গেলে নজরুলের কাব্যজীবনের পরিচিতি এবং প্রচার এই সময়েই ছিল সর্বাধিক।

তৃতীয় পর্ব ॥ গীতিধর্মী কবিতার কাল। এই পর্বের (১৯৩১-১৯৩৪) সৃষ্টি-প্রাচুর্যে, বৈচিত্র্যধর্মী কবিকৃতির সাফল্য নজরুলের করায়ত্ত হয়েছে। সামগ্রিক বিচারে তাঁর প্রতিভার এইটিই শ্রেষ্ঠতম পর্যায়।

চতুর্থ পর্ব ॥ কাব্যিক প্রয়াসের শেষ অধ্যায় (১৯৩৫-১৯৪২ জুলাই) এই পর্ব কবির হতাশা, ব্যর্থতা, ও বহুমুখী প্রচেষ্টা এবং স্ব-বিরোধিতার পরিপূর্ণ। সাধনা ও তন্ত্রবাদ প্রভাবের পাশাপাশি লুপ্তপ্রায় রাগ-রাগিণী উদ্ধারের প্রচেষ্টা এই পর্বেরই অন্তর্গত। এই অধ্যায়ের শেষেই কবিজীবনের বেদনাময় পর্যায়ের সূচনা।

॥ প্রথম পর্ব : রচনার উন্মেষকাল ॥

নজরুলের প্রথম স্বীকৃত কবিতা 'রাজার গড়' এর রচনাকাল বারোই এপ্রিল ১৯১৭।* এর আগে শিয়ারশোল রাজ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের দুজন শিক্ষকের বিদায় সম্বর্ধনা উপলক্ষে তিনি আরো দুটি কবিতা রচনা করেছিলেন। প্রথমটিতে

* শৈলজানন্দের মতানুসারে।

তাঁর নামোল্লেখ না থাকলেও কৌশলে (১৬ই জুলাই ১৯১৬) কবিতাটির প্রথম লাইনগুলোর প্রথম অক্ষরটিতে নিজের নামটি ঢুকিয়ে দেন। দ্বিতীয়টি ঐ স্কুলের শ্রীযুক্ত হরিশঙ্কর মিশ্রের বিদায় উপলক্ষে রচিত অভিনন্দনপত্র। অবশ্য এরও আগে একেবারে বাল্যকালে (১৯০৯-১২) চুরুলিয়াতে 'লেটো'র দলে থাকাকালীন তিনি অনেকগুলি গীতি সম্বলিত নাটক বা পালাগান রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে 'মেঘনাদ বধ', 'শকুনি বধ', 'চাষার সঙ্', 'দাতাকর্ণ', 'রাজপুত্র', 'কবি কালিদাস' ও 'আকবর বাদশা', উল্লেখযোগ্য। এর অধিকাংশই মূলতঃ প্রহসন জাতীয় রচনা। এই পালাগানের মধ্যে রামপ্রসাদী, বাউল ও মারফতীর প্রাধান্য সুপরিস্ফুট। ওস্তাদ গোদার প্রভাব কবির এই সময়ের রচনায় উল্লেখযোগ্যভাবে ঘটেছে।

নজরুলের জীবনের প্রথম পর্বের রচনায় গ্রাম্য কথকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। ওই সময় অধিকাংশ কবিতা প্রাথমিক অবস্থায় মুখে মুখে সৃষ্ট হয়ে প্রথমেই গানের আসরে পরিবেশিত হয়েছে। প্রধানতঃ পিতা কাজী ফকির আহ্‌মদের মৃত্যুর পর (নজরুলের বয়স তখন আট বৎসর) কবি সেগুলি রচনা করেছিলেন। এই পর্বে বিশেষ করে ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে বর্ণনাত্মক কবিতাগুলির মধ্যে ব্যঙ্গ-কৌতুক এবং দেবদেবীর আখ্যান মাহাত্ম্য প্রাধান্যলাভ করেছে। এছাড়া, 'চাষার সঙ' (ডাকসুরার গান) এর কবিতাগুলিতে এর পাশাপাশি বাল্যকালের সুফী ফকিরের নির্দেশিত মুসলিম ধর্ম প্রভাবিত মরমিয়াবাদের প্রভাব লক্ষণীয়। সাম্প্রদায়িকতাহীন সহজ সরল সমন্বয়বাদের কল্পনা এই কবিতাগুলির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। প্রায় শতাব্দীকাল পূর্বে প্রয়াত হাজী পালোয়ানের প্রভাবের ফলে বালক কবির ভাবনায় সাধনোচিত আর্তিই এই সব কবিতার প্রধান বিষয়বস্তু। বালক বয়সে কবি 'সালেক' পন্থী হলেও পরবর্তীকালে ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে 'মজ্জুব' পন্থী হবার সম্ভাবনাও এই সময়ের কোন কোন কবিতায় আভাসিত। কবির ধর্মভীরু শিশুসুলভ ভক্তি-রসাশ্রিত আবেগ প্রাধান্যই এই সমস্ত কবিতায় প্রেরণার উৎস। এছাড়া, 'চাষার সঙ্'-এর* গীতিধর্মী কবিতার মধ্যে প্রকাশ রীতির দিক থেকে রামপ্রসাদের ভক্তি-বাদ এবং সেইসঙ্গে লোকসঙ্গীতের দেহতত্ত্ব ভণিতার যুগপৎ সংমিশ্রণ ঘটেছে। লক্ষণীয় যে,

* ঘাটতোড় নজরুল একাডেমি (লাভপুর) বীরভূম 'চাষার সঙ'-এর অনেকগুলি গান উদ্ধার করেছিলেন। এ ছাড়া আয়ুবশাহী ঢাকার কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের প্রচেষ্টা প্রসঙ্গত স্মর্তব্য।

এই সময় থেকেই কবি উনবিংশ শতাব্দীর ব্যঙ্গ-প্রীতি সুলভ সামাজিক অভিমতের দ্বারা প্রভাবিত হতে সুরু করেছিলেন।* উপরন্তু ব্যঙ্গভাবনায় গুপ্ত কবির প্রভাব এবং ইংরেজী-বাংলা মিশ্রিত শব্দের ব্যবহারের মাধ্যমে ব্যঙ্গ-রচনার প্রয়াস এই সময় থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বেই কবির 'রাজপুত্র' পালাগানের মধ্যে একাধারে কবির স্বদেশচেতনা তথা স্বদেশ প্রীতির প্রাধান্য এবং ভাবনার উন্মেষ ঘটে। অবশ্য এই পর্বের প্রথম অংশের রচনাগুলি নানা কারণে সাধারণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়নি। সম্প্রতি কিছু কিছু জীবনীকারের কৌতুহল ও প্রচেষ্টার ফলে এই পালাগানের অংশ বিশেষ উদ্ধার সম্ভব হয়েছে।

কবির প্রথম প্রকাশিত কবিতা 'মুক্তি' এই পর্যায়ের শেষ দিকে প্রকাশিত (১৯১৯, জুলাই, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা)। এটি কবি ডাকযোগ ৪৯ নং বাঙালী পল্টনের হেড কোয়ার্টার 'গনজা লাইন'এ থাকাকালীন "(করাচীর উপকণ্ঠে বর্তমানে আবিসিনিয়া লাইন) প্রেরিত। ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসে জনৈক দরবেশের মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই কবিতাটি রচিত।

এই পর্বের অধিকাংশ কবিতায় কাব্যিক উৎকর্ষ যথাযথ প্রতিফলিত হয় নি। বস্তুত: কবির রচনায় এই উন্মেষ পর্বটি সেইদিক থেকে কাব্য অনুশীলনের সাধনাতেই বিশেষভাবে নিয়োজিত।

॥ দ্বিতীয়পর্ব : জাগরণের কবিতা বা উজ্জীবনী কবিতা রচনার কাল ॥ (১৯২০-১৯৩০)

এই পর্বটি বিভিন্ন কারণে নজরুলের কাব্যধারার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে সৈন্যবাহিনী থেকে** ফিরে আসা প্রাণ প্রাচুর্য এবং অপরদিকে কাব্য-সাধনায় পাকাপাকি নিয়োজিত হবার বাসনা বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে নতুন দিগ্-দর্শনের দ্যোতক। বহুবিচিত্র রাজনৈতিক ঘটনা সমূহের প্রভাবে ওই সময় কবির কাব্যভাবনার বিস্তৃতি ঘটে। এই পর্বে নজরুলের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা' কার্তিক ১৩২৯ (১৯২২) প্রকাশিত হয়। এই পর্যায়ে যে সব

* 'উনবিংশ শতাব্দীর তর্জা-পাঁচালীর অনুকরণে নজরুল আরবী, ফারসী, উর্দু, বাংলা ইংরেজীর মিশ্রণে আসরে প্রতিপক্ষের উদ্দেশে কিছু ব্যঙ্গ-গীতি রচনা করেছিলেন'— —রফিকুল ইসলাম (নজরুল জীবনী, পৃঃ ১৩)

** বাঙালী পল্টনে জনৈক পাঞ্জাবী মৌলবীর কাছে কবি ফারসী শিক্ষালাভ করেন এবং সেই সময় হাফিজের রচনার সঙ্গে পরিচয় হয়।

কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তা হোলো। যথাক্রমে—অগ্নিবীণা (১৯২২), দোলনচাঁপা (১৯২৩), ভাঙার গান (১৯২৪), বিষের বাঁশী (১৯২৪), ছায়ানট (১৯২৫), পূবের হাওয়া (১৯২৫) চিত্তনামা (১৯২৫), সাম্যবাদী (১৯২৫), সিন্ধু হিন্দোল (১৯২৬), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), বুলবুল (১৯২৮), চোখের চাতক (১৯২৯), চক্রবাক (১৯২৯), সন্ধ্যা (১৯২৯), প্রলয়শিখা (১৯৩০), চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০), নজরুল গীতিকা (১৯৩০), রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০)। একটি অনুবাদ গ্রন্থ একটি ধর্মীয় কাব্য ও দুইটি শিশু কাব্যগ্রন্থ সমেত মোট ২২টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে এই পর্বের রচনার ব্যাপ্তি এবং প্রবণতা সবিশেষ লক্ষনীয়।

সামাজিক এবং রাজনৈতিক পটভূমিকার উপর নজরুলের এই পর্বের কবিতাগুলি প্রতিষ্ঠিত। ১৯২০ সালে কবির 'নবযুগ'* সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনার মাধ্যমেই কবি রাজনৈতিক ঘটনাসমূহের সংস্পর্শ লাভ করেন। দেশের যুবসমাজকে (হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে) উদ্বুদ্ধ করার প্রেরণায় কবি ঐ পত্রিকায় অসংখ্য উজ্জীবনী কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে সমগ্র ভারতে বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাব এবং বাংলাদেশের বিপ্লবী আন্দোলন কবিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। অন্যদিকে অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব এড়িয়ে চলাও কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইতিপূর্বে জালিয়ানওয়ালাবাগের স্মৃতি, ইংরেজের কথার খেলাপ, প্রথম মহাযুদ্ধের সৈনিকদের সঙ্গে ইংরেজদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে কবি স্বভাবতঃই শাসকশ্রেণীর প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ ভাব পরিপোষণ করতেন। সে সময় দেশের জাতীয় আন্দোলনের (১৯২২) যুগসন্ধিক্ষণে 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের প্রকাশ ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা। একদিকে ইংলণ্ডের মজুরশ্রেণীর মুখপত্র 'ডেইলি হেরাল্ডের' কল্পনাপ্রসূত চিন্তার প্রকাশ 'নবযুগ', অপরদিকে 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থের 'বিদ্রোহী' সহ মোট বারোটি উদ্দীপনাময় কবিতা কবিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণের কাছাকাছি নিয়ে এল। কবিতার মাধ্যমে কবি স্বাধীনতাধর্মী মানসিকতার প্রচারে অধিকতর প্রয়াসী হলেন। এই পর্যায়ের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা 'বিদ্রোহী' (রচনাকাল, ডিসেম্বর ১৯২১) 'বিজলী' (৬ই জানুয়ারী ১৯২২)

* ১৯২০ সালের ১২ই জুলাই তারিখে "নবযুগ" পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। সম্পাদনা করেন যুগ্মভাবে কাজী নজরুল ইসলাম ও মুজফ্ফর আহ্মদ। 'নবযুগ' শেষ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালের জানুয়ারী মাসে।

সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বাংলাকাব্যের ক্ষে নব পরিবর্তনের আভাস সূচিত হয়। নজরুলের কবি প্রতিষ্ঠাও 'বিদ্রোহী' র পর থেকেই বৃদ্ধি পেতে থাকে। কিন্তু ১৯২২ খৃঃ ২৩শে নভেম্বর নজরুল 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটির জন্য ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২৪-এ ধারা বলে কুমিল্লায় গ্রেপ্তার হন এবং এক বৎসর তাঁকে কারাবাস করতে হয়।* ফলে তাঁর কাব্যরচনার ক্ষেত্রে দেশপ্রেমের আবেগ এই পর্বে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। যে আটটি উজ্জীবনী কাব্যগ্রন্থ এই অংশে নজরুলকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল সেগুলির মধ্যে 'সাম্যবাদী' (১৯২৫)ও 'সর্বহারা' (১৯২৬) কাব্যগ্রন্থের নামকরণের মধ্যেও কবির উক্ত প্রবণতার পরিচয় বিদ্যমান। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে আন্তর্জাতিকতার পাশাপাশি সুগভীর মানবতাবোধের অনুভূতিরই প্রাধান্য। 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) এবং 'ভাঙার গান' (১৯২৪) গ্রন্থের কবিতাগুলি সে সময় যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। জাতিভেদের সংকীর্ণতা এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং গান্ধীর কারাবাসের পর্বে দুর্বলচিত্ত জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রচেষ্টা 'বিষের বাঁশী' কাব্যেই প্রাধান্য লাভ করেছে।

কিন্তু এই পর্বেই নজরুলের রোম্যান্টিক চেতনার স্ফুরণ। একদিকে বিদ্রোহীর উদাত্ত আহ্বান, অপরদিকে 'দোলনচাঁপা'র (১৯২৩) রোম্যান্টিক সত্তার প্রয়াস নিঃসন্দেহে কবির কাব্যধর্মের দিক থেকে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে 'সাম্যবাদী' যে সময়ে প্রকাশিত হয় ঐ একই সময়ে (১৯২৫) কবির অন্যতম প্রেমের কাব্যগ্রন্থ 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া' এবং প্রশস্তিকাব্য 'চিত্তনামা' প্রকাশিত হয়েছে। বিদ্রোহী সত্তার অন্তঃস্থিত রোম্যান্টিক চেতনার স্ফুরণ কবির এই পর্বকে নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যের মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

অপরদিকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে বিচার করলে ঐ একই সময়ে বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল' এর আবির্ভাব নিঃসন্দেহে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। 'কল্লোল' এর প্রকাশ পর্ব (১৯২৩) নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে বেকারীর দুঃসহ যন্ত্রণা এবং একই সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা এই পর্বের দুটি পরিপ্রেক্ষিতের পরিচায়ক। সমসাময়িক একুশের ব্যর্থ আন্দোলন ও খিলাফৎ আন্দোলনের নব মূল্যায়নের সঙ্গে তাল রেখে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের তৎপরতা

* এক বৎসরের কারাবাস কালে নজরুল এক মাস রেমিশন্ লিভ্ সংগ্রহ করেন। ফলে এগারো মাস কারাভোগের পরই তিনি মুক্তি পান।

কবির কাব্যক্ষেত্রে নতুন এক পটভূমিকা সৃষ্টি করেছিল। একই সময়ে জগদ্দল সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের পূর্বঘোষিত আহ্বান (বলাকা ১৯১৫) অথবা 'অচলায়তন' এর প্রেরণা ছড়িয়ে পড়েছিল বাংলা কাব্যের প্রতিটি অন্দরমহলে। বাংলা কাব্যের তৃতীয় দশকটি সামাজিক দর্পণের ক্ষেত্রেও ছিল শ্রমিক-মজুরের বিপ্লব ভাবনার মাহেন্দ্রক্ষণ। অথচ নজরুল ছাড়া তার যথাযথ প্রতিচ্ছায়া পড়ল না কল্লোলে। 'ভারতী' সাহিত্যগোষ্ঠীর কৃতিকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের রচনা বরং সার্থক হয়ে উঠেছিল দেশজ ও প্রাকৃত শব্দব্যবহারের নৈপুণ্যে। অক্ষম ইংরেজীর প্রতিভাসও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত। পরবর্তীকালে প্রাকৃত শব্দশ্রীর উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন স্বয়ং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। প্রকৃতপক্ষে নজরুল ও যতীন্দ্রনাথের বিদ্রোহই কল্লোল-এর কবিতার দিক দিয়ে যথার্থ বিদ্রোহ। অন্যান্যরা প্রকাশভঙ্গীতে পরোক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গীর ব্যাকরণকেই অনুসরণ করেছিলেন। 'কল্লোল' গোষ্ঠীর মধ্যে নজরুল ছাড়া আর কেউই রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন নি। এছাড়া নজরুলের মত প্রখর দেশপ্রেমের অধিকারীও কেউ ছিলেন না। আসলে নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ ছাড়া কল্লোলের অন্যান্য কবিদের মধ্যে রাজনৈতিক বা নৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক এমন কোনো বিশিষ্টতা ছিল না যা থেকে তাঁদের সেই কালের একক প্রতিনিধিত্ব বা ফসল বলে চিনে নেওয়া যেতে পারে। নজরুলই তাঁর কাব্যধারার এই পর্বে কল্লোলের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করেছেন। সম্ভবতঃ নজরুল ছাড়া অপর কারো পক্ষে ঐ বৈপ্লবিক চেতনার যথাযথ কাব্যিক রূপায়ণ সম্ভব ছিল না। সমসাময়িক প্রেমেন্দ্র মিত্র অচিন্ত্যকুমারকে পত্রে জীবনকে সে সময় কুহেলিকা বলে উল্লেখ করেছিলেন। কাব্যিক সৌন্দর্যানুভূতির সঙ্গে জীবনভোগের দ্বন্দ্ব থেকেই কী এই কুহেলিকার জয়? আসলে সে সময় যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের উত্তাল জীবন সাগরের দিকে তখনো অনেকেরই দৃষ্টি পড়েনি। তাই অনেকের সংশয় ছিল প্রায় অনিবার্য। কিন্তু পাশাপাশি জৈবিক ভালবাসার প্রাধান্য সমসাময়িক কবিদের ক্ষেত্রে নজর এড়ায় না। কেবলমাত্র বয়োধর্মের প্রশ্নই এই প্রবণতাকে সমর্থনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। জীবনের নগ্ন বাস্তবতাকে সাহিত্যে প্রকাশের প্রাবল্যও সে সময় অনেক ক্ষেত্রে বিলাসিতায় পরিণত হয়েছিল। অথচ সেই সময় নজরুলই ছিলেন একমাত্র মূর্তিমান প্রতিবাদ। এই পর্বে তাঁর বলিষ্ঠ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিদ্রোহের সুর কাব্যে রূপান্তরিত।

উজ্জীবনী কবিতার কালের দিকে তাকালে পাঠক বুঝতে পারেন যে নজরুলের প্রতিভার মেরুদণ্ড মুসলিম সমাজের প্রাথমিক গণতন্ত্রের ধারার

লালিত···জীবনের সর্বচর অভিজ্ঞতায় সতেজ * তাঁর জীবনবোধ। এই পর্বের কাব্যে তিনি অপ্রতিরোধ্য এবং স্বীয় নিষ্কলুষ অপরিমেয় বিপ্লব-প্রীতির অম্লানতায় ভাস্বর। এই সময়ের কবিতার মধ্যে সমসাময়িক মধ্যবিত্ত কল্পনা-শক্তি, আক্রোশ ও অস্থিরতা যথাযথ প্রতিবিম্বিত। সত্যিই কল্লোলের তথা সেই যুগের সকল পাখাঝটপটানির বেদনা যতীন্দ্রনাথের এবং একমাত্র উড্ডয়ন নজরুলে।**

এই পর্বের মোট আটটি গ্রন্থে যে বিদ্রোহ বা বিপ্লবভাবনার প্রয়াস অনুরণিত তার মূলে আছে গভীরতর এক জীবন সত্য যা অনেক ক্ষেত্রে ব্যাপকতর সমাজ সত্যে রূপান্তরিত। তাছাড়া উপনিবেশজাত জীবনযন্ত্রণা এবং সমসাময়িকতার তেজোদীপ্ত উৎসাহ যুগপৎ এই পর্বের কবিতায় প্রাধান্য লাভ করেছে। সেইসঙ্গে এই সময় কবি আয়ত্ত করেছিলেন অপূর্ব স্থিতিস্থাপক ভাষার ব্যবহার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা। প্রতিভার বিশালতার গুণেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর এই সময়ের মানসিকতা যথার্থই মনুষ্যত্বে পুষ্ট এবং অখণ্ড জীবনবোধে স্থির। নজরুলের দুঃখবিলাসে আছে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য সৌন্দর্য-সাধনা। প্রতিভার অনন্যতায় তিনি সমকালীন কবিদের তুলনায় অনন্য বলেই কাব্যিক পরিচর্যার ত্রুটি তাঁকে হতাশ করেনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে নজরুলের এই অনন্যতার মূলে কাজ করেছে তাঁর সুস্থ জীবনবোধ। সংগ্রামী মানস এবং সংগ্রাম ও শান্তি সম্পর্কেই তাঁর বিস্ময়কর প্রজ্ঞা। কিন্তু তাঁর কাব্যিক স্থায়িত্বের পক্ষে এগুলোই যথেষ্ট কারণ নয়। একমাত্র জীবনকে ভোগ করার প্রবণতায় নজরুল ছিলেন যতীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার প্রতিবেশী। অবশ্য এই প্রবণতা ব্যাপ্তি পেয়েছে কল্লোলের অপর দুই কবির (বুদ্ধদেব ও অচিন্ত্য) তৎ-কালীন কাব্যরচনায়। একমাত্র অনেকাংশে ব্যতিক্রম প্রেমেন্দ্র মিত্র। এই বিচারে তিনি নজরুলের এই জাতীয় কাব্যভাবনার ঠিক বিপরীত মেরুর অধিবাসী। দেহবাদী প্রেমকল্পনায় নজরুল প্রেমেনের মত নীরবতা অবলম্বন করেন নি। যদিও এরই ফলে নজরুলের কাব্য ফিরে পেয়েছে পাঠকের মানস সংযোগ তথা আত্মীয়তার সমর্থন। তাই একই সময়ে মানবীয় প্রেম বিষয়ক অনুভূতিমিশ্রিত অনেকগুলি কাব্যগ্রন্থ নজরুলের হাত থেকে বেরিয়ে এসেছে। বরং আটটি

* কল্লোল ও তার দু-একজন কবি—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়
(নতুন সাহিত্য, ৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা অগ্রহায়ণ ১৩৫৯)

** ঐ।

উজ্জীবনী কাব্যগ্রন্থের তুলনায় রোম্যান্টিক স্নিগ্ধতামিশ্রিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা কিছু বেশী। যথা :—

॥ উজ্জীবনী কাব্যগ্রন্থ ॥

(১) অগ্নিবীণা (১৯২২)
(২) ভাঙার গান (১৯২৪) *
(৩) বিষের বাঁশী (১৯২৪) *
(৪) সাম্যবাদী (১৯২৫)
(৫) সর্বহারা (১৯২৬)
(৬) ফণিমনসা (১৯২৭)
(৭) সন্ধ্যা (১৯২৯)
(৮) প্রলয়শিখা (১৯৩০) *

॥ রোম্যান্টিক কাব্যগ্রন্থ ॥

(১) দোলনচাঁপা (১৯২৩)
(২) ছায়ানট (১৯২৫)
(৩) পূবের হাওয়া (১৯২৫)
(৪) সিন্ধুহিন্দোল (১৯২৬)
(৫) চিত্তনামা (১৯২৫)
(৬) বুলবুল (১ম) (১৯২৮)
(৭) চোখের চাতক (১৯২৯)
(৮) চক্রবাক (১৯৩০)
(৯) চন্দ্রবিন্দু (১৯৩০)
(১০) নজরুল গীতিকা (১৯৩০)

॥ শিশু সাহিত্য ॥

(১) ঝিঙে ফুল (১৯২৬)
(২) সাত ভাই চম্পা (১৯২৭)

॥ ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ ॥

(১) জিঞ্জীর (১৯২৮)

॥ অনুবাদ গ্রন্থ ॥

(১) রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ (১৯৩০)

এই তালিকা থেকে বোঝা যায় যে নয় বছরের মধ্যে কবির মোট ২২টি কাব্য-গ্রন্থ এই পর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের তুলনায় এই সংখ্যা সর্বাধিক। বস্তুতঃ এগুলি তাঁর জনপ্রিয়তারই পরিচায়ক।

প্রকৃতপক্ষে নজরুলের কাব্যক্ষেত্রে যে সাফল্য আজো বর্তমান এবং মূলতঃ যা নজরুলের কাব্যধারার দ্বিতীয় পর্বের অন্তর্গত, তার মূলে সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি

দ্রঃ—এই তালিকায় 'সঞ্চিতা' (১৯২৮) কাব্যগ্রন্থটি ধরা হয়নি। কারণ এটি উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলি থেকেই সংকলিত।

* সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত কাব্যগ্রন্থ। এছাড়া কবির তিনটি প্রবন্ধের গ্রন্থও সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। যথা—যুগবাণী (১৯২২), রুদ্রমঙ্গল (১৯২৫), দুর্দিনের যাত্রী (১৯২৫)।

প্রত্যক্ষ কারণ বর্তমান। অর্থাৎ তাঁর একান্ত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্বকীয়তা। রবীন্দ্রনাথের বিশাল আকাশের ছায়ায় তিনি আশ্রয় না নিয়ে দাঁড়িয়েছেন সুকঠিন বাস্তবতার প্রত্যক্ষ ভূমিতে। আর সেইসঙ্গে তিনি কাব্যে ফিরিয়ে এনেছিলেন ঐতিহ্যলালিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির প্রত্যক্ষ মেজাজ যা সতর্কভাবে রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ছিল অব্যবহৃত। এই ধারার জনক ছিলেন দেবেন্দ্র সেন এবং গোবিন্দ দাস (ভাওয়াল)। অবশ্য এই লক্ষ্যে পৌছোতে কবিকে হাত বাড়াতে হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথের অনুভূতি সম্পন্ন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দাবলীর কাছে। পরিণামে তা নজরুলের বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ মুসলিম কাব্যিয় মিষ্টতায় ফিরে পেয়েছে কাব্যের নতুন এক লঘিমা। এই স্বকীয়তার মধ্যেই নজরুলের স্বাতন্ত্র্য ও প্রতিষ্ঠা বর্তমান।

এই পর্বে তাঁর কাব্যে কোথাও কোথাও যে কাব্যোচিত ত্রুটি বা অসংগতি, যা প্রধানতঃ ভাষার অসম ব্যবহার বা অসতর্ক প্রয়োগজাত বলে অভিযুক্ত তার মূলে রয়েছে কবির মন ও মননের বিরোধ। এই দুয়ের মধ্যে যে অসংগতি তার জন্যে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অস্থিরতাকেই দায়ী করা চলে।

কিন্তু তা সত্বেও এই বিক্ষিপ্ত মেজাজ সেই যুগের অস্থিরতাকেই প্রতিবিম্বিত করে। ফলে এই পর্বের রচনা হয়ে ওঠে সেই যুগেরই প্রতীক। এই বিদ্রোহ, অস্থিরতা কখনো প্রেমে কখনো বা সংগ্রামের বাস্তব সত্যের আলোকেই প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তাঁর উল্লাস, বিদ্রোহের জয়গান, রোম্যান্টিক তৃষ্ণা বিংশ শতাব্দীর সেই দশকের যথাযথ পরিণতি। লক্ষণীয়, যে সামাজিক বাস্তবতা নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যে বিদ্রোহের ধ্বনিতে অনুরণিত যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তাই বিদ্রূপে ব্যঙ্গে এবং দুঃখবাদের তীব্রতায় জর্জরিত। তাই যুদ্ধ পরবর্তী মানবিক মূল্যায়নের হতাশা, ব্যর্থতা, বেকারত্ব জনিত ক্ষোভের এরাই যোগ্য প্রতিনিধি।

প্রসঙ্গত নজরুলের কাব্যপ্রয়াসের মূলে সমসাময়িক পটভূমিকার প্রভাব অপরিসীম। বিশেষ করে বাংলাকাব্যে নজরুলের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক গতিবিধিরও দ্রুত পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে 'চৌরি চোরা' ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আন্দোলন প্রত্যাহারের ঘটনা, অপর দিকে ঐ একই সময়ে (১৯২১) কানপুর বলশেভিক মামলা তথা কমিউনিষ্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে যোগাযোগের প্রচেষ্টা তৎকালীন ভারতবর্ষের দুই ভিন্নমুখী প্রবণতারই পরিচায়ক। নজরুলের সৈন্য বাহিনী থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় আন্দামানের বন্দীরাও মুক্তি পেয়ে রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন। প্রত্যাবর্তনের পর এঁরা অনেকে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের কাজে পুনরায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯২২ সালের শ্রমিক আন্দোলনের কর্মসূচী

অনুযায়ী জামসেদপুর ও হাওড়ার বিভিন্ন শিল্প অঞ্চলে ও বোম্বাই চটকল এলাকার শ্রমিক সংগঠনে এঁদের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।* নজরুল কাব্যক্ষেত্রে এসে এই পরস্পরবিরোধী ঘটনাবলীর আবর্তে বিভ্রান্ত হন নি। অন্যান্য অনেক সতর্ক কবির মত তিনি নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ না করে বরং সেইসব উত্তাল ঘটনাবলীকেই কাব্যে উদ্বেল করতে প্রয়াসী হলেন।* রাজনীতি ক্ষেত্রে ঐ সময়ে দেশবন্ধু ও মতিলাল নেহেরুর 'স্বরাজ্য দলের' কর্মসূচী অনুযায়ী রাজনীতিতে তারুণ্যের প্রবণতা গান্ধীকে পরোক্ষে মেনে নিতে হোলো। অন্তবর্তীকালে বিহারের চম্পারণ বিদ্রোহ (নীলচাষীদের সমর্থনে) ও বোম্বের বরদলৈর আন্দোলন দেশের সামগ্রিক আন্দোলনকে তুঙ্গে নিয়ে যাবার সহায়ক হয়ে ওঠে। এই পর্বের শেষ দিকে গান্ধীজীর লবণ আন্দোলন ১৯৩০-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষের আন্দোলন সর্বপ্রথম ভারতব্যাপী গণআন্দোলন (মাস মুভমেন্ট) পরিচালনার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছিল। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনে সম্ভবতঃ গান্ধীজীর এটাই শ্রেষ্ঠতম অবদান। অবশ্য প্রায় একই সময়ে চট্টগ্রামে সূর্য সেনের নেতৃত্বে বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র আন্দোলনের বিস্ফোরণ ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে প্রতিরোধের বীরত্বপূর্ণ লড়াই সমগ্র রাজনীতিতে নতুন সম্ভাবনার

* বিপ্লবী ধরণী গোস্বামী (আসানসোল) শচীন সান্যাল (জামসেদপুর) কে, কে, মিত্র (হাওড়ার শিল্পাঞ্চলে), যতীন মিত্র (জামসেদপুর ও হাওড়া শিল্পাঞ্চল) শ্রমিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অন্যদিকে, কমিউনিষ্টদের মধ্যে মীরাজকর, জোগলেকর, চেট্টি এবং মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ বোম্বাই ও কানপুরের শিল্পাঞ্চলে শ্রমিক সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

** নভেম্বর ১৯২৫ সালে গঠিত The Labour Swaraj Party of India দলের মুখপত্র 'লাঙল'-এর সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন নজরুল। কেননা,...the leftism of Langal was quite serious. For instance, in one of its earliest issues we come across an unsigned poem (Probably by Nazrul) which is quite sharp politically...Secondly, the Langal also gave detailed publicity to the so called First All India Communist conference, held at Kanpur (Cawnpur) in December 1925 gave it full support....

[Communism and Bengal's Freedom Movement (New Stirrings of Bengal]—Goutam Chattopadhyay. P-97.

চিন্তায় যুবসমাজকে উদ্বেল করে তুলেছিল। নজরুলের কাব্যমানসে এই সব উত্তেজনাকর সাফল্য ও ব্যর্থতা স্থান করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রথম কবিই 'ধূমকেতু' পত্রিকার মাধ্যমে পূর্ণ স্বরাজের দাবী তুলেছিলেন।

'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সর্বহারা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ সেইদিক থেকে সমসাময়িক সামাজিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। অবশ্য কোনো অবস্থাতেই তিনি শাসকদল বা কোনো প্রলোভনের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। গান্ধীর চরকা আন্দোলনের সমর্থনে 'চরকার গান' রচনা ও গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎকার (১৯২৪)* সত্ত্বেও 'সব্যসাচী' কবিতায় গান্ধীজীর ব্যর্থতার উল্লেখ করেছিলেন।** অন্যান্য রচনায়ও গান্ধীজীর স্বরাজ আন্দোলনের বিরুদ্ধে কবির অভিমত সুস্পষ্ট।

সামাজিক জীবনে এই পর্বের মধ্যবিত্ত জীবন সংকটে পরিপূর্ণ। চারদিক থেকেই ব্যক্তিবিকাশের সম্ভাবনাগুলি এই সময় রুদ্ধ হয়ে আসে। যৌবন তখন স্বাভাবিক ভাবেই ভাগ্যের দ্বারা প্রতারিত। অর্থনীতির পীড়ন তথা ভয়াবহ বেকার সমস্যা আর্থিক সংকটকেই এই সময় তীব্র করে তুলেছিল। জীবনের মৌলিক দাবীগুলি ত্রিশের দশকেই যেন নিষ্ঠুরভাবে প্রত্যাখ্যাত। এই বন্ধ্যাত্বের ছায়াপাত ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে, শরৎচন্দ্রের চরিত্রচিত্রণে, নজরুল তথা কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে। এছাড়া সোভিয়েত বিপ্লবের ঢেউ এসে দোলা দিয়েছিল গুপ্ত সাম্যবাদী আন্দোলনের ভেতর দিয়ে। আর সেই প্রবণতারই যথাযথ চিত্রণ ঘটেছে নজরুলের এই পর্বের কবিতায়।

সামগ্রিকভাবে নজরুলের 'জাগরণের কবিতা বা উজ্জীবনী কবিতা' রচনার কালকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করলে দেখা যাবে যে, তাঁর কবিতায় সমগ্র শোষিত মানবসমাজের আশা আকাঙ্ক্ষার মর্মবাণীটিই যেন প্রতিধ্বনিত। কবিতার গঠনশৈলী বা টেকনিকের দিক থেকে এই পর্বের রচনায় কিছু কিছু ত্রুটি থাকলেও বক্তব্যের গুণে এবং সংবেদনশীল মানসিকতার প্রভাবে নজরুলের এই পর্বের কাব্যগ্রন্থগুলি বাংলা কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হিসেবেই বিবেচ্য।

* হুগলীতে থাকাকালীন (১৯২৪) গান্ধীজীর সঙ্গে সভায় গিয়ে নজরুল সাক্ষাৎ করেন।

** কংগ্রেস সভাপতির নির্বাচনে (সুভাষচন্দ্র ও পট্টভি সীতারামাইয়া) গান্ধীজীর ভূমিকা নজরুলকে হতাশ করেছিল।

॥ গীতিধর্মী কবিতার কাল (১৯৩১-৩৪) ॥

এই পর্বে নজরুলের পরিণত শিল্পভাবনার পরিচয় মূর্ত হয়ে উঠেছে। অধিকাংশ গীতিধর্মী কবিতাই এই সময়ে রচিত। এবং গীতিকবিতার ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য পূর্ববর্তী পর্বের আবেগ প্রাধান্য থেকে প্রায় মুক্ত। এই পর্বে সঙ্গীতধর্মী প্রবণতা তাঁর কাব্যচিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। নিম্ন-লিখিত কাব্যগুলিতে কবির এই সাফল্যের পরিচয় বর্তমান।

(১) সুরসাকী (১৯৩১) (২) বনগীতি (১৯৩২) (৩) জুলফিকার (১৯৩২) (৪) গুলবাগিচা (১৯৩৩) (৫) গীতিশতদল (১৯৩৪) (৬) সুর-লিপি (১৯৩৪) (৭) সুরমুকুর (১৯৩৪) (৮) গানের মালা (১৯৩৪)

শব্দের সার্থক সংযোগ এবং ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে এই পর্বটি উত্তীর্ণ। সুরের বৈচিত্র্য এবং মাধুর্যে এই পর্বের গীতিকবিতাগুলি নজরুলের পরিণত কাব্য ভাবনার পরিচায়ক হয়ে উঠেছে। রাজনৈতিক বক্তব্যের প্রাধান্য এই পর্বে প্রায় অনুপস্থিত। বরং 'জুলফিকার' কাব্যগ্রন্থে ইসলাম ধর্মের প্রশস্তি ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য প্রধানতঃ কবির সঙ্গীত সাধনার অঙ্গ হিসেবেই এই পর্বকে বিবেচনা করা উচিত। এবং এই রচনাগুলির মাধ্যমে কবি বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানের অধিকারী রূপে চিত্রিত। বাংলা গীতিকবিতার সঙ্গীতধর্মী বৈচিত্র্যে নজরুলের স্থান যে নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথের পরেই তা আজ প্রমাণিত হয়ে গেছে। অতুলপ্রসাদ বা দ্বিজেন্দ্রলালের সার্থক গীতিধর্মী সাফল্য সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে এরা নজরুলের ন্যায় বহুমুখী বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানে (বা অসংখ্য রাগরাগিণীর গবেষণায়) কখনোই লিপ্ত হন নি। এই খানেই কবির বৈশিষ্ট্য এবং সার্থকতা।

॥ কাব্যিক প্রয়াসের শেষ অধ্যায় (১৯৩৫-৪২) ॥

বিভিন্ন কারণে নজরুলের ব্যক্তিগত জীবনের নিরিখে এই পর্বটি উল্লেখযোগ্য। এই সময় নজরুলের কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়নি। অথচ এই দীর্ঘ আট বৎসরের মধ্যে অসংখ্য ঘটনার ঝড় কবির জীবনকে নিঃসন্দেহে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যু (১৯৩০, মে) কবিকে অস্থির করে তোলে। কিন্তু পরবর্তীকালে কবি-পত্নী প্রমীলার অসুস্থতার ফলে (১৯৩৯) কবির ব্যক্তিগত জীবনে সঙ্কট নেমে আসে। এই পর্বে প্রথমে তার

* প্রথম পুত্র কৃষ্ণমহম্মদের হুগলী থাকা কালে মৃত্যু হয়। সব্যসাচী ও অনিরুদ্ধ কবির তৃতীয় ও চতুর্থ সন্তান।

উপার্জন যেমন অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছিল তেমনি শেষের দিকে অর্থাভাবে ১৯৩৯ সালে মাত্র চার হাজার টাকা ধার নেবার জন্যে অসীমকৃষ্ণ দত্তের কাছে নজরুলকে সমস্ত রচনার স্বত্ব (গানের রয়ালটি সহ) বন্ধক দিতে হয়েছে। ফলে দারিদ্র্যের চরম লাঞ্ছনায় কবির মানসিক ভারসাম্য বিঘ্নিত হয়। একদা যে নজরুল তারকেশ্বরের মোহান্তের অন্যায় অত্যাচার ও দুষ্কার্যের প্রতিবাদে কবিতা লিখে অবশেষে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, আত্মবিশ্বাস হারিয়ে কবি স্ত্রীকে সুস্থ করার আশায় সেই মোহান্তের কাছেই গিয়ে 'হত্যা' দিলেন। সেই সঙ্গে নিজেকে শাক্তসাধনা তথা যোগ সাধনার আড়ালে নিয়ে গিয়ে ঈশ্বরের চিন্তায় বিভোর হয়ে পড়লেন কবি। লালগোলা হাইস্কুলে শিক্ষক সাধক বরদাকান্ত মজুমদারকে সে সময় গুরু বলে নজরুল গ্রহণ করলেন। এই সময় কবি কিছু সংখ্যক শ্যামাসঙ্গীত ও লুপ্তপ্রায় রাগরাগিণী মিশ্রিত গীতিকবিতা রচনা করেছিলেন। সেগুলি আকাশবানী কলকাতা থেকে 'হারামণি', 'নবরাগ মালিকা' ও 'গীতি বিচিত্রা' শীর্ষক অনুষ্ঠানে কবির পরিচালনায় প্রচারিত হয়েছিল। এর মধ্যে 'ছন্দসী', 'কাবেরী তীরে', 'কাফেলা', 'হোরীর গান' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সাধু সন্তের প্রতি আস্থা এবং কুসংস্কারের প্রতি দুর্বলতা এই সময় জন্মাতে থাকে। এই পর্বে বিভিন্ন স্থানে নজরুল অনেক বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং ইতস্তত: বেশ কিছু কবিতাও লিখেছিলেন। এই পর্বের কবিতার মধ্যে 'মুকুলের মহফিলে' (আজাদ ১৯৪০, আগষ্ট ৭) 'দুর্বার যৌবন' (জানুয়ারী ১৯৪১) রবীন্দ্রনাথের প্রয়াণ উপলক্ষে রচিত 'রবিহারা' (আগষ্ট ১৯৪১) ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪২ সালের ৯ই জুলাই কলকাতা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ কালে কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তারপর থেকেই অতি দ্রুত অবস্থার অবনতি হয়। এইভাবে ক্রমশ: কবির স্মৃতি বিলোপ এবং কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে পড়ে। এরপর যে সামান্য কয়েকটি চিঠি তিনি লিখেছিলেন সেগুলি অসংগতিতে পরিপূর্ণ।

এই অবস্থার পর থেকে কবির যে কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো

দ্র:—১৯৪০-৪ সালে কবি নব পর্যায়-এর (ফজলুল হকের) 'নবযুগ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'আমার সুন্দর' প্রবন্ধটি সেই সময় 'নবযুগ'-এ প্রকাশিত হয়।

* বেতারে ঐদিন কবি শিশুমহলের অনুষ্ঠানে গল্প পড়েছিলেন। বলা বাহুল্য তা শেষ করার আগে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে এবং কবি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঢাকার কেন্দ্রীয় উন্নয়নবোর্ড প্রকাশিত 'নজরুল রচনাবলী'র মধ্যে পাওয়া যায়।

যথাক্রমে, (১) নতুন চাঁদ (১৯৪৫), (২) বুলবুল (১৯৫২), (৩) সঞ্চয়ন (১৯৫৫), (৪) মরুভাস্কর (১৯৫৭), (৫) শেষ সওগাত (১৯৫৮), (৬) ঝড় (১৯৬০), (৭) রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়াম (১৯৬০) ও (৮) রাঙাজবা (১৯৬৮)। নজরুলের অপ্রকাশিত বহু রচনা এখনো অনেকের কাছে ছড়িয়ে আছে। সামগ্রিক বিচারে নজরুলের কাব্যজীবনের শেষ অধ্যায়টি গভীর ট্র্যাজেডিতে পরিপূর্ণ। বলতে গেলে পৃথিবীর কোনো কবির জীবনে ঘটনাবলীর বা কাব্যিক ভাবনার ক্ষেত্রে এত দ্রুত ওলটপালট ঘটেনি। যে কবি নয় বছরের মধ্যে বাইশটি কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছেন বা চার বছরে আটটি কাব্যগ্রন্থ বাংলা কাব্যের ভাণ্ডারে উপহার দিলেন, অকস্মাৎ দীর্ঘ একটানা আট বছরের মধ্যে তাঁর কোনো কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত না হওয়ার ঘটনা স্বভাবতঃই বিস্ময়ের সঞ্চার করে। অথচ কবি তখনো কাব্যক্ষেত্রের আঙিনা থেকে রিক্ত হয়ে ফিরে আসেন নি। কবিতা বা গান তখনো লিখেছেন এবং যথারীতি পত্র-পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। এর মূলে কাজ করেছে কবির স্ব-বিরোধী-প্রবণতার দ্বন্দ্ব যার কোনো কারণ আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করা যায় না। কবির সৃষ্টি ক্ষমতার প্রাচুর্যের মধ্যেও কবি গ্রহণ করেছিলেন আশ্চর্য প্রখর নীরবতার বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা। বিদ্রোহী নজরুলের, বিপ্লবী নজরুলের অপরাজেয় সংগ্রামী মানস অকস্মাৎ কোন অতলের সাধনায় হারিয়ে গেল। বাক্‌হারা কবির গানের বুলবুলি কোথায়, কোন্ দেশে আজ মুখ লুকিয়েছে ?

দেখা যাচ্ছে, তিরিশের দশকের শেষার্ধেই কবির কবিতার সংখ্যা অনেক কম। অথচ ঐ সময়ে সাম্যবাদ তথা সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধ্যারণার অধিকতর স্ফুরণ ঘটেছে ভারতবর্ষের যুবসমাজের মধ্যে। যুব আন্দোলনও দেশের মধ্যে শক্তিশালী হয়ে ওঠে তখন থেকেই। বিশেষ করে তৎকালীন ফ্যাসী বিরোধী প্রগতি লেখক সংঘের ভূমিকা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন এক অধ্যায়ের সূচনা করেছে। অপর দিকে চারের দশকে আগষ্ট বিপ্লবের স্মরণীয় ভূমিকা, ভিয়েতনামী বিপ্লবী জনগণের আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা জ্ঞাপন* এবং ঐতিহাসিক নৌবিদ্রোহের পর্বে নজরুলের নীরবতা তথা ট্রাজিক পরিণতি জাতীয় দুর্ভাগ্যের পরিচায়ক ছাড়া আর কী হতে পারে ? তিরিশের যৌবনদীপ্ত ঘটনা-মিছিলের

* কলকাতায় ছাত্ররা সেদিন ইন্দোচীনের সমর্থনে 'Solidarity with Vietnam' লেখা ব্যানার নিয়ে রাজপথে বেরিয়ে এসেছিলেন। এবং সে সময় পুলিশের গুলিতে জনৈক ছাত্র নিহত হন।

মধ্যে যখন সমগ্র স্বাধীনতা প্রেমিক মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছে তখন নজরুল আধ্যাত্মবাদের দ্বারা 'আচ্ছন্ন। সুরের মায়ালোকে বৈচিত্র্যের রহস্য উন্মোচনের সাধনায় তিনি তখন তৎপর। অথচ এই দুর্জয় জাগরণের আহ্বান তাঁর রচনায় সমগ্র বিশের শতকের যৌবনকেই উদ্বেল করে রেখেছিল। তাঁর প্রেরণার পুরস্কার যখন প্রায় করায়ত্ত তখন সুস্থ থাকলে তিনি অবশ্যই সেদিন গ্রহণ করতেন 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবারে'র শেষে সাফল্যের বিদ্রোহ পতাকা। তা সত্ত্বেও তাঁর অনুপ্রেরণা সমগ্র জাতির জাগ্রত মানসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।

নজরুল কাব্যের বহুমুখী আলোচনার সুবিধার্থে সমগ্র পর্যায়কে অর্থাৎ কবির কাব্যপর্যায়ের চারটি কালকে অবশেষে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়াই বাঞ্ছনীয়। কবির বিচিত্র মানসিকতা বিভিন্ন পর্বের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কবির বাইশ-তেইশ বৎসরের কাব্যকীর্তিকে একটি অখণ্ড ঐক্যবোধের প্রতীক হিসেবেই বিবেচনা করতে হবে। পর্বগুলি যথাক্রমে,—(১) নজরুলের কাব্যগীতি : প্রস্তাবনা, (২) উদ্দীপক ভাব—স্বদেশীবোধ ও দেশাত্মবোধক চেতনা—বিপ্লবী সত্তা, (৩) সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক চেতনা, (৪) প্রকৃতি-প্রীতি—নৈসর্গ ও ভাবনা—চিত্রকল্প—প্রতীক (৫) সাম্যবোধ—আন্তর্জাতিকতা—মানবপ্রেম—সমাজচিন্তা, (৬) গীতিধর্মী কবিতা—শ্যামাসঙ্গীত ও ইসলামী গান, (৭) হাস্যরস—কৌতুক ও ছড়াগান (৮) গীতিকবিতার ভাষা সুর ও ভাববৈচিত্র্য—ছন্দবিষয়ক পরিক্রমা, (৯) কাব্যধর্মের সামগ্রিক মূল্যায়ন—ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তৃতভাবে উপরোক্ত পর্বগুলির বিভিন্নমুখী ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

নজরুলের গীতিকাব্য : প্রস্তাবনা

বিষয়বস্তুর সারল্য, আবেগ ও গীতিমাধুর্য প্রবণতাই গীতিকবিতার অন্যতম লক্ষণ। আকৃতিতে ছোটো এই সব কবিতা গাইবার উপযোগী বলে মানবমনের অতি পরিচিত অনুভূতিগুলি যেমন—শোকগাথা, বিদায়স্মৃতি, বেদনা বা বিরহই গীতিকবিতার প্রধান বিষয়বস্তু হিসেবে বিবেচ্য। প্রাচীনকালে বীণা বা Lyre সহযোগে যে গান গাওয়া হোতো তাকেই 'লিরিক' বলা হোতো। 'লিরিক' আসলে গীতিকবিতারই নামান্তর মাত্র। সঙ্গীতপ্রাণতাই গীতিকবিতার শ্রেষ্ঠ অবদান।

সাম্প্রতিককালে বাংলা কাব্যে গীতিকবিতা সার্থকতা লাভ করেছে প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ও কাজী নজরুলের রচনায়। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা মূলতঃ গীতিধর্মী।* তাঁর কবিতায় emotion শিল্পকেই টেনে নিয়ে গেছে। অর্থাৎ Art সেখানে বন্ধনের সামগ্রী। কিন্তু নজরুলের কবিতার সম্পদই হোলো তাঁর অন্তরের আবেগ বা flow। ফলে emotion এবং flow-এর সমন্বয়ে নজরুলের গীতিকবিতার নবরূপায়ণ ঘটেছে। নজরুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার মৌলিক পার্থক্য এখানেই।

নজরুলের কবিতা মুখ্যতঃ অলংকার-রহিত। ফলে তাঁর কাব্যে অজস্র অলংকারের সার্থক পরিমিতির পাশাপাশি দেখা দিয়েছে নিসর্গপ্রীতি, উপমা, ছন্দ, অনুপ্রাস, প্রতীক বা সার্থক চিত্রকল্পের বর্ণমালা। এরই ভেতর দিয়ে নজরুলের গীতিকবিতা আবিষ্কার করেছে তার নিজস্ব এক জগৎ। অর্থাৎ তাঁর কবিতা শ্রাবণ-কল্পনা এবং দার্শন-কল্পনার সম্মিলিত বৈভবে অর্জন করেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং স্বতন্ত্র এক ভঙ্গী। বাংলা গীতিকবিতাব ইতিহাসে সেদিক থেকে নজরুলের গীতিকবিতা নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসেবে চিহ্নিত।

এ ছাড়া নিসর্গপ্রীতির লক্ষণ এবং প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা বস্তুতঃ নজরুলের রোম্যান্টিক চিত্তবৃত্তিরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। ফলে তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে সমস্ত

---

* রবীন্দ্রনাথের Lyric মূলতঃ গীতিধর্মী।—প্রমথ চৌধুরী (অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি)।

দিক থেকেই রোম্যান্স তাঁর কাব্যকে অতি সহজেই উৎকর্ষতা দান করেছে। এবং পরিণতিতে তা সমস্ত গীতিকবিতার সাধারণ নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগত সত্তা বা অনুভূতির সঙ্গে একীভূত হয়ে পড়েছে। এই Identification মূলতঃ তাঁর উৎকৃষ্ট গীতিকবিতাসমূহের সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবেই বিবেচ্য।

আধুনিক বিচারে গীতিকবিতাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়ে থাকে—আত্মগত, বিষয়গত ও তত্ত্বাশ্রয়ী গীতিকবিতা।

প্রথমোক্ত অর্থাৎ আত্মগত গীতিকবিতার কথা আগেই বলা হয়েছে। বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস থেকেই এর জন্ম। এই ভাবোচ্ছ্বাস যে কত তীব্র ও সার্থক হয়ে উঠতে পারে তার প্রমাণ নজরুল।

অপরদিকে, বিষয়গত ভাবনার সাহায্যে বিষয়গত গীতিকবিতা রচিত হয়ে থাকে। এ ছাড়া এক শ্রেণীর লিরিক আছে যাকে বলা হয়ে থাকে তত্ত্বাশ্রয়ী কবিতা। রবীন্দ্রনাথ, নবীনচন্দ্র এবং রজনীকান্ত ও মানকুমারীর কবিতায় এর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের ইসলামী কবিতায়ও এর প্রভাব যথেষ্ট বিদ্যমান।

বস্তুত গীতিকবিতা বা লিরিকের আবহে যে প্রয়াসের গুণে কবিতা কীর্তিত তার মূলে অবশ্যই থাকে কবিকৃতির শিল্পভাবনা। ফলে প্রথম থেকেই তাকে মানতে হয় লিরিকের অবিমিশ্র সেই প্রতিক্রিয়ার কথা। উপরন্তু ভাবের সঙ্গে রসের যথাযথ সাযুজ্য মেনে কবিকে সতর্কভাবে আত্মগত রসসৃষ্টির কাজে এগোতে হয়। প্রচলিত ভাবনায় লিরিকের সংজ্ঞা বলতে বোঝায় সেই কবিতা যার মধ্যে কবির একান্ত নিজস্ব অন্তর-অভিঘাতের প্রতিক্রিয়া এবং ভাবের ঘনীভূত আবর্তন বর্তমান।

মূলতঃ বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে লিরিকের বহুবিধ প্রশ্ন চরিত্রগত দিক থেকে অনেকাংশে বাংলার জলহাওয়ার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে ঘনিষ্ঠ। বাঙালী জীবনমানসের প্রবণতায় যে সংগীতময়তা বর্তমান তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের কাব্যে।

বিশেষতঃ যে কাব্যিক পরিমণ্ডলে আবৃত হয়ে নজরুল একদা দৃশ্যমূর্তনে আগ্রহী হয়েছিলেন সেই প্রবণতা ছিল প্রত্যক্ষধর্মিতার দ্বারা সমর্থিত। সম্ভবতঃ কবির উল্লিখিত প্রবণতা বা মগ্ন আবেদন যে ধ্যানধারণার অভিক্ষেপ হিসেবে প্রধানতঃ চিহ্নিত সেই তাৎপর্যটি অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট নয়।

সেদিক থেকে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নজরুলের সাফল্য মূলতঃ চারটি ভিন্নমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার্য।

(১) গীতিকবিতার স্বীকৃত কাঠামোর মধ্যে ছন্দের প্রবল সত্তাব্যঞ্জক তীব্রতায় কবির অভিজ্ঞতা বহুবিধ প্রয়োগের অভিলাষী। এতে অধিদৈবত কোনো প্রতিমানের বাসনা কবির ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।

(২) আবেগের টানে কবির বিষয়বস্তুব বৈচিত্র্যাভিসার, যার বিনিময়ে কবি সতর্ক না হযেও অলক্ষ্যে লিরিকের প্রস্তাবনায় হাত বাড়িয়েছিলেন বাস্তবের সেই কৈলাসভাবনাহীন ক্ষুরধার পথে।

(৩) গীতিকবিতার মধ্যে কাব্যিক আদর্শ অপেক্ষা যথাক্রমে কবির নিজস্ব যৌবনেব স্বাভাবিক দেহতৃষ্ণা। ফিলিষ্টাইন শরীর সর্বস্বতার দ্বন্দ্ব ও জীবনের প্রেম বিষয়ক মর্মান্তিক ব্যর্থতাবোধ বিষয়ক চিত্রায়ণ।

(৪) রোম্যান্টিক ভাবনার ক্ষেত্রে সময ও দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে গীতিকবিতাব মৌলিক স্বরটিকে বিচিত্রতর করার প্রবণতা।

পূর্বে উল্লিখিত আত্মগত গীতিকবিতা পর্যায়ে নজরুল প্রধানতঃ সাফল্য লাভ করেছেন তাঁর তুলনা বা প্রতিতুলনাব ক্ষেত্রে। অবশ্য পাশাপাশি উৎপ্রেক্ষা যা মূলতঃ উপমারই নামান্তর তারও প্রভাব নজরুলকাব্যে বিশেষভাবে প্রাধান্য পেযেছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাসমূহ প্রধানতঃ এই সব গুণের ফলেই স্থায়িত্বের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত।

যে-কোনো গীতিকবিতারই মূল কথা হোলো ছন্দ। নজরুলের কবিতায়ও ছন্দের এই তরঙ্গ প্রবাহিত এবং বিশেষ করে বাংলা ছন্দের মৌলিক ছন্দত্রয়ী অর্থাৎ অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্তের সার্থক কৌলিন্যে রূপায়িত হয়েছে। পরবর্তী স্তরে মধ্য-মিলের আশ্চর্য-সুন্দর প্রযুক্তির ফলে সমগ্র কবিতার ধমনীতে প্রবাহিত হয়েছে নতুন আবেগ। বাংলা কাব্যে সত্যেন্দ্রনাথের কথা বাদ দিলে পরবর্তীকালে ছন্দের ভাঙাগড়ায় এত সহজ ভঙ্গিতে আর কেউ এতখানি এগিয়ে আসতে পারেননি। অথচ এর মূলে কাজ করেছে কবির বৈচিত্র্য সন্ধানী অতৃপ্তবোধসঞ্জাত অনুসন্ধান প্রবৃত্তি। যার ফলে তিনি মধ্যযুগীয় কাব্য অলঙ্কারকে নতুন করে তাঁর কবিতায় ব্যবহার করেছেন। আবার কোথাও কোথাও ইয়োরোপীয় পরাবাস্তব কবিদের অনুসরণে কাব্যে প্রতিশব্দের ব্যবহার করতেও কবি দ্বিধা করেননি।

চিত্রকল্প পর্যায়ে কবির শ্রুতিকল্পনার সার্থক পরিচয় তাঁর গীতিকবিতায়। বিশেষ করে অলংকাররণন কবিকে সাফল্যের মালা এনে দিয়েছে তাঁর গীতি-কবিতায়। প্রকৃতপক্ষে, চিত্রকল্পের বিচিত্রমুখী সমন্বয়ে কবির কাব্য সম্পূর্ণ মৌলিক ভাবমণ্ডল রচনা করতে পেরেছে। তাই তাঁর কলাকৌশল বিভিন্ন

পর্বে চিরায়ত সৃষ্টির কার্যে নিয়োজিত। যেমন চোখ বা নয়ন তাঁর কাব্যে বিচিত্র অর্থে বিচিত্র ভঙ্গীতে লীলায়িত এবং এই পদ্ধতি বা অভ্যাস কবির একান্ত নিজস্ব বলেই তার তাৎপর্য এমন সুদূরপ্রসারী। এর প্রমাণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর সার্থক ক্রিয়াপদের ব্যবহারে। অর্থাৎ কবি ক্রিয়াপদের মাধ্যমে তাঁর কবিতাকে আশ্চর্য গতিময়তা দান করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাব্যবিচারে 'গীতি' কথাটি অর্থহীন নয় তা আমরা জানি। কেননা 'গীতি' শব্দটির দ্বারা ব্যঞ্জিত হয় কবির সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ। প্রকৃতপক্ষে, এই হৃদয়াবেগের শিল্পসম্মত প্রকাশই (expression) হোলো সার্থক গীতিকবিতার লক্ষণ। সেই দিক থেকে নজরুলের গীতিকবিতা শিল্পের সমস্ত শর্তকেই যথাযথ পালন করতে সক্ষম হয়েছে। অর্থাৎ কবি তাঁর কাব্যে হৃদয়াবেগের যে প্রকাশ ঘটিয়েছেন তার মূলে কাজ করেছে কবির শিল্পীজনোচিত আর্তি।

গীতিকবিতার বিষয়বস্তুগত বিচারে নজরুলের কাব্যে Karl Burtsch উল্লেখিত ফরাসী ক্রবাদুরদের (Trobador)* প্রভাব লক্ষণীয়। ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে এদের রচনা-সংকলন প্রকাশিত হয়। Trobadorদের রচনার মান সবক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও সেগুলিই নিঃসন্দেহে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন গীতিকবিতা। বিশেষ করে ইয়োরোপে এঁদেরই মধ্যে প্রথম সার্থক লিরিক কবিতা রচনার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এগুলির বৈশিষ্ট্য বলতে বোঝাত কামগন্ধহীন প্রেমের জয়গান অথবা দেহাতীত প্রেমকে কাব্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপ ও আরব কবিদের কাব্যে যে ব্যক্তিগত (Personal Lyric) অনুভূতি বিষয়ের প্রভাব দেখা যাচ্ছিল তারই প্রভাবে নবম শতাব্দীতে ক্রবাদুরদের আবির্ভাব ঘটে। স্পেনীয় সাহিত্যে ও মূরদের আগমনের পর (নবম ও দশম শতাব্দীতে) প্রথাগত লিরিকধর্মিতা অর্থাৎ ব্যক্তিধর্মী কবিতারই (conventional) প্রাধান্য চলেছিল। সমসাময়িক বৈষ্ণব কবিরাও আমাদের দেশে (জয়দেব) স্পেনীয় কবিদের মত একজনকে নায়িকা মেনে নিয়ে কাব্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। এমন কি পরবর্তীকালে চণ্ডীদাসও ছিলেন নায়িকা-আশ্রিত কাব্যসৃষ্টির পথ অনুসরণকারী। সুতরাং ক্রবাদুরদের প্রভাব গীতিকবিতার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হবার যোগ্য।

* "Grundriss Zur Geschichte der provenzelischen Literatur."
—By Karl Burtsch. (Ref. : Trobador Poets.)

ক্রবাদুরদের কবিতা প্রধানতঃ তদানীন্তন রাজসভার মহিলাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে রচিত হোতো এবং বীররসাত্মক ঘটনায় পরিপূর্ণ সে কবিতা রাজসভার Joglarরা গান গেয়ে প্রভুগৃহিণীদের কাছে পরিবেশন করতেন। ফলে Trobadorদের কবিতায় বিষয়বস্তুগত প্রকরণে দয়িতার প্রতি প্রেম নিবেদন এবং প্রশস্তির আধিক্য লক্ষ্য করা গিয়েছিল। নজরুলের কবিতায় সমসাময়িক Trobadorদের প্রভাবিত আরব কবিদের গীতিকবিতার প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক।* মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমূহে প্রেমবিষয়ক যে সব কবিতা ইতিপূর্বে রচিত হয়েছিল তার আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুতেও Trobadorদের প্রভাব থাকায় অতি সহজেই নজরুল গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। আরবী ও ফারসী কবিতার মেজাজকে তিনি বাংলা কবিতায় যে নৈপুণ্যে আত্মস্থ করেছিলেন তা বিস্ময়ের বস্তু। অবশ্য নজরুলের সর্বাপেক্ষা কৃতিত্ব এই যে তিনি আধুনিককালের গীতিকবিতার সংজ্ঞাটিকে যথাযথ অনুধাবন করেছিলেন। আধুনিক গীতিকবিতার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে Drinkwater বলেছেন, "The characteristic of the Lyric is that it is the product of the pure poetic energy unassociated with other energies." নজরুলের গীতিকবিতায় এ বিশুদ্ধ কাব্যধর্মী রূপটি প্রকাশিত।

আধুনিক লিরিকে ভাবের আবেগ এবং ভাষার প্রসাধনের যেমন সংমিশ্রণ ঘটেছে তেমনি তার সঙ্গে নতুন আর একটি সুরও যোগ হয়েছে। একে বলা হয়ে থাকে আশা ও বেদনার সুর। কেউ কেউ একে Romantic melancholy বলেছেন। নজরুলের কবিতায় এর প্রভাব সহজেই লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের বিষাদময়তার কারণটিও সহজেই অনুমেয়। কেননা কবির লক্ষ্য সৌন্দর্যের জগতে গীতিকবিতার আবেগরঞ্জিত অভিসার। অথচ তাঁর বাস্তব জীবনের ব্যর্থ করুণ অসহায়তা, মানবতার আদর্শলোকে পাখা বিস্তারের ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা ও বর্তমান পৃথিবীর দীনতা ও প্রত্যক্ষ জড়তা থেকে মুক্তিলাভ এবং অবশেষে নিজস্ব মানসিকতার পরিমণ্ডলে ডুব দেওয়ার যে করুণ পরিণতি তারই প্রকাশ তাঁর অসংখ্য গীতিকবিতায়। সুতরাং তাঁর কবিতার মৌলিক উপাদান বলতে বোঝায় তাঁর রোম্যান্টিক বিষাদ এবং জীবনের মিস্টিক (mystic) দর্শন।

* Trobadorদের সম্পর্কে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন Ezra Pound তাঁর Trobador—Their Sorts and Conditions প্রবন্ধে। (Literary Essays of Ezra Pound Edited with an Introduction by T. S. Eliot. P. 94.)

বাংলা ভাষায় সার্থক গীতিকবিতার স্বর্ণ যুগ শুরু হয় ১৮৭০ সালের পর থেকে। কেননা গীতিকবিতার প্রাথমিক শর্তগুলির অস্তিত্ব তখনো তেমন নজরে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে, ইতিপূর্বে জাতীয়তাবাদী কর্মকাণ্ড ও স্বাদেশিকতার স্রোতে জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উন্মাদনা ও আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে গীতিকবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যগুলি অর্থাৎ emotions recollected in tranquillity অনুপস্থিত ছিল।

ফলে পরবর্তীকালে জাতীয় জীবনে যে অস্থিরতা এবং বিশ্বযুদ্ধের অভিশাপে বিংশ শতাব্দীর ব্যক্তিমানসে যে শূন্যতা ও অহং সর্বস্বতাবোধ প্রসারলাভ করেছে তার প্রভাব নজরুলের কাব্যেও পড়েছিল। এবং এরই প্রমাণ তাঁর গীতিকবিতায় Identification-এর প্রাধান্যে। প্রকৃতপক্ষে, নজরুলেব কাব্যচরিত্র যুগপৎ বিদ্রোহী ও প্রেমিক। এবং তাঁর কাব্যের তীব্রতাও এই দুয়ের দ্বন্দ্বপ্রসূত, যদিও সেই দ্বন্দ্বকে কোনো সংযুক্তিবোধে সংলগ্ন করার প্রয়াস ছিল না নজরুলের। ফলে তাঁর কবিতায় বিরোধী ভাবগুলি সংবদ্ধ না হয়ে চিরকাল সমান্তবালে থেকে গেছে। যদিও এই বিবোধিতা নজরুলকাব্যের চরিত্রকে অনিবার্য করে তুলেছে এবং সেই জন্যেই তাঁর অপ্রতিরোধ্য চরিত্র কবিতার চেয়ে কবি হিসেবেই তাঁকে উন্মীলিত করেছে বেশী। তাঁর কাব্যের মূলে প্রায়শঃ কাজ করেছে একটি অস্থিরতাবোধ যা হয়তো পাঠককে সহজেই দগ্ধ করে। কিন্তু এই দাহের মূলে রয়েছে কবির বৈচিত্র্য ও বৈপরীত্যের সমাবেশ। অভিজ্ঞতার উদ্‌ভ্রান্তির বদলে তাঁর হৃদয়ে কাজ করেছে একটি সাংস্কৃতিক পরিবেশ। এরই জন্যে তাঁর কবিতায় ব্যক্তি-রহস্য, ভাব-ভালবাসা ও সেন্টিমেন্টের পাশাপাশি প্রবহমান যুগটিও তাঁর চোখে ধরা পড়েছে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষভাবে। তাঁর সরল ও সৎ উপলব্ধি এবং অভিজ্ঞতার অনুভূতি পাঠককে চকিত করে বলেই তা এত বিস্ময়কর।

বাংলা কাব্যে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের ব্যাপ্তি থেকে গতিবেগচ্যুত যে ধারাটি নজরুলের মধ্যে রূপ পেয়েছিল প্রকৃতপক্ষে তাই তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সামগ্রিকতাকে স্বীকার করে নিয়েই নজরুল বাংলা গীতি-কবিতার নিজস্ব একটি ভিন্ন ঐতিহ্য আবিষ্কারে সক্রিয় হয়েছিলেন। এবং সে ঐতিহ্যকে নিজের কাব্যদর্শনের ছকে মুক্ত করে তিনি অন্য অর্থে রোম্যান্টিক অনুভূতির নির্ভুল সংজ্ঞাকে নিজস্ব ধারার নির্যাসে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই নজরুলের কাব্যের অন্তঃস্থিত দর্শন বড়ো স্পষ্ট, বিষয়ের ক্ষেত্রে এরই উল্লেখ্য অনুভূতির দীপ্তিতে সবই সত্য। এই ভিন্ন দর্শনের আন্তরিকতাই ফুটে ওঠে তাঁর প্রেমের কবিতায়। সেখানে প্রবল হয়ে উঠেছে অস্তিত্ববোধের

যন্ত্রণা থেকে কবির মুক্তি পাওয়ার বেদনা। বিপরীতপক্ষে, এই অস্তিত্ববোধই জটিল করে তুলেছে তাঁর কাব্যের ঈশ্বর, সমাজ তথা শাসকের সংজ্ঞাকে। বস্তুতঃ তাঁর কাব্যে এই মনোভাব উন্মোচিত হয়েছে তাঁর গীতিকাব্যের সরল রূপায়ণে।

বাঙালী মানসিকতার পরিমণ্ডলে যে ভাবপ্রবণতা, উচ্ছ্বাস ও ভাবোৎকণ্ঠা বর্তমান নজরুলকাব্যে তাই অনুরণিত হয়েছিল কবির স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায়। এবং তারই প্রতিফলন দেখা দিয়েছে যথাক্রমে দুভাগে, যথা—আবেগগত ও প্রকরণগত। প্রথমতঃ, আবেগের প্রাবল্যে যা উৎসারিত হয়েছিল তা ছিল কিছু পরিমাণে পরিশোধনহীন। দ্বিতীয়তঃ, প্রকরণগত শৈথিল্য বা অসংহতি কাব্যের বাক্‌ভঙ্গীতে ও শব্দচেতনায় অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা কোথাও কোথাও অবশ্যই ভঙ্গ হয়েছে। কিন্তু তবু তাঁর কাব্য নিজস্ব গতানুগতিকতার প্রাধান্যে এবং ত্বরিত নির্মিতির অনুষঙ্গে বিক্ষত হয়েও আপন প্রাবল্যে পাঠকের আস্থা পেয়েছে চিরকাল। অর্থাৎ কাব্যের বিচিত্রগত বিচারে তিনি রোম্যাণ্টিক ধারার উদ্দাম, অস্থির, অন্তিম এক উচ্ছ্বাসী সন্তান। তাঁর বিচারে তাই কবিতা হয়ে উঠেছে কবির আত্মপ্রকাশ ও আবেগের নির্মল মাধ্যম।

ঐতিহাসিক অনিবার্যতা অবশ্যই এর পেছনে গভীরভাবে কাজ করেছে। যুদ্ধ পরবর্তী পৃথিবীর লুণ্ঠিত মানবতাবোধ, নিষ্ঠুর অহংসর্বস্ব ব্যক্তিত্ববাদের অভ্যুত্থান অনিবার্য পরিণতির দিকে কবিকে আকর্ষণ করেছিল বলেই তিনি ব্যক্তির মর্মপীড়ার মধ্যে শুনেছিলেন বিশ্বমানবতার আর্তি। তাঁর কবিতায় যে এনার্কিক (anarchic) ব্যক্তিসত্তা বর্তমান তা তাঁর ওই আতংক, দ্রোহ এবং আত্মসমীক্ষায় বিচ্ছুরিত আলোর পরীক্ষিত সত্য হিসেবেই প্রতিভাত। যদিও তাঁর কবিমন রোম্যান্সের তৃষ্ণায় আকুল, কিন্তু তাঁর চিত্তে প্রতিফলিত হয়েছে ওই দুর্দমনীয় ব্যক্তিসত্তা আর চলমান সময়ের এক উল্লাসমুখর নির্যাস। অবশ্য এ সবের বিনিময়েই তাঁর কবিতা পেয়েছে চিরন্তন স্বাস্থ্য আর স্বাচ্ছন্দ্যের অন্তহীন আয়ু।

ওই একই সময়ে কবির জ্ঞাতসারে চলছিল সমাজ-বিচ্ছিন্ন আত্মসচেতনতার কাল, যার উপলব্ধ ফল হোলো জীবন অসম্বদ্ধ সামাজিক সমর্থনহীন, একক আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে মুখর এক পরিণতি। ঐ কাব্যাদর্শে কোথাও রোম্যাণ্টিকতার স্থান ছিল না। তাঁদের কাব্যাদর্শ ছিল কেবলমাত্র পরিশ্রম ও আত্মসচেতনতার ফসল। ফলে কাব্যের জগতে এঁরা এনেছিলেন বৈজ্ঞানিক বীক্ষণপ্রবণতা, এনেছিলেন যথাক্রমে তীব্র-তিক্ত-স্বেদাক্ত প্রত্যক্ষবাদ—নব্য প্রতীকী রীতির প্রবর্তনায় যা স্মৃতির স্নিগ্ধ অনুবাদ। আত্মচেতনার বিস্তার ব্যাপ্তি ও গভীরতার

পাশাপাশি এ হোলো জীবনের দুর্বিষহ বিচ্ছিন্নতাবাদী যন্ত্রণা। তাঁদের এই পরিবর্তন নজরুলের নজর এড়ায়নি। কেননা এর ফলেই রোম্যান্টিক কাব্যাদর্শ এবং এনার্কিক চৈতন্য যুগপৎ তাঁর কবিতায় প্রবিষ্ট। এই দ্বিবিধ টানের তীব্রতায় তাঁর রোম্যান্টিক জগতে একদা তিনিই ঘটালেন এনার্কিক বিস্ফোরণ। তবু এরই ভেতর দিয়ে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন কাব্যের নতুন এক স্থাপত্য কলা। সমসাময়িক যুগমানতায় মৌলিকত্বের বিনিময়ে কবি-হৃদয়ে ঘটেছিল রহু বৃত্তির সন্নিপাত। হতে পারে এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি তাঁর কবি-হৃদয়ের সঙ্গতা ও স্নেহ যা আক্রোশ বা ঘৃণারই অভিন্ন প্রকাশ। এরই ফলে এবম্বিধ বৈপরীত্যকে আবেগের পরস্পর পরিপূরক ও আবেগসমূহের মুক্তির প্রণালী হিসেবে কবি গ্রহণ করেছিলেন। এবং এব বিনিময়ে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর কাব্যের পসরাকে যা তাঁর কাব্যকে বিনিময়ে দিয়েছে অমরত্বের সম্মান।

প্রকৃতপক্ষে, নজরুলের গীতিকবিতার অন্তঃস্থিত মাধুর্য আবেগের প্রাবল্যবোধ যা তাঁর দৃশ্যমান ঘটনাবলীর অন্তরানুভূতি থেকেই নিঃসারিত। এই নিবিড় আবেগই তাঁর কবিতাকে চারিত্র্য দান করেছে। ফলে সবকিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে ভিন্ন এক অনুভূতিময় সৃষ্টিস্বরলিপির আনন্দ। হয়তো কখনো কখনো তাঁর আহরিত সত্যবোধ নতুন ভাবের জন্ম দিয়ে মুহূর্তে জ্বলে উঠেছে। এবং সেই জ্বলে ওঠা আলোতেই আবার পরবর্তী মুহূর্তে নিঃশেষিত হয়েছে তাঁর সেই অনুভূতি। কিন্তু তাঁর আবেগের সমর্থন কবি নিজেই আবিষ্কাব করেছেন তাঁর সৃষ্ট কাব্যের দৃশ্যে ও দৃষ্টিতে। ফলে অনুভূতির তীব্রতা ব্যাপ্ত হয়েছিল পাঠকের শারীরিক কম্পনে। আসলে তিনি ছিলেন বক্তব্যের প্রকরণে অস্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়জ। ফলে তাঁর সমগ্র কাব্যদর্শন হয়ে উঠেছে তাঁর কবিজনোচিত উন্মাদনা এবং পক্ষ বিস্তারের স্বরূপক্ষেত্র। এবং সেই উন্মাদনার বিনিময়ে তিনি লাভ করেছেন তাঁর অনুভূত অন্তহীন ভাবাবেগ। ঐক্যবদ্ধ শব্দোচ্চারণের পাশাপাশি তাই ধর্মীয় ভাবগম্ভীর তত্ত্বও প্রকাশ পেয়েছে নজরুলের রচনায়। যদিও এরই মধ্যে কবি নিজস্ব প্রত্যয়ে দেশজ ঐতিহ্যের মূলেই বিচরণ করেছেন। কবির দ্বিধা ছিল না প্রাচীন ঘটনার উল্লেখে বা মিথের (Myth) সার্থক ব্যবহারে। হয়তো এরই প্রভাবে কবিতা হয়ে উঠেছে অন্যান্য প্রক্রিয়ার মতো স্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত।

তাঁর সমগ্র কাব্য পরিক্রমায় অভিজ্ঞতার ব্যবহার অত্যন্ত মৌলিক। এই অভিজ্ঞতায় তিনি লাভ করেছিলেন ছন্দ ও সংগীত সম্পর্কে অদ্বিতীয় এক প্রজ্ঞা এবং এরই ভেতর দিয়ে তাঁর চরিত্রের বহু বিচিত্র উচ্ছ্বাস পরিণত হয়েছে

বিশেষ একটি প্রবণতায়। সন্দেহ নেই এর মধ্যে দিয়েই নজরুল বাস্তবের মুখোমুখি হবার সুযোগ পান। অর্থাৎ তিনি নানাবিধ দেশজ শব্দ সমসাময়িক জীবনের আয়নায় অবলীলায় ব্যবহার করে অবশেষে বাস্তবতার কাছে ধরা দেন। তাতেই সৃষ্টি হয় তাঁর কাব্যের আশু প্রতিক্রিয়া, যার আকস্মিক উপলব্ধি পাঠককে সর্বদা পুলকিত করে।

সমস্ত মহৎ কবির ন্যায় নজরুলের কাব্যমানসও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই দ্বন্দ্বপীড়িত বলে বিবেচিত। এবং বলা বাহুল্য যে ঐ দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়িক। সমসাময়িক ইয়োরোপীয় কবিদের ন্যায় তিনিও বাস্তবতাবোধের স্তরে সামাজিক অসাম্য ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ব্যক্তিজীবনে এক আপোষহীন যোদ্ধা। বাস্তব উপলব্ধির দ্বন্দ্বে তিনি তাই এত অস্থির। এবং এই দ্বন্দ্ব থেকেই উৎসারিত হয়েছিল তাঁর কবিজনোচিত চারু ও সুকুমার বক্রোক্তি। অবশ্য তাঁর চিন্তায় প্রতিনিয়ত যে বিরোধ উপস্থিত তার মূলেও ছিল এই দ্বন্দ্ব। তবু কবি এই বিরোধজাত বিভিন্নতার মধ্য থেকেই গ্রহণ করেছেন তাঁর কাব্যের উপাদান। আর এই আবেগ বা উচ্ছ্বাসের মূলে কাজ করেছিল কবির উল্লিখিত দ্বন্দ্বের এক দূরদর্শী ও বিতর্কমান প্রভাব। প্রকৃতপক্ষে, নজরুল তাঁর অসীম অভিজ্ঞার শক্তিতেই আবিষ্কার করেছেন এই বিচিত্র দ্বন্দ্বের পারস্পরিক সম্বন্ধকে। কেননা তিনি বিরোধকে অস্বীকার করেননি। তাঁর কবিতার মধ্যে অনুপস্থিত যে প্রত্যাশিত সমন্বয় তিনি সে সম্পর্কে চিন্তান্বিত না থেকেও ভিন্ন অর্থে সমস্ত বাস্তবতার বিরুদ্ধে বরং বাজি রেখেছিলেন তাঁর প্রতিভাকে। আর তাতেই কবি অনুভব করেছেন তাঁর মৌলিক সত্তাকে। এবং এরই ফলে একই সঙ্গে কবি অকস্মাৎ হয়ে উঠেছেন মানবিক ও নৈসর্গিক প্রতিবেশে নিবিষ্ট ও দ্বন্দ্বপীড়িত স্বাধীনতাবোধের ব্যাকুল সন্তান। আসলে মন যে বিষয়ে যখন তাঁকে নাড়িয়েছে তাতে তিনি সহজেই মেতেছেন। সৃষ্টির বিষয়বস্তু করে তুলেছেন তিনি চলমান জীবনের সমস্ত তুচ্ছ অনুভূতিকে। যেমন করে রক্তে কোনো প্রেরণা গান গেয়ে ওঠে ঠিক তেমনি অক্লান্ত অজ্ঞাত সেই টেনশনের তাগিদেই সম্ভবত: তিনি এই পথ গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে নজরুলের কবিতায় এই চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা শেষ পর্যন্ত বর্তমান ছিল। কিন্তু তাঁর কবিতায় কোনো পর্বান্তর ছিল না। অর্থাৎ হিন্দু পর্বের পর ইসলামী অথবা রাজনৈতিক কবিতার স্তরের পর প্রেম-ভাবনা বিষয়ক কবিতার পর্ব বলতে কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নজরুলের কাব্যে দেখা যায়নি। বরং তিনি ইচ্ছেমত বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে তাঁর

কাব্যভাবনাকে সঞ্চারিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে, জীবনের সমস্ত বৈসাদৃশ্য বা অসামঞ্জস্যই তাঁকে দগ্ধ করেছে এবং কবি তাঁর স্বভাবের গুণেই তার দ্বারা দগ্ধ হয়েছেন এবং পরিণতিতে এর অন্বেষণেই তিনি মানব স্বভাবের গভীরতম বিষাদের মুখোমুখি হতেও দ্বিধা করেননি।

তাঁর স্বভাবের মধ্যেই সমাজজীবনের বাস্তবতা একাত্ম হয়ে উঠেছিল। এবং মানবজীবনের বহু বিচিত্র ঐতিহ্য এবং লোকাচার আবিষ্কারের প্রক্রিয়ার সাথে কবি একাত্মীভূত হতে চেয়েছেন বলেই প্রায়শঃ বিচিত্র প্রতিক্রিয়ায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু অবশেষে সমস্ত অনুভূতিকেই কবি দান করেছেন তাঁর শিল্পগত সৌকুমার্য। জীবনেব বহু বিচিত্র আকর্ষণে জিজ্ঞাসু কবি অনবরত এরই ফলে বিচিত্র কাব্য সৃষ্টির অনুশীলনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অর্থাৎ নজরুলেব চৈতন্যে ধরা পড়েছিল অনুভূতির তীব্র একটি আবেগ। আর নতুন বিষয়বস্তু উদ্বোধনের প্রবর্তন বলেই তিনি জীবনেব সমস্ত শিক্ষাব তালিম গ্রহণ করেছেন বাস্তবের পাঠশালা থেকে। তাঁব এই অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাব্যযন্ত্রণা যেন তাঁব কাব্যিক সততারই গ্যারান্টি।

গীতিকবিতার অন্যতম মূলধন হোলো শব্দ। এবং সেই শব্দকে বিচিত্র মাধুর্যে প্রকাশিত করাই কবির কাজ। সার্থক ব্যবহারে এবং পরিমিতিবোধেব তীক্ষ্ণ মেধার বিনিময়ে কবিব কবিতায় গমক খোলে। চমকের প্রতিটি উপলব্ধি অলক্ষ্যে কবির ভাবনার সঙ্গে পাঠকের অনুভূতির মিলন ঘটায়। নজরুলও যে তাঁর সমগ্র কাব্যমানসে টেনশন বজায় রাখতে পেরেছিলেন তার মূলেও ছিল এই শব্দ ব্যবহারের আশ্চর্য নিপুণ ব্যুৎপত্তিবোধ। বাংলায় প্রচলিত শব্দমালার সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর অনিরুদ্ধ আবেগ প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বিভিন্ন প্রচলিত এবং অপ্রচলিত শব্দরাশিকে। কবি ঠিক এই কারণেই বিদেশী শব্দের চয়নে তাঁর কাব্যকে অতিরিক্ত সৌন্দর্যের অংশ বলে মেনে নিয়েছিলেন। এবং তাঁর ব্যবহারের সাবলীলতার গুণে তা ক্রমশঃ বাংলা ভাষাব অন্তর্গত হয়ে গেছে। কৈশোরের পরিবেশগত প্রভাব-প্রাধান্যে প্রথম থেকেই তাঁর রচনায় হিন্দী ও ফারসী শব্দের প্রচলন দেখা যায়। অনেক সময় দেখা গেছে যে বিভিন্ন ঐতিহ্য-মণ্ডিত প্রাচীন পুঁথির অবহেলিত বা বহু ব্যবহারে ক্ষয়িত শব্দগুলো তাঁর হাতে রূপান্তরিত হয়ে লাভ করেছে আশ্চর্য এক বেগ বা ফোর্স। এই সার্থক প্রয়োগ-কুশলতায় সেই শব্দগুলো যে কেবল তীক্ষ্ণই হয়ে উঠেছে তা নয়, বরং পেয়েছে বহু বিচিত্র সম্ভাবনায় অনন্যতা।

প্রসঙ্গত স্বীকার করতেই হবে যে বাংলা ভাষায় বিশেষ করে বাংলা কবিতায়

হৃৎপিণ্ডে বীরের রক্তধারা বইয়েছিলেন মাইকেল। এতকালের প্রচলিত নম্রস্নিগ্ধ কমনীয়তায় মাইকেল এনেছিলেন শক্তি, তেজ আর বীরত্বের দীপ্তি। কিন্তু মাইকেল তাঁর কবি-চরিত্রের গুণেই প্রাচীন দেবদেবী তথা ঐতিহ্য প্রশস্তি বা চিত্রণে অধিকতর সচেষ্ট ছিলেন। অথচ নজরুল ঐ একই পথে তাঁর কবি-চরিত্রের দার্ঢ্যে বাংলা কবিতায় এনেছিলেন ঐতিহ্য ও প্রাচীনের সঙ্গে সমসাময়িক সমস্যা ও মানবতাবোধের মৌলিক প্রশ্নাবলী। বিজিতের বংশধর হয়ে এতদিন থাকার ফলেই সম্ভবতঃ সে-সময় কাব্যের জগতে নজরুল হতে চেয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রিয় সন্তান। তাই অস্থির, চঞ্চল কবি বাস্তবের কাছাকাছি এসে মুখ ফিরিয়ে নিতে পারেননি। পুরোনো ফেলে আসা জর্জরিত জীবনের অন্তর্দাহ রোম্যান্টিকতার জগৎ থেকে বারংবার তাঁর দৃষ্টিকে ফেরাতে বাধ্য করেছে। মধুসূদন ইংরেজ কবিদের ল্যাটিন প্রবণতায় প্রভাবিত হয়ে হাত বাড়িয়েছিলেন সংস্কৃতের দিকে। আর নজরুল গ্রহণ করলেন সমসাময়িক ভাবতীয় ভাষার বিভিন্ন মুসলমানী শব্দেব তরঙ্গমালাকে। আর্টের নিয়মতান্ত্রিক কোনো অনুশাসনে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন না। ফলে ধ্রুপদ রীতিতে তাঁব আস্থা থাকলেও কাব্য সংক্রান্ত ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অবিশ্বাস্য রকমের আধুনিক।* তাঁর ভাবনায় আঙ্গিক চিন্তা ভুলেও স্থান পায়নি। প্রকৃতপক্ষে তাই তাঁর সংস্কারমুক্ত মন বিদেশী শব্দকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে অলক্ষ্যে কবির প্রবর্তিত ভিন্ন আঙ্গিক সৃষ্টি করেছে। ফলে তাঁর রচনার মূলে পরিচালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে দেশের জনসাধারণ। এই জন্যে তাঁর সৃষ্ট কবিতার ভাষা পুঁথির বিচারে ত্রুটিহীন না হলেও মানবজীবনের প্রবণতাবোধের বিচারে সেগুলি সার্থক। মাইকেলেব কাব্যের সঙ্গে নজরুলের কবিতার যেমন অমিল ছিল তেমনি পৌরুষ বর্ণনায় ও তেজোদৃপ্ত ভাবপ্রকাশের অনির্ণেয় ক্ষমতায় উভয়ের এই মিলটুকুও সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে এই তেজোদীপ্ত মননের পাশাপাশি নজরুলের মধ্যে একই সঙ্গে রোম্যান্টিক ক্লাসিকতা কী আশ্চর্যভাবে তাঁর রচনায় প্রভাব

* "…এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ণ থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে—এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বল্গা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবা গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলে আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হলো—এ কথা মানতে আর্টিষ্টের হয়তো কষ্টই হয়, প্রাণ তাঁর হাঁপিয়ে ওঠে। জানি, ক্লাসিকের কেশো রুগীরা এতে হয়তো হাড়ে হাড়ে চটে, তাঁদের কলম হয়ে উঠতে পারে বাঁশ।"—নজরুল (ইব্রাহিম খাঁকে লেখা চিঠি)।

বিস্তার করেছিল। অর্থাৎ গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে কমনীয় ছন্দ অবশ্য প্রয়োজনীয় তার ক্ষেত্রেও নজরুলের পরোক্ষ দখল ছিল অসাধারণ। তাঁর 'দোলনচাঁপা' বা 'ছায়ানট' এর প্রমাণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

সার্থক গীতিকবিতা লেখার প্রধান শর্ত যেমন ছন্দ তেমন সার্থক কবিরও অবশ্যই থাকতে হবে জন্মার্জিত সঙ্গীতের কান।* নইলে কবির রচনায় সূক্ষ্ম ধ্বনি বিসদৃশ হয়ে দেখা দিতে বাধ্য। নজরুলের কবিতায় সাঙ্গীতিক প্রভাবের মূলে ছিল কবির সঙ্গীত সম্পর্কীয় সহজাত প্রতিভা। প্রকৃতপক্ষে, ঘরোয়া ভাষায় অতি প্রচলিত সঙ্গীতের মাধুর্যমিশ্রিত ছন্দে ফেলে যথাক্রমে শব্দের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী ধ্বনি-প্রতিধ্বনির সংঘর্ষ ঘটিয়ে অলক্ষ্যে কাব্যে তিনি প্রতিনিয়তই নবতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন। এতে অবশ্য কখনো কখনো অর্থকে ছাপিয়ে স্বরই তাঁর কাব্যে প্রধান হয়ে উঠেছে। কিন্তু যে-কোনো সার্থক কবিতার পরিচয় তার সঙ্গীতময়তায়, পাউণ্ড যাকে বলেছেন—Phenopeis। এরই সমর্থন মেলে T. S. Eliot-এর মন্তব্যে, যেখানে তিনি বলেন—

"The music of poetry......must be a music latent in the common speech of its time. And that means also that it must be latents in the common speech of the poets place......" **

নজরুলের কবিতায় বিদেশী শব্দের আধিক্য সত্ত্বেও কেবলমাত্র ঐ সঙ্গীতময়তার গৌরবেই তা ত্রুটিমুক্ত হতে পেরেছে। এবং বলা বাহুল্য, তা অভিজ্ঞতার আশ্চর্য দর্পণে বিম্বিত হয়েছিল বলেই কখনো তা গুরুভার মনে হয়নি। সেক্ষেত্রে রূপান্তর বিপরীতপক্ষে একাত্মতায় পরিণত হয়েছে। এ কার্যে কোথাও কোথাও ফরাসী কবি মালার্মের সঙ্গীত দর্শনের প্রভাব অলক্ষ্যে ঘটেছে বলে মনে হয়। কেননা, তাঁরও সাধনা ছিল কবিতাকে সঙ্গীত করে তোলা। একদা ল্য ক্ল্যর যথার্থ ই বলেছেন 'নিউ ডাইরেকশনস্'-এর মার্কিন সংস্করণে :

* "Poetry withers and drives out when it leaves music ..... Poets who are not interested in music are, or become, bad poets. I would almost say that poets should never be too long out of touch with musicians. Poets who will not study music are defective."—Ezra Pound.

** The Music of Poetry. Selected Prose by T. S. Eliot. P. 56.

"নজরুল ইসলামের কাব্যালোচনায় তাঁর গানগুলো কবিতা হিসাবেই আলোচিত হবে। তাঁর বহু গান স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা......হাফেজ যে গীতিকবিতার কবি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস যে গীতিকবিতার নজরুল ইসলামও সেই গীতিকবিতার কবি। সুতরাং এই সব কবিদের কাব্যালোচনার সময় তাঁদের গানগুলোকে পৃথকভাবে আলোচনা করা অনুচিত।"*

প্রকৃতপ্রস্তাবে গীতিকবিতার মৌলিকতাই এইখানে। সুরের পর্দায় তাদের ফেললে তারা কাব্যের প্রসাদগুণের সঙ্গে মিশে গান হয়েই বেরিয়ে আসে। বহিরঙ্গে যে ত্রুটি এর ফলে ঘটে থাকে তাও প্রধানতঃ সুরের স্বার্থে। এমন কি বিদেশী সমালোচকের দৃষ্টিতেও তা সমর্থিত হয় একই বিবেচনায় যখন ঐ একই আলোচনায় ল্যা ফ্র্যর বলেন—"অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের বেলায়, উপমা চিত্রকল্পের যে সাক্ষাৎ আমরা পাব, তা উত্তম কবিতার। অবশ্য এমনি ছন্দের ত্রুটিযুক্ত গান উভয় কবির কাব্যে খুব বেশী চোখে পড়ে না। যেখানে তেমন আছে সেখানে সুরের জন্যে সচেতনভাবেই তা করা হ'য়েছে।"

একটু গভীরভাবে ব্যাখ্যা করে দেখলে বোঝা যায় নজরুলের গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা ধরা পড়ে তা সাধারণতঃ কোনো ব্যাকরণের অন্তর্গত নয়। বরং এই ব্যঞ্জনা একমাত্র সঙ্গীত ও নৃত্যের তাৎপর্যেই বিশ্লেষিত হতে পারে। এবং নজরুল নিরীক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণের প্রথাগত সীমানাকে অতিক্রম করতে প্রযাসী হয়েছিলেন প্রধানতঃ তাঁর কাব্যের পৌরুষের বিনিময়ে। ফলে অতি সহজেই অভিজ্ঞতায় নতুন দুয়ার তাঁর কবিতায় সহজেই উন্মুক্ত। সঙ্গীত বা নৃত্যের মুদ্রা তাঁকে অলংকৃত করেছে নব সুষমার অতিরিক্ত মাধুর্যে।

সেদিক থেকে বাংলা গীতিকবিতায় বিশেষ করে আঙ্গিকের নবরূপায়ণে নজরুলের অবদান অবিস্মরণীয়। কাজটি হয়েছে অতি সূক্ষ্মভাবে। এই কাজে তাঁকে উদ্যোগী হতে হয়েছে কবিতার উপমা ও চিত্রকল্প রচনায়, ঠিক যেমন হয়েছিল তাঁর শব্দের গ্রন্থনা বা সান্ত্যমিল এবং সুরের ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে। ফলে তিনি কোথাও কোথাও ক্লাসিক রীতিকে কবিতায় ভাঙবার স্পর্ধাও দেখিয়েছেন। সম্ভবতঃ নজরুলের অনুরূপ ভাবনায় ছিল আবেগের সুতীব্র আক্রমণ। সুধীন্দ্রনাথ তাকেই ব্যাখ্যা করতে গিযে বলেছিলেন, "আবেগের সঙ্গে ছন্দের সংমিশ্রণেই কাব্যের উৎপত্তি।"

* ল্যা ফ্র্যর-এর 'নিউ ডাইরেকশনস্'-এর মার্কিন সংস্করণ থেকে বুদ্ধদেব বসুর অনুবাদ।

অবশ্য এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, কবিতা মাত্রেই যে সঙ্গীত হতে হবে তা নয়। এলিয়টও তা স্বীকার করেছেন।* প্রকৃতপক্ষে, কাব্যের রিদমই (rhythm) হোলো ছন্দস্পন্দ কবিতার বাহন। নজরুলের কাব্যেই এর প্রমাণ মেলে। সম্প্রতি আধুনিক কাব্যের সংজ্ঞায় কেউ কেউ দুটি সূত্রের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করেছেন। প্রথমতঃ, কবিতাকে বিমূর্ত চিত্রকলার শিল্পসৌন্দর্য দান করা, দ্বিতীয়তঃ, কবিতাকে সংগীতের পর্যায়ে উন্নীত করা।

কিন্তু কবিতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বিশেষ করে কবিতার ক্লাসিক রীতিতে প্রথমোক্ত সত্যেরই সমর্থন মেলে। অবশ্য পরবর্তীকালে বিভিন্ন কবির কাব্যগত সংজ্ঞায় সাংগীতিক প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বিশুদ্ধ কাব্যিক অর্থের মর্ম এই দুই অর্থের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়াব সংঘর্ষে। পৃথকভাবেও কবিতায় এই দুই সৌকুমার্যের অবদান কাব্যে নজর এড়ায় না। কিন্তু এই দুই প্রতিক্রিয়ার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে নজরুলের কাব্যে। সম্ভবতঃ রোজার ফ্লাই এবং ক্লাইভ বেল যাকে সংজ্ঞায়িত করেছিলেন নান্দনিক অনুভূতি (aesthetic emotion) বলে নজরুলের অবচেতন মনেও সেই অনুভূতি তাঁর গীতিকবিতায় নিঃশব্দে কাজ করেছিল। ফলে তাঁর অনুষঙ্গবোধ বা প্রতীকীর অসামান্য দক্ষতার মধ্যে ছিল কাব্য এবং শিল্পজনোচিত পরিমিতিবোধ। চিত্র শিল্পীরা যাকে সচরাচর বলে থাকেন শুদ্ধ নিরাসক্ত দৃষ্টি তারই প্রাধান্য তাঁকে এনে দিল রসসুভাষিত শিল্পীর প্রজ্ঞা, যেমনটি ঘটেছিল ইতিমধ্যেই তাঁর বৈদেশিক শব্দের ব্যবহার সম্পর্কীয় সচেতন সজাগর প্রজ্ঞানন্দ শিল্পদৃষ্টিতে।

নজরুলের গীতিকবিতার অন্যতম একটি কৃতিত্ব ইংরেজীর "Stress rhythm" বা শব্দাংশগত ঝোঁককে বাংলায় প্রবর্তন করার মধ্যে। মধুসূদন ছিলেন এতদ্‌সম্পর্কীয় পরীক্ষায় প্রথম পথিকৃৎ। পরবর্তীকালে উল্লিখিত "Stress rhythm" অনুসরণের ফলেই নজরুলের কবিতায় অর্থের গৌরবের সঙ্গে ধ্বনির মূল্যও অসাধারণভাবে বেড়ে গেছে। ফলতঃ, ধ্বনি স্বভাবকৌলিন্যে তাঁর কবিতার অর্থকে একই সঙ্গে আবেগদীপ্ত এবং হৃদয়-সংবেদ্য করে তুলেছে। এই প্রণয়নের সমস্ত কৃতিত্বটাই কবিকৃত বলে কবি প্রসঙ্গত তাঁর কবিতায় গীতিকবিতার ধর্মানুযায়ী "Personal" হয়ে উঠেছেন। গাণিতিক বিশুদ্ধতাকে ছাপিয়ে

* It would be a mistake, however, to assume that all poetry ought to be melodious, or that melody is more than one of the components of the music of words. (Music of Poetry. Selected Prose by T. S. Eliot, P. 56.)

এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে কবির সৃষ্ট ছন্দ ও ভাষার ব্যুৎপত্তি। ছন্দের এই রহস্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি নৈপুণ্যের পারঙ্গম। অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই ছন্দ ক্রিয়ার মধ্যেই কাজ করেছে কবির ঐতিহ্য সচেতনতা। যদিও অতীতের অন্ধ অনুসরণ যাকে কেউ কেউ দেশপ্রেম ভেবে পুলকিত হন তার মধ্যে ঐতিহ্য মোটেই প্রকাশ পায় না। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর মন ফিরে চেয়েছিল প্রাচীন ভাষার গূঢ় নির্যাস। গীতিকবিতার বহু বিচিত্র অলঙ্করণে কবি তার ফলে ছড়িয়ে দিয়েছেন ঐতিহ্যের শুদ্ধ অথচ দীপ্ত প্রকৃতি। Ezra Pound একেই বলেছেন সৌন্দর্য অর্থাৎ পূর্বোক্ত ঐতিহ্যই হোলো সৌন্দর্য।

নজরুল যখন গীতিকবিতার জগতে প্রবেশ করেছিলেন তখন যুদ্ধ-পরবর্তী ভয়ংকর পরিমণ্ডলে কবিতার জগতে এসেছিল হতাশা। বিশেষ করে ভারত-বর্ষের মতো দেশ যেখানে সমজাতীয় মনোবৃত্তির অভাব অনেকটা ঐতিহ্যগত সেখানে বিধ্বস্ত মানবিকতার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নজরুলকে বেছে নিতে হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পরিপ্রেক্ষিত। কাব্যে তাই প্রথাকে অনুকরণ না করে স্বকীয়তার পথে অগ্রসর হতে হয়েছিল তাঁকে। দৃষ্টি দিয়েছিলেন তিনি দেশীয় অনুষঙ্গের দিকে অতি সহজেই। মহৎ কবিদের ভাবনার মতোই তাঁর মনেও প্রাধান্য পেয়েছিল নব্য ভাবনা। তিনি কবিতার মধ্যে প্রবাহিত করতে চাইলেন সেই অনুষঙ্গকে যার ভেতর দিয়ে কবি এবং পাঠক উভয়েই সচল হয়ে উঠবেন। হয়তো আপতিক নির্জন আত্মমগ্নতা সেই কাব্যজনোচিত দায়িত্ব বহনেরই স্পষ্ট অথচ গোপন এক আয়োজন।

সেদিন গীতিকবিতার সেই ফর্ম ছিল সমালোচকদের প্রধান আলোচ্য বস্তু। নজরুলকে অনেক সমালোচক তখন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অভিযুক্ত করেছিলেন। মোহিতলালের প্রশস্তি সত্ত্বেও সেদিন সজনীকান্তের উষ্মা সাধারণ রুচিবোধের সীমাকেও অতিক্রম করেছিল। যাই হোক,সমস্যাটা ছিল মূলতঃ শব্দ ব্যবহারের সীমা বা পরিমিতিবোধ বিষয়ক। কেবলমাত্র অনুরণিত শব্দসমষ্টি নিয়ে ইয়োরোপের কবিরা অজস্র কবিতা রচনা করেছেন। মালার্মের পরবর্তী কবিদের, যথা ভ্যালেরী অথবা বোদলেয়রের কবিতায়ও এ নিয়ে কম পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়নি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরও অনেক ক্ষেত্রে অনুরূপ চর্চায় তেমন অনীহা ছিল না। হয়তো রিচার্ডের কথাই ঠিক যে, শব্দের ভালোমন্দ বলে কিছু নেই, আসল কথা ব্যবহার। নজরুলও উপলব্ধি করেছিলেন যে শব্দ প্রাণহীন, শক্তিহীন একটা জড় পদার্থের মতই একক। কিন্তু যখন আর একটি শব্দ তার সংঘর্ষে মুখোমুখি হোলো এবং উপযুক্ত ব্যবহারের বিনিময়ে বেরিয়ে এল আশ্চর্য এক দ্যুতি তখনই

ধরা পড়লো যে সেটাই কবিতার আসল সৌন্দর্য। কবির সেই সব বিশ্বাস অথবা বর্ণনা যখন সেই দ্যুতির বা আগুনের মধ্যে সমিধ হয়ে আসে তখনই সে লাভ করে আকাঙ্খিত কাব্যিক পবিত্রতাকে। নজরুল 'তা জানতেন বলেই বহু বিচিত্র শব্দ ব্যবহারে গমক সৃষ্টি করেছিলেন তিনি তাঁব অসংখ্য গীতি-কবিতায। এ ক্ষেত্রে তাঁর আবেগ বরং তাঁকে সাহায্যই কবেছে।

কবিদের কর্তব্য সম্পর্কে এলিযট বলেছিলেন, "খারাপ কবি তিনিই যিনি জানেন না কোথায় সচেতন আব কোথায অচেতনের উপর ভর করতে হবে তাঁকে। অন্ততঃ প্রকাশের মুহূর্তে কবিকে জানতে হয পূর্বসূরী বা সমকালীন সিদ্ধিগুলির কথা, তৎসামযিক প্রচলিত বাঁধিবুলির ধবণ বুঝতে হবে তাঁকে, আর সেই বেডাগুলি ভাঙবাব জন্য তৎপব হযে উঠতে হবে সঙ্গে সঙ্গে।"*

নজরুল জানতেন কবি হিসেবে তাঁব উপরোক্ত দাযিত্ববোধেব কথা। ফলতঃ ঐতিহ্যের দিকে দৃষ্টি রেখে তিনি সিদ্ধিব পথে হাত বাডিযেছিলেন এবং এই জন্যে তাঁকে প্রচলিত ঢেউযেব বিরুদ্ধে লডতে হযেছে ধৈর্যশীল এক সাধকের নিষ্ঠা নিযে। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর এই অনুরাগ পরিণতিতে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গীতিকবিতায অসংখ্য কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহারে, অথবা সার্থক পুবাণ প্রযোগ বা উপমা উৎপ্রেক্ষার সার্থক নির্মিতিবোধে। এ ছাডাও বৈষ্ণব পদাবলীব বহু শব্দও নজরুলের কাব্যে সার্থকভাবে সংযোজিত হযেছে।

সুতবাং, সার্থক কবিব মতো তাঁরও মধ্যে ছিল অন্তরপ্রেরণা এবং ভাব-প্রতিভাব সম্মিলন। এবং সম্ভবতঃ এরই ফলে নজরুলের কবিতা ছিল আপন স্বভাবে প্রকৃতিস্থ। এই জন্যে যখন কোনো সমালোচক তাঁকে ইমোশন্যাল বলে আখ্যা দেন তিনিও সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার কবেন তাঁর অফুরান কাব্য-প্রাণের স্পন্দন, মেনে নেন নজরুলকে একটি পরিপূর্ণ যুগ বলে। ** কবি তাই স্বয়ং স্বীকার করেই নিযেছিলেন জীবনের বাস্তবতাকে। নিপীডিত ও বেদনার্ত মানুষের হাহাকার এবং অনুভূতি তাঁকে উত্তেজিত কবেছিল বলেই তিনি শিল্পের চাইতে জীবনকে বড়ো বলে গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও

* নিঃশব্দের তর্জনী : শঙ্খ ঘোষ। পৃঃ ১৬।

** "আজ কখনো মনে হয়, নজরুল যতটা ইমোশন্যাল ততটা লজিক্যাল নন। রচনায় পরিমিতিবোধ সম্পর্কে তিনি অনেকটাই অসতর্ক, শিল্পীর স্বভাবসুলভ মাত্রা বজায় রেখে অনুভূতির বিকিরণের চাইতে তার উন্মত্ত বিদীরণটাই তিনি পছন্দ করতেন বেশী, কিন্তু সেখানেই তো নজরুলের পরিচয়।"
—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সাহিত্য ও সাহিত্যিক।

শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়াশ্রিত ইমোশন্যাল কবিতা কখনোই ব্যর্থ হয়নি। কেননা সেগুলি তাঁর কল্পনা ও অন্তঃপ্রেরণার গুণেই সার্থক হয়ে উঠেছিল। আসলে সব কিছুর মূলে রয়েছে তাঁর সৃজনলীলার আকর্ষণীয় বিচ্ছুরণ। এই দিকটি অনেকের কাছেই বহুদিন তেমন স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েনি। ভুলে গেলে চলবে না যে, বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক বক্তব্য বিষয় এবং ভাবকে কেন্দ্র করেই নজরুল কাব্যচর্চা শুরু করেছিলেন। এবং এই জন্যে তাঁর উচ্চকণ্ঠ কবিতাযও শেষ পর্যন্ত মিলে যায আশ্চর্য এক রূপচেতনা ও এতদসম্পর্কীয় শৈল্পিক কাব্য সৌন্দর্যের স্নিগ্ধ বিকিরণ। ফলতঃ, কবির সব কবিতাই কোনো না কোনোভাবে ভাবের গভীরতার গুণেই পাঠকমনে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। যে কবির মধ্যে রূপচেতনা বর্তমান তাঁর কবিতায় আবেগ যতই তীব্র হোক না কেন শেষ পর্যন্ত তার কাব্যমূল্য কিছুতেই একেবারে নিঃশেষিত হতে পারে না। সুতরাং নজরুলের ভাবনায় রূপচেতনার প্রভাব যেহেতু কৈশোরের রচনাকাল থেকেই পরিলক্ষিত সেহেতু আবেগের অতিশয়তা বা উচ্ছ্বাসের তীব্রতার অভিযোগ অন্ততঃ তাঁর ক্ষেত্রে কোনোমতেই খাটে না।

এ ছাড়া নজরুলের গীতিকবিতার অন্যতম কৃতিত্ব এই যে, কেবলমাত্র নিসর্গ বন্দনাতে কবির সমস্ত প্রয়াস কখনো নিঃশেষিত হয়নি। উপরন্তু তা ব্যক্তিহৃদয়ের গভীর দুঃখ-সুখের অনুভূতির সঙ্গে একাত্মতার অনুভূতি তাঁর কবিতায যেন গভীরতর ভিন্ন এক অর্থকেই সূচিত করেছিল। ব্যক্তিগত উপলব্ধির এই চেতনাবোধের দিক থেকে তাঁর কাব্যে মধ্যযুগীয় রোম্যান্টিক কবিদের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। তাঁদের কাব্যেও না পাওয়ার বেদনাজড়িত হাহাকার কাব্যের ধ্বনির মধ্যে মিশে গিয়ে যে একটি গভীর তাৎপর্যের সূচনা করত তার প্রমাণ বিহারীলাল। নজরুল মধ্যযুগীয় সেই রোম্যান্টিকতাকে তাঁর কবিতায় গ্রহণ করে তাতে আশ্চর্য গতিশীলতা সঞ্চারিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কোনো কোনো সমালোচক* বলেছেন, নজরুলের আবেগ ও অনুভূতির দুর্বার প্রবাহ রূপকল্পকেও অস্থির করে তোলে। এবং, প্রকৃতপক্ষে, নজরুলের উচ্চগ্রামের কবিতা তার শিল্পরূপের জন্য মোটেই প্রিয় নয়, সেগুলো প্রিয় তার অন্তর্নিহিত 'ইমোশন' বা আবেগের স্বভাবোচিত স্বতোৎসারণের জন্যে। সেই সঙ্গে কেউ

* নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্।

কেউ যথার্থই বলেছেন যে, কবিতা শুধু আবেগের বা ইমোশনের স্বতোৎসারণের জন্যেই হৃদয়-সংবেদী হয় না, তার জন্যে কবিতার ভিন্নতর মহিমাও প্রয়োজন যা কবিতার অন্তর্বয়নের মধ্যেই একমাত্র পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু নজরুল তাঁর স্বাভাবিক প্রতিভার বিনিময়েই সেই সব কাব্যিক কৌশল বা বয়নকার্যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। এবং এই সাফল্যের পুরস্কার তাঁর সমগ্র গীতিকাব্যে বিশেষ করে রাজনৈতিক বা সামাজিক কবিতায় আজ আশ্চর্য শিল্পসুষমার গুণে নবমূল্যায়নের মর্যাদা লাভ করেছে।

নজরুলের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে কবির বিষয়বস্তুতে সমসাময়িকতার প্রভাব। সাময়িক ঘটনা, জীবন, রাজনৈতিক ঘটনা বা আবেগের অবলম্বনে এত কবিতা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে কেউ রচনা করেননি। এদিক থেকে ইংরেজ কবি কিপ্‌লিঙ-এর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়। কিপ্‌লিঙ-এর সমসাময়িকতাকে যেমন একদা সমালোচনা* সহ্য করতে হয়েছে, নজরুলের কবিতাও তেমনি সাময়িকতার আবেগদুষ্ট বলে অভিযুক্ত হয়েছিল। কিন্তু কিপ্‌লিঙ-এর কবিতার 'অ-শিল্পায়ত্ত' ত্রুটির অভিযোগ সত্ত্বেও কেবলমাত্র ঐ সাময়িকতার গুণেই সজীব ও প্রাণবন্ত। পাঠকের মনে কিপ্‌লিঙ-এর সমাদর বা প্রতিষ্ঠা এরই ফলে সম্ভব হয়েছিল। তেমনি সমসাময়িকতাকে এড়িয়ে যেতে চাননি বলেই নজরুলের কবিতায় সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রভাব এত বেশী। এবং কবি নিজেও এ সম্পর্কে যে যথেষ্ট সচেতন তারও প্রমাণ আছে।

বস্তুত, গীতিকবিতার সাম্প্রতিক সংজ্ঞায় যে সমস্ত গুণ বিধৃত হয়েছে তার অন্যতম একটি বিষয়বস্তু হোলো সূক্ষ্ম বেদনাবোধ এবং মানবকল্যাণ বিষয়ক সচেতনতা। ইয়োরোপের রোমান্টিক যুগের মানবপ্রেরণা বা জীবনবোধ সম্ভবতঃ এই সংজ্ঞাকে প্রভাবান্বিত করতে সাহায্য করেছিল। নজরুল বিদেশী কাব্য সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হলেও একদা প্রধানতঃ ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, শেলী বা ব্রাউনিঙ-এর কবিতার** সঙ্গে পরিচিত হবার ফলে ইয়োরোপের ঐতিহ্য

---

* 'কিপ্‌লিঙ কাব্যক্ষেত্রে সাংবাদিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এবং অধিকাংশ মুহূর্তেই শিল্পায়ত্ত কবিতা লিখবার চেষ্টা করেননি।'—টি. এস. এলিয়ট।

সূত্র : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ) : মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান।

** নজরুলের জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়—সৈয়দ আলী আশরাফ। (বাংলা বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়, পাকিস্তান)

এবং মুক্ত মানসিকতার সঙ্গে কিযৎ পরিমাণে তিনি যে পরিচয় লাভ করেছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই আধুনিক গীতিকবিতার অধিকাংশ লক্ষণ তাঁর কবিতায় সম্যক পুষ্টিলাভ করেছে। পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতাব অনন্যতা, আত্ম-প্রকাশের প্রবণতা ও রূপকেব ব্যাপ্তি তাঁর কাব্যমানসের অন্যতম উপাদান বলেই আজ স্বীকৃত। আজ সকলেই স্বীকার করেন যে কবির নৈপুণ্য পরিগ্রহণে নয়, পরিবর্তনে। সেদিক থেকে নজরুলের কাব্যে যে গুণাবলী ছড়িযে আছে তার অনুভূতি সকল পাঠকের মনেই চকিতস্পর্শের মাদকতা আনতে সাহায্য করে। এদিক থেকে তিনি অধ্যাপক আলেকজাণ্ডারের কাব্যাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন বলা যেতে পাবে। আলেকজাণ্ডারেব মতে, মহৎ কবিতাকে চেনা যায় বিষযবস্তু দেখে—আঙ্গিক দেখে নয়। অর্থাৎ আঙ্গিকের প্রভাবেব চেয়ে বিষযবস্তুব তাবতম্যের প্রভাব অনেক বেশী গভীর ও ব্যাপক হতে বাধ্য এবং তাঁব মতে এই বিষযবস্তুই শেষ পর্যন্ত কবিতার ভাগ্যকে সাফল্য বা অসাফল্যেব পথে নিযন্ত্রিত কবে থাকে। অবশ্য এই মতামত পেটাব নির্দেশিত Good ও Great Art-এর আলোচনারই প্রতিধ্বনি। কিন্তু নজরুল সেটাকেই অনুসরণ করেছিলেন। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁব কাব্যে এবই ভেতর দিযে বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকেব একটা সমন্বয তিনি ঘটিয়েছিলেন। সমসামযিক কাব্যাদর্শের এই ঝোঁকটি একান্তভাবেই তাঁর নিজস্ব। মহৎ কবিতার যে লক্ষণ আমরা মানি অর্থাৎ significant aspect of human experience তা নজরুলেরও করায়ত্ত ছিল। এবং নজরুলের এই উপলব্ধি মানবতাব সাধারণ অভিজ্ঞতার সাথে সমন্বিত হযেই তাঁব সৃষ্টিকে মর্যাদা দান কবেছিল। অথচ পাশাপাশি অনেক কবিব সৃষ্টি ইন্দ্রিযভোগ্য এবং আবেগাযিত হওয়া সত্ত্বেও সর্বজনীন বা সমষ্টির পবিচিতি না ঘটার ত্রুটিতেই জটিল ও অচেনা হযে পডেছে।*

সাধারণ পাঠকের সঙ্গে কবিব এই মানসিক যোগাযোগই কবিতার গৌরব। মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের কাব্যের এই গৌরবের কথা বিস্মৃত হননি। তাঁর মতে, "কাজী সাহেবের যে দুটি কবিতা (অন্যগুলি পড়িবার সৌভাগ্য এখনো হয নাই) পড়িলাম তাহা দ্বারা মোসলেম ভারতের গৌবব রক্ষা হইয়াছে, বাংলা কবিতার মান বাঁচিয়াছে, লেখক ও পাঠকের মধ্যে চিত্ত বিনিময় হইয়াছে।"**

* T. S. Eliot-এর কবিতা—বিষ্ণু দে।

** মোসলেম ভারত, ভাদ্র, ১৩২৭, পৃঃ ৩৪৪। সম্পাদক মোজম্মেল হক-কে লিখিত পত্র।

নজরুল-পূর্ব বাংলা কাব্যে দেশপ্রেম বিষয়ক কবিতার আয়ু বড়ো বেশীদিনের নয়। ইতিপূর্বে উল্লেখযোগ্য এ জাতীয় রচনায় প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া পূর্ববর্তীদের মধ্যে বিশেষ করে হেমচন্দ্র, বিহারীলাল ও নবীনচন্দ্র সেনের নাম উল্লেখ করা চলে। অবশ্য রঙ্গলাল, করুণানিধান, অতুলপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, কামিনী রায় বা সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কবিরা দেশপ্রেমমূলক কবিতা পরবর্তী-কালে বেশ কিছু রচনা করেছিলেন। এবং এঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম হেমচন্দ্র তাঁর 'ভারত-সঙ্গীত' লিখে বৃটিশ সরকারের রোষদৃষ্টিতে পড়েন।*

লক্ষ্য করবার বিষয়, ১৯২২ সালে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' কবিতাটি লেখার জন্য তাঁর এক বৎসরের কারাদণ্ড হয়েছিল। এবং আদালতে নজরুল নিজের কৃতকার্যের জন্য কোনো ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। যাই হোক, হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত'-এর পরই বাঙালীর কাব্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দেখা দিল। বিষয়বস্তু ও দেশের ইতিহাসের দিকে লক্ষ্য রেখে কাব্য রচিত হতে শুরু করলো। নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯) এই দলের পুরোধা। পরবর্তীকালে পরাধীনতায় বেদনার যে তীব্র আর্তি, তার প্রকাশ ঘটে বিহারীলালের কাব্যে (১৮৩৪-১৮৯৪)।

নজরুল তাঁর কাব্যে দেশী-বিদেশী আখ্যান থেকে আহরিত কাহিনীর মাধ্যমে স্বাধীনতা ও প্রগতির বন্দনা গান করেছেন। নবীনচন্দ্রের মধ্যে যে কাব্যিক ব্যঞ্জনা ও শিল্পনীতির মাধুর্য ছিল নজরুলের কাব্যে তার প্রভাব একেবারেই যে ছিল না তা নয়। কিন্তু নজরুল স্পষ্ট। সোজাসুজি মূর্তিমান প্রতিবাদের মতোই তিনি তাঁর কাব্যে উপস্থিত। নিজেকে কাব্য থেকে আড়াল করার কোনো প্রচেষ্টা নজরুলের মধ্যে নেই। ফলে, কবির ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে কাব্যের অনুভূতি অতি সহজেই একাত্ম হয়ে ওঠে। ভাষায় তাঁর খরসূর্যের তাপ, যেন কোনো কৃত্রিম চারুকলায় কবি প্রতিশ্রুত নন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর সমস্ত কবিতার মধ্যে কাব্যের মর্মরধ্বনিটুকু শেষ পর্যন্ত ধরা দিয়ে যায়। এই বিশিষ্টতাই তাঁকে সকলের চেয়ে পৃথক করে দিয়েছে।

বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে ১৮৭০ খৃঃ প্রকাশিত 'বঙ্গসুন্দরী' সর্বপ্রথম সর্বলক্ষণযুক্ত সার্থক গীতিকবিতা। এ ছাড়া 'সারদামঙ্গলের' গীতিকবিতা সংহতির অভাব সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যদিও বিহারীলালের গীতি-কবিতায় একমাত্র সার্থক গীতিকবিতার আধুনিক ভঙ্গীটি প্রকাশ পেয়েছে।

* উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

কিন্তু পূর্ববর্তীকালে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বাঙালী জীবনে যে সংগঠন যজ্ঞ শুরু হয়েছিল তাতে গীতিকবিতার স্থান কখনোই ছিল না। তবু তাতে ক্ষতি হয়নি।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে সাম্প্রতিককালের গীতিকবিতাকে যথাক্রমে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে—(১) আত্মগত, (২) বিষয়গত ও (৩) তত্ত্বাশ্রয়ী। লক্ষণীয়, এই তিন প্রকারের গীতিকবিতার প্রভাব একালের গীতিকবিতা রচয়িতাদের মধ্যে সবিশেষ লক্ষ্য করা যায়। নজরুলের গীতিকবিতায় বিশুদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাসপ্রসূত আত্মগত গীতিকবিতার সার্থক রূপটি অবশ্য সহজেই ফুটে উঠেছে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে বিষয়গত কবিতার প্রভাব নজরুলের কাব্যে কম। পাশাপাশি তাঁর অজস্র কবিতায় তত্ত্বাশ্রয়ী ভাবের প্রাধান্য চকিতেই নজরে পড়ে। এর মূলে রয়েছে কবির ধর্মবোধ এবং ইসলামী ধর্মবিশ্বাসের বিচিত্র আখ্যানভাগের অভিজ্ঞতা। ব্যক্তিজীবনে কোনো বিশেষ ধর্মের গোঁড়া সমর্থক তিনি হতে চাননি। বরং তাঁর মধ্যে সমস্ত ধর্মের আশ্চর্য একটা সমন্বয়-ভাব পরিদৃষ্ট হয়। প্রক্ষেপণ বা Reflection বলতে যা বোঝায় তা তত্ত্বাশ্রয়ী কবিমনেরই ধর্ম। নজরুলের কাব্যজীবনও এর প্রভাবমুক্ত নয়।

চলতি ঘটনাবলীকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করার পন্থায় বিশ্বাসী দৃষ্টিভঙ্গীকে আধুনিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ইয়োরোপের কাব্য-আন্দোলনেও এমনটি ঘটেছে বহুবার। John Press-এর মতে, "Some great poets, on the contrary, pick up the current coin of imagery and stamp it with the impress of their own burning free and integrity."*

নজরুলের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা বলা যেতে পারে। Press অন্যত্র আরও বিস্তৃতভাবে কবির সাময়িকতার প্রতি অনুরাগ সম্পর্কে বলেছেন, Fashions in poetic imagery become widespread in one of two ways. A great poet, or a dominant figure who has the power of impressing his contemporaries, adopts a number of images which seem to him appropriate for conveying what he has to say.

লক্ষ্য করার বিষয় যে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ইয়োরোপীয় কাব্যভঙ্গীর বিচিত্র পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা কাব্যের ভঙ্গী অলক্ষ্যে সমধর্মিতা খুঁজে পেয়েছিল। তাই নজরুলের কাব্যাংশে অকস্মাৎ যে প্রথাবিহীন দীপ্তি বা প্রাণপুরুষের ঋজু ভঙ্গিমা আমরা লক্ষ্য করি তা কবির একান্ত নিজস্ব মনে হলেও তা সমসাময়িক উপলব্ধিরই পরিণতি।

* The Fire and the Fountain : John Press. P. 169-170.

সৈন্যবাহিনী থেকে প্রত্যাগমনের পর প্রথম দশকটি তিনি প্রধানতঃ ব্যয় করেছিলেন দীর্ঘ কবিতায়। এবং সেগুলি ছিল অধিকাংশ রাজনৈতিক বিষয়াশ্রিত কবিতা। কিন্তু তৃতীয় দশকের অধিকাংশ সময়েই নজরুলের গীতি-কবিতা জোয়ারের মতো বেরিয়ে এসেছে। বিশেষ করে নিপীড়িত শ্রমজীবী মানুষের জীবনযাত্রার প্রতি অনুরাগ বা সহানুভূতি বিষয়ক যে সমস্ত কবিতা তিনি ঐ সময়ে রচনা করেছিলেন তাতে শ্রমজীবীদের কবি বলে সুপরিচিত বিশ্ববিখ্যাত সেই ভবঘুরে লয়েডের (Poet of the toiling masses) কাব্যগ্রন্থ "The Singing Englishmen"-এর কথা মনে পড়ে যায়।* লয়েড ছাড়াও নজরুলের কাব্যে প্রায়শঃ টম পেইন, প্রুধোঁ, গডউইন বা মার্কস-এর বক্তব্যের ছাপ লক্ষ্য করা যায়। যে সব স্থলে তিনি নিষ্ঠুরের জয়গানে মুখর অথবা সকল আইন-কানুনের বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ সেখানেই মূলতঃ এই উক্তি প্রযোজ্য।

অবশ্য নজরুলকাব্য হোলো তাঁর জীবনের চলিষ্ণু সম্বন্ধের দ্বৈত ভাবনার এক মায়াবী সামঞ্জস্য। তাঁর হৃদয় অস্থির। তাঁর জীবনতৃষ্ণা যন্ত্রণাদগ্ধ। কাব্যের ভেতর দিয়ে তাঁর সেই তৃষ্ণা সমাজের সমষ্টিগত মানুষের মানবিক অধিকার অর্জনের তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে বারংবার। প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্য তাই মানবাত্মার মুক্তির প্রয়াসেই প্রধানতঃ বিচ্ছুরিত।

বহুদিন ধরে নজরুলের বিরুদ্ধে একটি প্রচলিত অভিযোগ আছে। অনেকেই বলেছেন যে তিনি আইডিয়ার জগতে বিপ্লব আনলেও আঙ্গিকের জগতে তেমন কিছুই সৃষ্টি করতে পারেননি। এটা ঠিক নয়। বরং ইংরেজীর Stress rhythm, যাকে আমরা বাংলায় বলি শব্দাংশগত ঝোঁক, নজরুল তাকেই বাংলায় প্রবর্তন করেছিলেন।

* ভবঘুরে লয়েড (A. L. Lloyed) বহু বছর জাহাজে জাহাজে মজুরের চাকরী নিয়ে সারা পৃথিবী ঘুরে ঘুরে সুপরিচিত গণসঙ্গীত সংগ্রহ করে বেড়াতেন এবং তাঁরই সংগৃহীত ফসল ঐ কাব্যগ্রন্থ। সমগ্র পৃথিবীর শ্রমজীবী মানুষের মুখের গান সেখানে ঠাঁই পেয়েছে। কলকাতায় খিদিরপুর ডকের কাছাকাছি বিভিন্ন শ্রমিক এলাকায় ত্রিশের দশকে তিনি ঘুরেছিলেন। নজরুলও ঐ একই সময়ে ঐ এলাকায় যেতেন শ্রমিক সংগঠনে উদ্দীপনা সঙ্গীত পরিবেশন করতে। তবে নজরুলের সঙ্গে লয়েডের কখনও পরিচয় হয়েছিল কিনা তা জানা যায়নি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

উদ্দীপক ভাব : দেশাত্মবোধক চেতনা : বিপ্লবী সত্তা

নজরুলের শ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর কাব্যের পৌরুষদীপ্ত আবেগে। কাব্যগীতিতে তাই তাঁর অন্তরের প্রেরণা সর্বত্রই পৌরুষের দৃপ্ত ভঙ্গীতে প্রকাশিত। সমসাময়িক ঘটনাবলীর প্রভাব যেন অতি সহজেই তাঁর কাব্যকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। ফলে সাধারণ মানুষের কাছে এই সব পরিচিত ঘটনা কাব্যের মাধ্যমে তখন থেকেই সাড়া পেয়ে এসেছে। প্রকৃতপক্ষে, শিল্প-সাহিত্যের সঙ্গে জীবনের বাস্তবতা একীভূত হলে স্বভাবতঃই তার শিল্পরূপও প্রকাশকালে ভিন্ন হয়ে পড়ে। কাব্য যদি সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার না করে শিল্পের বাস্তবতার মাধ্যমে তাকে মূর্ত করে তুলতে পারে তাহলেই তা সার্থকতা পেতে বাধ্য। সামাজিক পরিবর্তনের রূপরেখা যখন বদলায় তখনও অতি স্বাভাবিক নিয়মেই শিল্প-সাহিত্যের মধ্যে গভীরভাবে তার প্রভাব পড়ে। যিনি কালকে সময়ের তাল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখতে প্রয়াসী হন তাঁর সৃষ্টি বাস্তবতা থেকে তখন চ্যুত হয় এবং বিস্মৃতির অন্ধকারে সহজেই তলিয়ে যায়।

Christopher Caudwell* তো তাকেই বলছেন কাব্য, সত্যের নব নব উদ্ভাবনে যা নিরন্তর তাৎপর্য খুঁজে পায় সামাজিক এবং অর্থনৈতিক চৈতন্যে। সুতরাং সামাজিক সমস্যা যা মূলতঃ শাসকের শোষণ ও অত্যাচারের মধ্যে কেন্দ্রীভূত কবি তাকে কখনোই সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলতে পারেন না। এবং যিনি জনগণের কবি বলে প্রতিষ্ঠা পেতে আগ্রহী তাঁকে তখন ফিরে যেতে হয় সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে তথা স্বাধীনতার প্রতি নিষ্ঠাবান মননের স্বপক্ষে। সামাজিক দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন যে-কোনো কবির কাছে এই

* "It expresses a whole new world of truth—its emotion, its comradeship, its sweat, its long-drawn-out wait and happy consumption—which has been brought into being by the fact that man's relation to the harvest is not instructive and blind but economic and conscious. Not poetry's abstract statement—its content of collective emotion—is therefore poetry's truth."—Illusion and Reality. P. 20—Christopher Caudwell.

নিষ্ঠা একান্তই বাঞ্ছিত বলে বিবেচিত। নজরুল স্বয়ং এই জাতের কবি। সমসাময়িক ঘটনা বা বিষয়বস্তু যার ফলে অতি সহজেই তাঁর কাব্যের অন্তর্গত হয়ে পড়েছে। সমগ্র জাতীয় মানসে সেদিন যে হীনমন্যতা এবং পরাধীনতার গ্লানি বর্তমান ছিল নজরুল ব্যক্তিজীবনে তা থেকে নিশ্চয়ই মুক্ত ছিলেন না। কিন্তু এই সচেতনতার মূলে অতীতের অনেক ঘটনা কাজ করেছে। সুতরাং তাঁব উদ্দীপক ভাবের পশ্চাতে যে সব ঘটনা প্রভাব বিস্তার করেছে তার সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের ওয়াকিবহাল হওয়া প্রয়োজন।

ইতিহাসের এক যুগসন্ধিক্ষণে বাংলা কাব্যসাহিত্যে নজরুলের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। ইতিপূর্বে সামন্তবাদের অবসানেব সঙ্গে সঙ্গে বুর্জোয়া গণ-তান্ত্রিক বিপ্লব ইযোরোপে দ্রুত প্রসারলাভ করেছে। এবং পরে সেখানে শিল্প বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী যে ফল সেই গণতান্ত্রিক অর্থনীতিব প্রসার ঘটে। বলা বাহুল্য, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় মুনাফার পরোক্ষ পরিণতি হোলো উপনিবেশবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ। এরই অভিশাপ পরাধীনতা। বস্তুতঃ এরই ফলে একে একে দুর্বল রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীতে শক্রকবলিত হযেছিল। শাসকশ্রেণীরা সকলেই ছিলেন ঔপনিবেশিকতাব প্রতিভূ মাত্র। সমগ্র গণ-আন্দোলন অতি স্বাভাবিক নিযমেই তাই দেশে দেশে স্বাধীনতা বা জাতীয মুক্তি আন্দোলনে পরিণত হয়েছিল।

ভারতবর্ষও যখন পৃথিবীর অধিকাংশ পরাধীন দেশের মতোই ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পদানত তখন সেই সন্ধিক্ষণে নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ভারতবর্ষেও প্রথমে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে কিছু কিছু খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী-কালে ক্রমশঃ সারা ভারতব্যাপী সেই স্বাধীনতার সংগ্রাম ছড়িয়ে পড়ে এবং অবশেষে তা মহাবিদ্রোহে পরিণত হয়। গোড়ারদিকে এই সংগ্রাম কোথাও কোথাও ফকির বা সন্ন্যাসী অথবা ওয়াহাবী-ফারায়েজীর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। পরে কৃষকশ্রেণী কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রতিরোধ আন্দোলন যোগ্যতার সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন।

নজরুলের জন্মগ্রহণের অনতিপূর্বে এই আন্দোলনের ঢেউ দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলন। ছাত্রজীবনে মাইকেল কলিন্স ও ডি. ভ্যালেরার নামের সঙ্গে পরিচিত নজরুল লক্ষ্য করলেন মদমত্ত ইংরেজ শক্তির ঘৃণ্য আস্ফালন। তাঁর নজরে এল জাপানী, ব্রিটিশ ও আমেরিকান ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করা সান ইয়াৎ-সেন-এর চীনা প্রজাতন্ত্রী বাহিনী। সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন রুশ বিপ্লবের সংবাদ প্রাপ্তি উপলক্ষে গোপনে উৎসব

অনুষ্ঠান তাঁকে সচকিত করে তুলল। কানে এল পারস্যের শাহ্ কাজারের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের ক্ষোভ, ও আফগানিস্থানের স্বাধীনতাকামীদের আহ্বান। নজরুল খবর পেলেন ইজিয়ান সাগরের উপকূলে সংগ্রামরত মূর্তিমান দুই বিপ্লবীর—মোস্তফা কামাল ও খালিদা এদিন খানুমের। তুরস্কের এই দুই বিপ্লবী নজরুলের কাব্যে উদ্দীপনী ভাবের অন্যতম উৎস।)

অন্যদিকে সৈন্যবাহিনীতে যাবার আগে (১৯১৭) দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার প্রতি যে দুর্বার আকর্ষণ তাঁর মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল, ফিরে আসার পর স্বদেশের মুক্তির চিন্তা তাঁর সেই কবিমানসকেই আচ্ছন্ন করেছিল। বাংলাদেশের কয়েকটি বিপ্লবী দলের কর্মসূচী তাঁকে চঞ্চল করে তুলল। আইরিশ রিপাবলিকান আর্মির কায়দা ও কৌশলে গঠিত 'অনুশীলন' এবং পরবর্তীকালে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী 'যুগান্তব' দলের আবির্ভাব নজরুলের চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক ধারণাকে উৎসাহিত কবেছিল। এছাড়া সাম্যবাদে বিশ্বাসী রুশ দেশের বিপ্লব এবং তৎকালীন বন্ধুস্থানীয় সাম্যবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের প্রভাব তাঁর মধ্যে প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল।

সেই সময় ব্যক্তিগত শৌর্যেব কিছু ঘটনা পর পর তাঁর নজরে আসে। কুমিল্লার প্রফুল্ল চক্রবর্তী,* এবং সুপরিচিত অরবিন্দ, রাসবিহারী, বারীন ঘোষ, চন্দননগরের কানাইলাল, মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতির আত্মত্যাগ এবং সর্বোপরি মদনলাল ধিংড়াব** ফাঁসি তাঁকে উদ্বেল করে তুলেছিল। অনেকের মতো তিনিও নিশ্চিত হলেন যে ইংরেজকে এদেশ ছেড়ে চলে যেতে হবেই। তাঁর মনে ঢেউ তুলল সিপাহী বিদ্রোহের নায়ক ব্যারাকপুরেব মঙ্গল পাণ্ডে † আর বারাসাতেব মুসলিম দরিদ্র চাষী তিতুমীর ‡। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক ঘটনা-

* প্রফুল্ল চক্রবর্তী—দেওঘর পাহাড়ে বোমা বানাতে গিয়ে প্রাণ হারান।

** মদনলাল ধিংড়া—ইনি লণ্ডনে গিয়ে ব্রিটিশ রাজকর্মচারী স্যার কার্জন উইলীকে পিস্তলের গুলিতে হত্যা করে লণ্ডনের পেন্টনভেলি জেলের ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ বিসর্জন দেন।

† মঙ্গল পাণ্ডে—ব্যারাকপুরের একজন সিপাই। এঁরই নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহের আগুন প্রথমে জ্বলে উঠেছিল। ইংরেজরা এঁকে গুলি করে হত্যা করে।

‡ তিতুমীর—জনগণের মধ্যে সর্বপ্রথম এই চাষী মুসলমান ইংরেজ অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগঠিত করেন এবং পরে ইংরেজের হাতে প্রাণ বিসর্জন দেন।

প্রবাহ ইতিমধ্যে তাঁর মনকে উত্তাল করে তুলল। ফলে তাঁর উপস্থিতি তখন বাংলাদেশের সেই অগ্নিযুগের মধ্যাহ্নকে আরও যেন প্রখর করে তুলেছিল। নজরুল সেই মুহূর্তে সমগ্র শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন স্বাধীনতার প্রার্থিত আন্দোলনের তথা যৌবনের বাঞ্ছিত উন্মত্ততার উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে। তাঁর কাব্যের প্রকৃত স্বরকেও তিনি আবিষ্কার করলেন সেদিন জাতীয় মুক্তি আন্দোলন তথা আন্তর্জাতিকতাবাদী ভাবধারার অনুপ্রেরণার মধ্যে। কৈশোরে শিয়ারশোল রাজ হাইস্কুলের শিক্ষক বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের অনুপ্রেরণা তিনি বিস্মৃত হননি। এই নিবারণ ঘটকের উৎসাহেই তিনি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধে অস্ত্রের ব্যবহার যথাযথভাবে আয়ত্ত করে আসা। যদিও তাতে কৈশোরের উচ্ছ্বাসই প্রধানতঃ দায়ী ছিল।

(পরবর্তীকালে সাহিত্যজগতে ফিরে এসে তিনি তার এ গণচেতনার মাধ্যমেই নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন। তাঁর কবিতায় যে উদ্দীপক ভাব প্রতিষ্ঠা পেয়েছে তা প্রধানতঃ স্বাধীনতার স্বপক্ষে দেশের আপামর জনসাধারণকে জাগিয়ে তোলার কার্যে ব্যাপৃত হলেও পরিণতিতে তা পৃথিবীর সমস্ত শাসক ও শোষকদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ আহ্বানের মধ্যে এবং সামাজিক ভণ্ডামী ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, কোনো দেশ, কাল বা জাতির বিশেষ কোনো সংকীর্ণতার মধ্যে তাঁর দৃষ্টি আবদ্ধ হয়নি। ফলে তাঁর কাব্যে যে ভাবোদ্দীপক চেতনার স্ফুরণ ঘটেছে তা সমগ্র কালের সকল মানুষের পক্ষেই প্রযোজ্য।)

নজরুলের উদ্দীপক ভাব-সমৃদ্ধ কাব্যগ্রন্থের মধ্যে প্রধানতঃ অগ্নিবীণা (প্রকাশকাল, ১৯২২ খৃঃ), বিষের বাঁশী (প্রকাশকাল, ১৯২৪), ভাঙার গান (প্রকাশকাল, ১৯২৪), সাম্যবাদী (১৯২৫), সর্বহারা (১৯২৬), ফণিমনসা (১৯২৭), এবং প্রলয়শিখা (১৯৩০) উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সন্ধ্যা (১৯২৯) ও শেষ সওগাত (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থেও উদ্দীপক ভাবের কিছু কিছু কবিতা স্থান লাভ করেছে। উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থগুলির মূল বৈশিষ্ট্য ছিল দুটি : সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ভূমিকা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। এবং এরই ফলে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট সুইন হো'র বিচারে 'ধূমকেতু' পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' (২৬শে মে ১৯২২ খৃঃ) কবিতা লেখার অপরাধে তিনি অভিযুক্ত হন এবং এক বৎসরের জন্যে (জানুয়ারী ১৯২৩ খৃঃ) কারাবরণ করেন। কারামুক্ত হয়ে আসার পরও তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনায় এই উদ্দীপক ভাবটি তুলে ধরেছিলেন। কাব্যসৃষ্টির প্রথম দশকে

তাঁর সমগ্র রচনায় এই গুণটির পরিচয় মেলে। যে সুবিপুল উল্লাস ও আনন্দ নজরুলের এই পর্বের কবিতার শরীর জুড়ে ছিল তার মূলে ছিল তাঁর জীবনের যৌবনধর্মী আবেগ এবং জীবনের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা। প্রকৃতপক্ষে, শাসন-শোষণ এবং সমাজ-সভ্যতার মূল সূত্রগুলি সেই সময়েই তাঁর অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ে। তাঁর উজ্জীবনী কাব্যের দর্শন ছিল প্রগতিবাদী। সমসাময়িক রাজনীতিতে তখন যে জাতীয়তাবাদ প্রচলিত ছিল বাস্তবে তা ছিল প্রধানতঃ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সম্প্রদায়গত মিলনে কেন্দ্রীভূত। কিন্তু অনেক সময় উগ্র জাতীয়তাবাদ এর ভেতর দিয়েই অনেক দেশে আত্মপ্রকাশ করে। নজরুল তা জানতেন। ফলে তিনি জাতীয়তাবাদকে যেমন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলে গণ্য করেছেন তেমনি উগ্র জাতীয়তাবাদের বিনিময়ে আন্তর্জাতিকতাবাদী হিসেবে নিজেকে প্রচার করেছেন। এইখানে গোর্কির সঙ্গে তাঁর মিল লক্ষ্য করা যায়। সাধারণ নিম্নমধ্যবিত্ত এবং সর্বহারার প্রতি তাঁর আহ্বান নজরে পড়ে তাঁর উদ্দীপক কবিতার ছত্রে ছত্রে। এঁদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি এবং শ্রেণী-সংহতির প্রতি কবি আস্থাবান এবং তাঁর কবিতায় এই শক্তির স্বপক্ষে কবিকণ্ঠ সোচ্চারিত। বস্তুতঃ তিনি স্বতঃস্ফূর্তভা ‧ ছিলেন ন্যায় ও সত্যের সাধক—এক কথায় উৎপীড়িতের কবি। তাই মানসিক সত্তা ও স্বাধীনতার অবমাননাকারী ও ক্ষতিকর সামাজিক রীতিনীতির তিনি ছিলেন ঘোরতর বিরোধী।

(তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অগ্নিবীণা'তে যে বারোটি কবিতা রয়েছে তার মধ্যে উপরোক্ত ভাবধারাই মূর্ত হয়ে উঠেছে। নজরুলের সর্বাধিক প্রচারিত কবিতা 'বিদ্রোহী' এর অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া 'ধূমকেতু', 'কামাল পাশা' ও 'শাত্-ইল-আরব' কবিতাও অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। অবশ্য সে-সময় 'অগ্নিবীণা' কাব্যগ্রন্থটিরই সামগ্রিকভাবে সমাদর ছিল বেশী। সুতরাং বলতে গেলে এর সব ক'টি কবিতাই তখন রীতিমত সাড়া জাগিয়েছিল। কোনো কোনো সমালোচক* 'বিদ্রোহী' এবং 'ধূমকেতু' কবিতাদ্বয়কে প্রবল অহমিকার (egotism) প্রকাশ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু আবেগের যে কবিতা যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস এবং প্রাবল্যের উদ্দামতার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করে তার মধ্যে আত্মসচেতনতা এবং অহমিকা অতি স্বাভাবিক নিয়মেই এসে পড়ে। সাধারণ হিসেবের বাইরে না গেলে এই অসাধারণত্বের স্পর্ধা জাগে না। যিনি কাব্যের ঝঞ্ঝায় নাড়িয়ে দেবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন তাঁকে রুদ্রের বেশে আসতেই হবে।

* নজরুল চরিত মানস—ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃঃ ১৭২।

কবিতার পৌরুষ এই অস্বাভাবিকতার আকর্ষণে প্রকাশ পায়। বাংলা কাব্যে এই উদ্দামতা সে-সময় অপরিচিত হলেও জনমানসে তা কেবলমাত্র ঐ আবেগের দুর্দমনীয় শক্তির জন্যেই স্বীকৃতি পেয়েছিল।)

'অগ্নিবীণা'র অন্তর্গত 'কামাল পাশা' কবিতাটি দীর্ঘ এবং এতে প্রধানতঃ যুদ্ধের আবেগ এবং গৌরবময় ভূমিকার কথা বলা হলেও সে আত্মত্যাগ মূলতঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি কবির স্বভাবজাত স্বীকৃতিরই পরিচয় মাত্র। পূর্বে উল্লিখিত তুরস্কের কামাল পাশার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে তিনি কাব্যের মাধ্যমে স্বীকৃতি দিয়েছেন এই কবিতায়। এই কবিতাটি ঐতিহাসিক তথ্যের ত্রুটি সত্ত্বেও ছন্দ ও চিত্রকল্পের সার্থক ব্যবহারে অভিনন্দিত। উপরন্তু, নাটকীয়তার সার্থক প্রয়োগ ও পরিমিতিবোধের গুণে কবিতাটি যুদ্ধ বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে একটি সার্থক প্রতীকে রূপান্বিত হয়েছে। কবিতাটি নাটকীয় প্রসাদগুণ ছাড়াও কেবলমাত্র উল্লাস এবং বিষাদপূর্ণ বিষয়-গাঁথার যুগপৎ সংমিশ্রণে অন্যতম কাব্যনাট্য-রসাশ্রিত হবার গুণেই সবিশেষ মর্যাদা পাবার যোগ্য। 'কামাল পাশা' 'বিদ্রোহীর'ও আগেকার রচনা (১৯২১ খৃঃ)। 'কামাল পাশা' কবিতাটি রচনাকালে কামাল পাশা পরিপূর্ণভাবে জয়লাভ করেননি। অথচ নজরুলের কবিতাটি তাঁর জয়লাভকে কেন্দ্র করে রচিত। যুদ্ধের সময় কামাল পাশার সঙ্গে আন্‌ওয়ার পাশার কোনো যোগাযোগ ছিল না। কিন্তু নজরুল অনেকের আপত্তি সত্ত্বেও আনওয়ার-এর নামটি কবিতার মধ্যে ঢোকান। কামাল পাশা গ্রীকদের বিরুদ্ধে ১৯২২ সালের ১৮ই আগষ্ট যুদ্ধ শুরু করে ৯ই সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত জয়লাভ করেন।*

('বিদ্রোহী' কবিতাটি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে বিপুল স্বীকৃতি পেয়েছিল তার মূলে ছিল কবিতাটির অন্তঃস্থিত শক্তি। বলতে দ্বিধা নেই, নজরুল সে-সময় অবচেতন মনের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ নৈরাজ্যবাদী চিন্তার (anarchism) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।) কিন্তু 'বিদ্রোহী' কবিতায় পরিণতিতে প্রচলিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আত্মশক্তির উদ্বোধনের আহ্বান ঘোষিত। স্রষ্টার ভূমিকায় কবি কখনো সুন্দরের জয়গানে ব্যাকুল হলেও আবার ধ্বংস বা প্রলয় আহ্বানের বিষাণ তাঁর কণ্ঠেই বেজে উঠেছে এই কবিতায়। কিন্তু এই বৈপরীত্যের দাহ তাঁর সমগ্র কবি-মানসে। স্রষ্টার সৃষ্টির অস্থিরতাই এই দ্বিধা বা দ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে। কিন্তু পরিণতিতে তা খুঁজে পেতে চেয়েছে সার্থক সৃষ্টি বা সংস্কৃতির সুস্থ পরিবেশ।

* কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ, পৃঃ ৩৯৫।

'বিদ্রোহী' কবিতার মূলধন এই গতিতে। কাব্যের সামগ্রিক বিচারে চ্যুতি বা ঘাটতি থাকলেও কেবলমাত্র আবেগ এবং উদ্দামতার আহ্বান এই কবিতার স্রষ্টাকে সহজেই বিজয়ীর মাল্যদান করেছে। এমন কি সজনীকান্তের ঈর্ষা-প্রসূত প্রচারেও তাঁর জনপ্রিয়তা সেদিনের মতো আজও বিন্দুমাত্র কমেনি। আসল কথা, বাংলা কাব্য উদ্দীপক ভাবকে সর্বপ্রথম তীব্রভাবে আবিষ্কার করেছিল এই কবিতায়। এইখানেই 'বিদ্রোহী'র সার্থকতা।)

'অগ্নিবীণা'র প্রথম কবিতা 'প্রলযোল্লাস' (রচনাকাল, এপ্রিল ১৯২২) কুমিল্লায় রচিত হয়েছিল। মূলতঃ রুশ বিপ্লবের প্রতি লক্ষ্য রেখে আগত সামাজিক বিপ্লবের আহ্বান জানানো হয়েছে এই কবিতায়। তিনি বিশ্বাস করতেন যে জগৎ জোড়া বিপ্লবের মধ্য দিযেই আমাদের দেশের বিপ্লব আসবে। 'প্রলয়োল্লাস' বিপ্লবের (প্রলয়) জন্যে উল্লাস। এই কবিতাটি এই পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

'অগ্নিবীণা'র অন্যান্য কবিতাগুলিতে মুসলমান সমাজ জীবনের পরিচিত ত্রুটিগুলির প্রতি নজরুল অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। এই কবিতাগুলিতে ইসলাম ধর্মের গৌরবের কথা স্মরণ করে সমসাময়িক অবস্থার প্রতি কবি ব্যথিত চিত্তে পুনরায দৃষ্টিদান করতে বারবার অ - ন জানিযেছেন। মুসলিম গণ-জাগরণের প্রতি আস্থাবান এবং ঐতিহ্যের প্রতি সশ্রদ্ধ কবি এই সব কবিতায় অবিরত স্মরণ করেছেন অতীতের অজস্র বীরত্বগাথা এবং সেই সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে পুনরায় জেগে ওঠার আহ্বান।

জনৈক সমালোচক প্রসঙ্গত লিখেছেন যে, ধর্মীয় অনুপ্রেরণা ও ঐতিহ্যিক সূত্রমূলে মধ্যযুগের মুসলিম কবিরা বাংলা কাব্যে যে মানবসত্তাব উদ্বোধন ঘটিয়ে-ছিলেন, নজরুলে সে উত্তরাধিকার নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে।* এবং কেবল তাই নয়, উপরোক্ত কবিতাগুলি সে-সময় সমগ্র মুসলিম মানসকে গভীরভাবে আলোড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। পরবর্তীকালে মুসলিম তরুণ মানসের চিন্তায়, কর্মে ও স্বদেশ ভাবনার বিচারে এই সব কবিতার প্রভাব অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। ইতিপূর্বে মুসলিম কাব্য বা সাহিত্য জগতে এই গতিময়তার (Dynamism) অভাব ছিল খুব বেশী। অবশ্য পরবর্তীকালে মুসলিম তরুণ সমাজ ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামী বা প্রচলিত ধর্মীয় মোহান্ধতা থেকে মুক্ত হয়ে

* নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা—মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ, পৃঃ ২২।

এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। তথাপি, আজকের এই প্রগতিবাদী তরুণ সমাজ নিঃসন্দেহে সেদিনের নজরুল-ভাবনা ও বিশ্বাসেরই সার্থক পরিণতি।*)

'অগ্নিবীণার' পর 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থটি (প্রকাশকাল, '১৯২৪) কবির দেশপ্রেমমূলক অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা। 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ ব্রিটিশ সরকার বাজেযাপ্ত করেছিল। স্বাধীনতালাভের পরে ১৯৪৯ খৃঃ এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। উদ্দীপক ভাব পর্যাযের এই গ্রন্থটি দেশের যুব সমাজের হৃদয়কে গভীরভাবে আন্দোলিত করেছিল। কবির বিদ্রোহী চেতনার স্বতঃস্ফূর্ত স্ফুরণ ঘটেছে এই কাব্যে। মেদিনীপুরবাসীর উদ্দেশে নিবেদিত 'ভাঙার গান' গ্রন্থটির প্রথম কবিতাটি চিত্তরঞ্জন দাশকে তাঁর 'বাংলার কথা' পত্রিকার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে কবি লিখে দিয়েছিলেন (রচনাকাল, ১৯২১-২২)। সক্রিয় বিপ্লবের জয়গান সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়েছিল এই কবিতায়। গীতিকবিতার গুণাশ্রিত এই কবিতাটি সমগ্র বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে অতুলনীয়। কবিতাটি তেজোদীপ্তি ও সাংগীতিক প্রসাদগুণে সে-সময় থেকেই সভা-সমিতিতে সমবেত সঙ্গীতের মর্যাদা পেয়েছিল। এমন কি প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে আজও বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা বা প্রগতিবাদী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতাটি গাওয়া হয়ে থাকে। অত্যাচারের সমস্ত প্রতীককে ধ্বংস করার আহ্বান 'ভাঙার গান' কবিতার চারটি অংশ জুড়ে রয়েছে। তরুণ ঈশানের প্রতি ধ্বংস নিশান উড়িয়ে দেবার ডাক দিয়েছেন নজরুল। ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়িয়ে তালা ভেঙে বন্দীশালায় তরুণকে আগুন জ্বালাবার আহ্বান সেদিন গণমনসে নতুন উদ্দীপনা জাগিয়েছিল।)

'ভাঙার গান'-এর দ্বিতীয় কবিতা 'জাগরণী' কুমিল্লায় রচিত** (রচনাকাল, ১৯২১) এবং ইংল্যাণ্ডের যুবরাজ প্রিন্স অফ্ ওয়েলস-এর আগমনকে কেন্দ্র করে

* "নজরুলকাব্যে ইসলামী ও মুসলিম ঐতিহ্য বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। তাঁর এই কাব্যধারার দুর্বার গতিবেগ বাংলার মুসলিম মানসে এনেছে নতুন আলোড়ন। মীর মোশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ প্রমুখ কবিরা নজরুলের আবির্ভাবের আগেই স্বাজাত্যবোধের বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, কিন্তু সে বাণী বজ্রকণ্ঠ ছিল না, ছিল অর্ধোচ্চারিত। নজরুলের শক্তিমন্ত আহ্বান তাদের চিত্তে জাগরণের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিল।"—ঐ, পৃঃ ৯৬।

** "১৯২১ সালের দুর্গা পূজার সময়ে সে দ্বিতীয়বার কুমিল্লা গিয়ে বেশ কয়েকদিন সেখানে ছিল। সেই সময়ে ইংল্যাণ্ডের যুবরাজের (প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌সের) ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'বোম্বেতে পৌঁছানো উপলক্ষে সারা দেশে

কুমিল্লার রাস্তায় রাস্তায় নগরবাসীকে নিয়ে তা গাওয়া হয়েছিল। কবিতাটি প্রতিবাদ স্বরূপ লেখা বলেই সম্ভবতঃ প্রকাশকালে তিনটি লাইন পরে বাদ দেওয়া হয়েছে। কবিতাটি বিভিন্ন কারণে ঐতিহাসিক তাৎপর্য ও গুরুত্ব অর্জন করেছিল। কেননা, রাজপ্রতিভূকে সম্বর্ধনার পরিবর্তে সেদিন দেশবাসীর অন্তরের সত্যকেই এই কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে।

'মিলন গান' কবিতায় অনাগত ভবিষ্যতের প্রতি আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে। 'হিন্দু মুসলমান' বিরোধ ও সংঘর্ষকে পরিত্যাগের আহ্বান এই কবিতার ছত্রে ছত্রে। এই দুই সম্প্রদায়ের উৎস-শক্তির মিলিত সম্ভাবনায় কবি আস্থাবান। অবশেষে তাই কবির বিশ্বাস :

(ঐ) বিশ্ব ছিঁড়ে আনতে পারি। পাই যদি ভাই তোদের প্রাণ।
(মোরা) মেঘ-বাদলের বজ্র বিষাণ (আর) ঝড়-তুফানের লাল নিশান ॥

গান হিসেবেই 'মিলন গান' এই গ্রন্থের 'ঝোড়ো গান' এবং 'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান', 'আত্ম-প্রযাণ গীতি', 'ল্যাংবগুশ বাহিনার বিজাতীয সঙ্গীত' অথবা 'সুপার (জেলের) বন্দনা' কবিতার মতোই গীতিগুণাশ্রিত। এগুলির মধ্যে গীতি-কবিতার মাধুর্য যেমন বর্তমান তেমনি আবার উদ্দীপনা ভাবের প্রেরণায় এগুলি ভরপুর। কিন্তু শেষ দুটি কবিতা 'দুঃশাসনের রক্ত-পান' এবং 'শহিদী-ঈদ' কবিতায় সঙ্গীতময়তা বলতে গেলে প্রায় অনুপস্থিত। কবি সন্ত্রাসবাদকেই যেন এ কবিতায় সমর্থন করেছেন। কিন্তু সেখানে কবির আবেগ ও শোষিতের প্রতি ঘৃণা ও অভিযোগ, প্রচলিত অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ইতিহাসের ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে শেষোক্তটির মধ্যে প্রচলিত মেকী ধর্মবোধ ও মৌলভীদের কৃত্রিমতার প্রতি আঘাত করা হয়েছে যথেচ্ছভাবে। তাই তো খোলাখুলি আক্রমণ করে নজরুল লিখেছিলেন :

হরতাল ঘোষিত হয়েছিল। কুমিল্লাতেও যে হরতাল হবে তা আগে হতে স্থির হয়েছিল। ওই তারিখের জন্যে একটি গান রচনার অনুরোধ নিয়ে প্রবোধচন্দ্র সেনের (তখন মুক্ত রাজবন্দী, আর এখন স্বনামখ্যাত অধ্যাপক) তরফ হতে শ্রীশৈলেশচন্দ্র সেন, হেমেন্দ্র ভট্টাচার্য (মৃত) ও উমেশচন্দ্র চক্রবর্তী (এখন কলকাতার বিখ্যাত সার্জন, এফ-আর-সি-এস্) নজরুলের সঙ্গে দেখা করেন। সে তাঁর বিখ্যাত 'জাগরণী' তখন রচনা করে।" কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা —মুজফ্ফর আহ্মদ, পৃঃ ৪০৬।

নামাজ—রোজার শুধু ভড়ং।
ইয়াউয়া পরে সেজেছ সং,

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য বলেছেন,—

"রাষ্ট্রিক আন্দোলনের উৎস ও নির্ভর যে প্রাণশক্তি তার পরোক্ষ উদ্গাতা ছিলেন মোহিতলাল এবং প্রত্যক্ষ উদ্গাতা কাজী নজরুল ইসলাম। শেলীর **'Make me thy lyre'** যেন মূর্ত হয়ে উঠল নজরুলের 'অগ্নিবীণা'য়। শেলীর রোম্যাণ্টিকতার এই ঝোড়ো দিকটার স্পর্শ পেয়েছিল তখন বাংলা কবিতা। নির্বাধ, উদ্দাম, উত্তাল জীবনেরই প্রেরণা দিয়ে চলবে যেন কবিচিত্ত। বাংলার সন্ত্রাসবাদের আত্মা যেন এতদিনে কথা কয়ে উঠল 'নাদির শাহের জাগরণে' (মোহিতলাল), 'বিদ্রোহী'তে (নজরুল)।" কবি জীবনানন্দ দাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পৃ: ২৫।

শৈলেশচন্দ্র সেনের মতে 'জাগরণী'তে আরও তিনটি লাইন ছিল। সেগুলো কি করে যে বাদ গেল তার কোনো হদিশ আজও পাওয়া যায়নি। লাইন তিনটি হোলো—

সর্বনাশ। সর্বনাশ
আসিছে তাদেরি রাজকুমার
ওগো নির্ভীক পুরবাসী আজ খুলো না দ্বার।

'মোহান্তের মোহ-অন্তের গান' কবিতাটি তারকেশ্বরের দুর্নীতিপরায়ণ, দুশ্চরিত্র মোহান্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপলক্ষে রচিত। নজরুল এই আন্দোলনে নিজেও অংশগ্রহণ করেছিলেন।

ত্যাগ নাই তোর এক ছিদাম
কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা কর জড়,
ত্যাগের বেলাতে জড়সড়।
তোর নামাজের কি আছে দাম?

পবিত্র ঈদ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য এই কবিতায় সুপরিস্ফুট। তাঁর মতে, "আমাদের নয়, তাদের ঈদ / বীর-সুত যারা হল শহীদ, / অমর যাদের বীরবাণী।" কবি যে তাঁর বিশ্বাসবোধের ক্ষেত্রে সমস্ত সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিলেন তার প্রমাণ 'ভাঙার গান' কাব্যগ্রন্থের অনুরূপ তাঁর রচিত অজস্র অসাম্প্রদায়িক এবং হিন্দু-মুসলমান প্রীতির সংহতিমূলক উদ্দীপনী কবিতা।

'বিষের বাঁশী' এই পর্যায়ের তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। 'বিষের বাঁশী' (প্রকাশকাল, ১৯২৪) নানা কারণে নজরুলের কাব্যালোচনার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমতঃ 'ভাঙার গান' এবং 'বিষের বাঁশী' একই সময়ে প্রকাশিত হয় (১৯২৪ খৃঃ)। 'বিষের বাঁশী' এবং 'ভাঙার গান' দুটি কাব্যগ্রন্থই সরকার বাজেয়াপ্ত করেছিলেন। 'বিষের বাঁশী' সম্ভবতঃ আগে প্রকাশিত হয়েছিল (১৯২৪ খৃঃ আগষ্ট মাসে, বাংলা ১৬ই শ্রাবণ ১৩৩১ সাল)। 'ভাঙার গান'ও প্রকাশিত হয়েছিল শ্রাবণ, ১৩৩১ সালেই। কিন্তু তাতে কোনো প্রকাশকাল বা তারিখের উল্লেখ নেই। যাই হোক, 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নামে যে সব কবিতা বা গান বিজ্ঞাপিত হয়েছিল সেগুলোই শেষ পর্যন্ত 'বিষের বাঁশী' নামে প্রকাশিত হয়।

'বিষের বাঁশী'র অধিকাংশ কবিতা 'অগ্নিবীণা' গ্রন্থের মুখবন্ধে 'কৈফিয়ৎ'-এর আড়ালে নজরুল লিখেছিলেন,—"নানা কারণে 'অগ্নিবীণা' দ্বিতীয় খণ্ড নাম বদলে 'বিষের বাঁশী' নামকরণ করলাম। বিশেষ কারণে কয়েকটি কবিতা ও গান বাদ দিতে বাধ্য হলাম। কারণ, 'আইন' রূপ 'আযান ঘোষ' যতক্ষণ তার বাঁশ উঁচিয়ে আছে, ততক্ষণ বাঁশীতে তথাকথিত 'বিদ্রোহ'-রাধার নাম না নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। ঐ ঘোষের পো'র বাঁশ বাঁশীর চেয়ে অনেক শক্ত। বাঁশে ও বাঁশীতে বাঁশাবাঁশী লাগলে বাঁশীরই ভেঙে যাবার সম্ভাবনা বেশী। কেননা, বাঁশী হচ্ছে সুরের, আর বাঁশ হচ্ছে অসুরের।"

"...এত বন্ধুর এত চেষ্টা সত্ত্বেও অনেক দোষ-ত্রুটি রয়ে গেল আমার অবকাশহীনতা ও অভিমন্যুর মত সপ্তরথীপরিবেষ্টিত খতবিক্ষত অবস্থার জন্য। যাঁরা আমায় জানেন, তাঁরা জানেন, আমার বিনা কাজের হট্টমন্দিরে অবকাশের কি রকম অভাব এবং জীবনের কতখানি শক্তি ব্যয় করতে হয় দশ দিকের দশ আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্য।" 'বিষের বাঁশী'র অধিকাংশ কবিতা 'অগ্নি-বীণা'র পরবর্তী স্তরের সার্থক ও সাফল্যমণ্ডিত প্রচেষ্টার রূপায়ণ। জাগরণের অগ্নিমন্ত্রে দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলাব মন্ত্র এই কাব্যগ্রন্থে ছড়িয়ে ছিল। ছন্দ বা পয়ারের মধ্যেও আশ্চর্য এক সুশৃঙ্খলার প্রকাশ ঘটেছে 'বিষের বাঁশী'তে।

তাঁর জীবনদর্শনের মৌলিক সত্যটি যে কটি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিশেষ করে রাজনৈতিক দিগ্‌দর্শনের সূচক হয়েছে 'বিষের বাঁশী' তার মধ্যে অন্যতম। আমাদের সাহিত্যে বহুকাল ধরে কাব্য সম্পর্কীয় প্রচলিত একটা মোহান্ধতা আছে। অনেকেরই বিশ্বাস, প্রকৃতি বিষয়ক কাব্য ছাড়া অন্য কোনো বিষয়কে আশ্রয় করে সার্থক কবিতা রচিত হতে পারে না। ফলে মিল বা ছন্দ ছাড়া

আর সব কিছুই সেকালে গৌণ বলে বিবেচিত হোতো। অথচ কবিতার বিষয়বস্তু বা 'কনটেন্ট' যে কবিতার সাফল্যকে কতখানি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা তখনো অনেকের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। ইয়োরোপে সেই প্রচলিত সীমাকে কবিরা অতিক্রম করেছিলেন অনেক আগেই। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকের রচনায় বহুবিচিত্র দিকে সর্বপ্রথম পরিক্রমা শুরু করেছিলেন। নজরুল কিন্তু প্রথমেই প্রচলিত রাস্তা থেকে সরে এসেছিলেন। তাঁর কবিতার মৌলিকত্ব প্রধানতঃ তাঁর মানবদরদী, সংগ্রামী, বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যেই প্রকাশিত। পরাধীন ভারতবর্ষে মানুষের নিপীড়িত মূল্যবোধ এবং মৈত্রীবন্ধনের অন্তরায় শাসকগোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিপালিত সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধ ভাবধারার তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ উদ্‌গাতা। 'বিষের বাঁশী' কবির সেই ভাবনাব দ্যোতক। তাঁর বিদ্রোহ প্রচলিত অসাম্যের বিরুদ্ধে। শাসন ও শোষণ জাতীয় অত্যাচার ও প্রথার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ বারবার গর্জে উঠেছে। 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থ সেদিক থেকে নজরুলের সেই বিশ্বাস, ভাবনা এবং প্রেরণারই বাণীরূপ। তাঁকে বিদ্রোহী বলে যাঁরা এককালে বিদ্রূপ করেছেন তাঁরা নজরুলকে চেনার চেষ্টা করেননি।

তাই বলে নজরুল কখনোই গোঁড়া জাতীয়তাবাদী হয়ে ওঠেননি। আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী কবি তাই পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতির স্বপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। কোনো নীচতা বা ঘৃণ্য লোভ তাঁর কাব্যভাবনাকে আচ্ছন্ন করেনি। অসংগতির বিরুদ্ধে নজরুল যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তারই বহিঃপ্রকাশ তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায়। 'বিষের বাঁশী' সেদিক থেকে তাঁর সার্থক কাব্যভাবনার রূপায়ণ।

এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা পূর্বতন কাব্যগ্রন্থের তুলনায় অপেক্ষাকৃত ছোটো। পরাধীনতার বিরুদ্ধে কবির গর্জনমিশ্রিত কণ্ঠস্বর এই কাব্যগ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে।

প্রথম দুটি কবিতা 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্‌'-এর 'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' পর্যায় মূলতঃ মুসলিম জাতির ঐতিহ্যকে জাগ্রত করার স্বপক্ষে আহ্বান। ঐতিহ্য-বিস্মৃত মুসলমান সম্প্রদায়কে মুক্তিমন্ত্রে সঞ্জীবিত করাই ছিল কবির লক্ষ্য। ধর্মীয় এই পবিত্র উৎসবকে কেন্দ্র করে যে প্রচলিত আখ্যান মুসলিম মানসে প্রতিষ্ঠিত তার প্রতীককে অবলম্বন করে কবি তিরোভাবে যেমন একটি নিটোল বেদনার ছবি অঙ্কন করেছেন, তেমনি সুকৌশলে ধর্মের জয়গানের মাধ্যমে ন্যায়ের

উদ্বোধনকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাজাজিলের আরশ যে হৃতচ্যুত হবেই তারই সম্ভাবনা ফুটে ওঠে কবির বিশ্বাসবোধে,—

ভেদি'—ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি'—মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার।
বেদী-পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার। ওঙ্কার
শঙ্কারে করি লঙ্কার পার করি ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা-সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
ভূমা—নন্দেরে সব টুটেছে অহং-কার।

'সেবক' কবিতা ছন্দের মাধুর্যময় ঝংকার এবং দেশমাতৃকার মুক্তি-প্রয়াসের উদ্বেলতায় পরিপূর্ণ। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' তাঁকে এই কবিতার বিষয়বস্তু চয়নের ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে এমন কথা কেউ কেউ বলেছেন।* কিন্তু যখন নজরুল লেখেন—

বিশ্ব-গ্রাসীর ত্রাস নাশি আজ আসবে কে বীর এসো
ঝুট শাসনে করতে শাসন, শ্বাস যদি হয় শেষও!
—কে আছে বীর এসো।
'বন্দী থাকা হীন অপমান!' হাঁকবে যে বীর তরুণ,—
শির-দাঁড়া যার শক্ত তাজা, রক্ত যাহার অরুণ,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের,
খোদার রাহায় জান দিতে আজ ডাক পড়েছে তাঁদের।
দেশের পায়ে প্রাণ দিতে আজ ডাক পড়েছে তাদের,
সত্য-মুক্তি স্বাধীন জীবন লক্ষ্য শুধু যাদের।

তখন মনে হয়, পরিচিত দেশমাতৃকার বন্ধন-মুক্তির আহ্বানে নজরুলের কণ্ঠ এই কবিতায় বেজে উঠেছে।

নজরুল নিজে কখনোই বিশেষ কোনো ধর্মের জয়গানে মেতে ওঠেননি। অন্ততঃ এই কবিতায় তার কোনো লক্ষণ নেই। তার সন্তান ধর্ম? আমাদের সাহিত্যে মাতৃপূজার সম্ভাব্য সকল নিবেদনের ক্ষেত্রে সন্তান বাৎসল্য মূলতঃ ঐতিহ্যানুসারী। সুতরাং সেক্ষেত্রে নজরুল আবেগের সিক্ততায় তাঁর কল্পলোকের তরুণ অনাগতকে এই পরাধীন স্বদেশভূমির মুক্তিসাধনের জন্যে স্মরণ করেছেন মাত্র। অন্য কোনো প্রভাব তাঁর ক্ষেত্রে জরুরী বা বর্তমান ছিল না।

* নজরুল চরিত মানস—সুশীলকুমার গুপ্ত, পৃঃ ২১৮।

'জাগৃহি' কবিতায় মাতৃরূপের শাস্ত্রীয় বর্ণনাই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। 'আনন্দমঠ'এর সঙ্গে তার সাদৃশ্য বা মিলকে একান্তই কাকতালীয় বলা চলে। এখানে দেবী বিশ্বব্যাপী অসুরদলনী শক্তির প্রতীকে রূপান্তরিত। নজরুল-কল্পিত দেবী শুভ শক্তির প্রতিনিধি বলে স্বীকৃত। যথা—

এসো শুদ্ধা মাতা এই কাল-শ্মশানে
আজ প্রলয়-শেষে এই রণাবসানে !
জাগো জাগো মানব-মাতা দেবী নারী !

'তূর্য-নিনাদ' কবিতায় কোরাস গানের সুরটি বর্তমান। এই কাব্যগ্রন্থে হাফিজের 'য়ুসোফে গুম্ গশ্‌তা বাজ জায়েদ বু-কিন্‌আন্ গম্ মখোর' গজলটির ভাবধারায় লিখিত 'বোধন' কবিতাটি কবির ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের আশ্বাসে নিবদ্ধ বলে ভিন্নধর্মীর মর্যাদা বিশেষভাবে লাভ করেছে। এই কবিতাটিও সঙ্গীত-ময়তায় পরিপূর্ণ। 'বিষের বাঁশী'র অধিকাংশ কবিতাই গানের মর্যাদা লাভ করেছে। নজরুল নিজেই তা উল্লেখ করেছেন এবং বিভিন্ন সময় সেগুলোকে গান হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

'উদ্বোধন' এবং 'অভয়মন্ত্র' কবিতা দুটিতে দেশবাসীদের প্রতি অগ্নিমন্ত্র আহ্বান এবং বিশেষ করে আমরা যাকে বলি কবিতার পৌরুষ সেই ভাব বা সুরটি সোচ্চারিত। প্রথম কবিতায় প্রভুর সাহায্য প্রার্থনায় কবি সকাতর অথচ বজ্রনির্ঘোষ আহ্বানে যুগপৎ মুখর।

ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব।
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব
বাজাও !

কিন্তু 'অভয়মন্ত্র' আত্মচেতনায় ভরপুর। গান্ধীর গ্রেফ্‌তারকে নজরুল সান্ত্বনার ভঙ্গীতে গহণ করলেও তিনি বিশ্বাস করতেন যে, শাশ্বত সত্যকে কেউ বন্দী করে রাখতে পারে না। ব্যক্তিসত্তার উর্ধ্বে চিরন্তন সত্যের স্বপক্ষে তাই নজরুল জয়গান গাইলেন। লিখলেন,

বল্, পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয় ?
তুই আত্মাকে চিন, বল্ 'আমি আছি, সত্য আমার জয়।'

'আত্মশক্তি' কবিতায় সত্যের প্রতিহারী বিদ্রোহী অনাগতের আহ্বান ব্যক্ত হয়েছে। কবি ব্যক্তিগত জীবনেও বিশ্বাস করতেন যে 'না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর'।

'মরণ-বরণ' কবিতায় নজরুল 'মরণ'কে উদাত্তভাবে আহ্বান জানিয়েছেন। পুরোনোকে ধ্বংস করে নতুনের প্রস্তাবনা একমাত্র কাম্য বলে নজরুলের বিশ্বাস। তাই মরণকে এই কবিতায় বাতিল করার অস্ত্র বা মাধ্যম হিসেবে কবি গ্রহণ করেছেন।

এ ছাড়া, বন্ধনকে ছিন্ন করতে যাঁরা প্রয়াসী, যাঁরা বন্দী হয়ে কারাবাসে মুক্তির হাসি হাসেন তাঁদের বন্দনা গান করেছেন নজরুল 'বন্দীর বন্দনা'য়। সমগ্র দেশব্যাপী মুক্তি আন্দোলনের জোয়ার সেদিন কারাগারে পৌঁছেছিল। কবির মতে, বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে। উতল কলরোলে॥'

পরবর্তী কবিতা 'বন্দনা-গান' শৃঙ্খল ভাঙ্গার পথিকদের উদ্দেশে রচিত। কবির প্রশ্ন 'মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন?' তিনি সশ্রদ্ধচিত্তে সেই সব বন্দীদের স্মরণ করেছেন। কারাবাসে যাঁরা শৃঙ্খল বরণ করেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে কবির বক্তব্য হোলো—

> "মুক্তির লাগি মিলনের লাগি আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ
> হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান॥"

'মুক্তি-সেবকের গান' ও 'শিকল-পরার গান' এই দুটি কবিতা রচনার মূলে কবির সঙ্গীতধর্মী মানসিকতা অধিকতর প্রভাব বিস্তার করেছে। 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই 'গান' হিসেবে উল্লেখিত। কিন্তু তথাপি 'শিকল পরার ছল' কবিতায় যেন কাব্যোচিত সুষমার চেয়ে সাংগীতিক ছন্দ বা তেজোদ্দীপ্ত ভাবটি বেশী সাফল্যলাভ করেছে। ঐ কাব্যগ্রন্থে পরবর্তী কবিতাবলীর মধ্যেও গীতিধর্মী রচনার প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। অনেক অগ্নি-সৈনিকের (দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে উৎসর্গীত প্রাণ) দীর্ঘ ছয় বৎসর কারাবাসের পর মুক্তি উপলক্ষে এই অভিনন্দন গীতিটি রচিত হয়। বন্দীর মুক্তিকে কবি সাদরে বরণ করে স্বাধীনতার নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন 'মুক্তবন্দী' কবিতায়। অবশ্য আগের কবিতা 'শিকল-পরার গান' রচনার পশ্চাতে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কদগ্রন্থ হয়েছিল বলে তা আরও তীব্র হয়ে

উঠেছে আবেগের তীব্রতায়। সর্বোপরি 'শিকল-পরার গান' সুর-ছন্দ ও তালের সার্থক পরিমিতিবোধ এবং নব প্রেরণার ভাবধারায় উদ্বেলিত। 'শিকল-পরার গান' কবিতাটি ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় প্রকাশকালে 'খাম্বাজ-দাদরা' কথাটি শিরোনামার নীচে ছাপা ছিল এবং কবি স্বয়ং সেই সঙ্গে এর স্বরলিপিও প্রকাশ করেছিলেন।

ঐ একই পত্রিকায় প্রকাশিত (১৩৩১) 'যুগান্তরের গান' কবিতায় কবির চারণকবিসুলভ ভঙ্গীটি চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। পরবর্তী কবিতা 'চরকার গান' গান্ধীজীর চরকা আন্দোলনকে উপলক্ষ করে রচিত। নজরুল একদা গান্ধীজীর চরকা প্রবর্তন ব্যবস্থাকে হিন্দু-মুসলমানের সৌভ্রাত্র্য এবং মিলনসূত্র বলে মনে করেছিলেন। ফলে চরকা আন্দোলনে উৎসাহিত কবি তৎকালীন ইংরেজ সরকার-বিরোধী বিদেশী দ্রব্য প্রবর্তনের কূট প্রচেষ্টাকে ধিক্কার জানিয়ে, এবং দেশী সুতীবস্ত্রের প্রচারে উৎসাহী হয়ে 'চরকার গান' লিখেছেন। চরকার চলমান ভঙ্গীটিও এই কবিতার সুরের মধ্যে মিশে গেছে। এটি 'খাম্বাজ-কীর্তন-দাদরা' তালে গাওয়ার নির্দেশ ছিল এবং কবির স্বকৃত স্বরলিপিটি ১৩৩১ সালে 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

জাতি, ধর্ম বা বর্ণ নিয়ে সামাজিক কুসংস্কার সমাজকে বহুকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এখনও তা একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। নজরুল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার নিরিখে এর অভিশাপ এবং ফলাফল চরমভাবে অনুভব করেছিলেন। সামাজিক স্তরে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। নজরুল এই বিষয়টিকে ধিক্কার জানিয়ে প্রথমে 'জাত-জালিয়াৎ' শিরোনামায় একটি কবিতা লিখেছেন এবং 'বিজলী' পত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছিল। পাদটীকায় লেখা ছিল, 'মাদারিপুর শান্তিসেনা চারণদলের জন্য লিখিত অপ্রকাশিত নাটক থেকে।' পরে কবিতাটি 'বিজলী' থেকে 'উপাসনা' পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছিল (১৩৩০, শ্রাবণ)। বর্ণ-বিভেদ বিশেষ করে শ্রেণীগত দ্বন্দ্ব ও কলহের কুৎসিত রূপ এবং তার পরিণতির প্রতি এ কবিতায় কবির দৃষ্টিপাত ঘটেছে। ঘৃণ্য, মতলববাজ মোড়লদের প্রতি নজরুল সুতীব্র কশাঘাত করেছেন এই রচনায়। বাঙালীদের সামাজিক জীবন বর্ণভেদের নীচতা ও অন্যায়ের উপর সে-সময় স্থাপিত ছিল। অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত পরিবারসমূহের জাতি-ধর্ম ভেদের প্রভাব তখনও একেবারে মুছে যায়নি। এই কবিতাটি ছিল সনাতনপন্থীদের প্রতি সেদিক থেকে একটি বৃহত্তর চ্যালেঞ্জ। জাতিগত ভেদাভেদ সমাজের

প্রতিটি স্তরে যে সর্বনাশ করেছে তার দিকে কবি দেশবাসীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করেছেন।*

'সত্যমন্ত্র' কবিতায় বিধাতার নির্দেশিত সত্যমন্ত্রের পথে চলার আহ্বান ফুটে উঠেছে। প্রসঙ্গতঃ কবি গান্ধীজীকে সত্যদ্রষ্টা ও মানবতার যোগ্য প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেছেন।

এছাড়া, 'বিজয় গান' (শ্রাবণ ১৩২৮), 'পাগল পথিক' ও 'ভূত ভাগানোর গান' কবিতাত্রয় প্রধানতঃ দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ। শেষোক্ত কবিতায় হাস্যরস এবং সামাজিক স্তরে মোহান্ধতার প্রতি আঘাত করার পদ্ধতিটুকু পাঠকের চোখ এড়িয়ে যায় না। অবশ্য একে বাউলের গান বলেই কবি উল্লেখ করেছিলেন। 'পাগল পথিক' রচনাটি (১৩২৮, ভাদ্র) 'মোসলেম ভারত'এ 'গান' (সুর—মেঘ-ছায়ানট, তাল—দাদরা) শিরোনামায় ছাপা হয়েছিল।

কবির 'বিষের বাঁশী'র অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা 'বিদ্রোহীর বাণী'। এই রচনায় নজরুল বিদ্রূপ এবং সুকঠোর সমালোচনার পরিচয় দিয়েছিলেন। 'বিদ্রোহীর বাণী' প্রথমে (১৩৩১, বৈশাখ) 'ভারতী'তে 'এবার তোরা সত্য বল' নামে ছাপা হয়েছিল। স্বাধীনতার নামে যে ভণ্ডামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে বর্তমান ছিল নজরুল তাকে আক্রমণ করতে দ্বিধা করেননি। মিথ্যাশ্রয়ী কার্যকলাপের জন্য দেশের নেতৃস্থানীয় অনেকেই কাপুরুষ ও ফেরেববাজ বলে কবির বিচারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। কবি সমগ্র যুব ও তরুণ সম্প্রদায়কে এই মিথ্যা ভীরুতা ও কাপুরুষতার বিরুদ্ধে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

'অভিশাপ' কবিতায় নজরুল আত্মশক্তির পরিচয় দিয়ে নিজেকে নতুন করে

*" 'জাতের বজ্জাতি' কবিতাটি সম্পর্কে যে ইতিহাস প্রচলিত আছে তা নিয়ে কিছুটা মতদ্বৈধ আছে। একদল বলেন, 'নলিনাক্ষ্য সান্যালের বিয়েতে নজরুলকে আমন্ত্রণ না করা সত্ত্বেও কয়েকজন বন্ধু তাকে নিয়ে গিয়ে বিয়ে বাড়িতে হাজির করেন...কিন্তু হিন্দু গোঁড়ামির আবহাওয়ায় বিক্ষুব্ধ হয়ে নজরুল বিয়ে বাড়িতে বসেই এই কবিতাটি রচনা করেন" (ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত—নজরুল চরিত মানস, পৃঃ ২২৪)। কিন্তু আর একজন বলেন যে ঐ বিয়েতে আমন্ত্রিত নজরুলকে বিয়ের বাসরেই অপমানিত করা হয়েছিল। মুসলমান বলে সেদিন সমাজের কর্তারা সদলবলে বিয়ে বাড়ি ত্যাগ করার হুমকি দিলে নজরুল এই কবিতাটি রচনা করে উপস্থিত সবাইকে শোনান এবং সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে।

উপলব্ধি করেছেন। তাই এই দৃপ্ত প্রতিবাদ পরোক্ষভাবে তাঁর অন্তঃস্থিত বেদনা ও নিখিল মানবের প্রতি তাঁর সহানুভূতিরই প্রকাশ।

কবির কারাজীবনের স্মৃতিকে স্মরণে রেখে 'মুক্ত পিঞ্জর' কবিতাটি রচিত। কারাবাস থেকে মুক্তি পাবার পর কবি লক্ষ্য করেছিলেন যে তিনি মুক্ত হলেও দেশজননীর তাতে মুক্তি ঘটেনি। দেশজননীর প্রকৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই আক্ষেপের সুরে এই কবিতার মধ্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত।

'বিষের বাঁশী'র শেষ কবিতা 'ঝড' এই পর্যাযের দীর্ঘতম কবিতা। একদা এক সন্ধ্যায় প্রকৃত ঝড়ের একটি দৃশ্য দেখে কবি উৎসাহিত হয়ে অসুস্থ (জ্বর) অবস্থাতেও সেই সময় হুগলীতে এই কবিতাটি রচনা করেছিলেন।* বিষয়বস্তুর দিক থেকে কবিতাটি বাস্তবে একটি ঝড়ের সার্থক বর্ণনা হলেও নিজেকে ঝড়ের সাথে তুলনা করে কবিতাটিকে অবশেষে স্বীয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কবি প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং ফলে কবিতাটি সামগ্রিকভাবে একটি সার্থক প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে। ঝড বিষয়ক বিখ্যাত কবিতা 'Ode to the West Wind' (P. B. Shelley) এবং রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটি এর সমগোত্রীয় হলেও নজরুলের 'ঝড' শব্দের ঝংকারে ঝড়ের পূর্ণাঙ্গ রূপটিকে যেন আরও অধিক উজ্জ্বল করে তুলেছে। প্রকৃতপক্ষে, এই রচনাটি নজরুলের বিপ্লবধর্মী প্রচারের বাহন বা vanguard-এ পরিণত হয়েছে। কবিতাটি নজরুলের কাব্যদর্শন বিচারের দিক থেকেও তাই অত্যন্ত জরুরী। কেননা এই কবিতায় নজরুলের কণ্ঠ সোচ্চার। কবি লিখেছেন,

"আমি ঝড়? ঝড আমি?—না, না, আমি বাদলের বায়।
বন্ধু! ঝড নাই
কোথায়?
ঝড় কোথা? কই?—
বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ—
ঐ শোনো, শোনো তার হ্রেষার চিক্কুর,"

১৯২৫ খৃঃ প্রকাশিত 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থটি ডিসেম্বর মাসে প্রথম পুস্তিকা আকারে বের হয়। মোট এগারোটি কবিতা সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থে নজরুলের নিজস্ব বিশ্বাস ও মানসিকতার পরিচয় মেলে। এর অধিকাংশ কবিতাই মূলতঃ সাম্যবিষয়ক। এবং বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে কবি তাঁর কাব্যে সাম্যবোধের

* প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

নবমূল্যায়ন করেছিলেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় তাঁর কবিতায় এরই মাধ্যমে সমান মর্যাদা পেয়েছিল। এ সম্পর্কে কবি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছিলেন 'লাঙল' পত্রিকায় (১৬ই ডিসেম্বর ১৯২৫) প্রকাশিত নিম্নোক্ত রচনায়—"নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা-সূচক স্বরাজ্য লাভই এই দলের উদ্দেশ্য—চরম দাবী" (লাঙল)। 'লাঙল' শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ-সম্প্রদায়ের সাপ্তাহিক মুখপত্র। সাম্যবাদের অধিকাংশ রচনা উক্ত 'লাঙল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের আলোচনা প্রসঙ্গে আবদুল কাদির লিখেছেন—"ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণিমনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট। তাঁর 'মৃত্যু ক্ষুধা' উপন্যাসের আনসার চরিত্রটি এই আদর্শবাদের আলোকে বিকশিত।"

এই কাব্যগ্রন্থের প্রায় প্রতিটি কবিতায় নজরুলের রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব সবিশেষ লক্ষণীয়। সামাজিক অসাম্য অর্থাৎ ধনী-দরিদ্রের পরিচিত অর্থনৈতিক অসাম্য, অবিচার এবং শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে কবির পুঞ্জীভূত ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে এই কাব্যে। হিন্দু-মুসলমান, মন্দির-মসজিদ এবং ঈশ্বর-আল্লায় বিশ্বাসীদের পরস্পর সম্প্রীতি ও সদ্ভাবের পক্ষে এই কবিতাগুলি অত্যন্ত কার্যকরী হয়েছিল। তাঁর মতে, শাস্ত্র নয়, মন্ত্র নয়, অন্তরের শাশ্বত উপলব্ধিই জীবনের শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার।

'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের নামকরণের দিকে লক্ষ্য করলে সহজেই বোঝা যাবে যে, কবি জীবনের মৌলিক বিশ্বাস বা প্রতীক সম্পর্কে আমাদের সনাতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সচেতনভাবেই আঘাত করতে চেয়েছেন। 'ঈশ্বর', 'মানুষ', 'পাপ', 'চোর-ডাকাত', 'বারাঙ্গনা', 'মিথ্যাবাদী', 'নারী', 'রাজা-প্রজা', 'সাম্য' অথবা 'সাম্যবাদ' নামগুলোর মধ্যেই কবিতার বিষয়বস্তু পাঠকের মনে স্পষ্ট হয়ে ওঠার সম্ভাবনা। রাজনৈতিক দলের সংস্পর্শে এসে প্রচলিত সংস্কারগুলোর প্রতি স্বভাবতঃই কবির নজর পড়েছিল। কবিতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের গণ-জাগরণ ঘটানোর উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ তিনি সেই সব পরিচিত ঘটনা বা ব্যক্তিগত সহানুভূতি বা উপলব্ধিকে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বলতে দ্বিধা নেই যে, অতি সাধারণ বা অতি পরিচিত বিষয়কে নজরুলকাব্যের অন্তর্ভুক্ত করায় এইসব কবিতায় ভাবের গভীরতা, কাব্যগত শিল্পরূপ অথবা কাব্যের বিমূর্ত প্রস্তাবনা অতি স্বাভাবিকভাবেই অনুপস্থিত বলে প্রতিভাত হয়েছে।

কিন্তু ভাবের জোয়ারে এবং কবির সুপ্রচলিত আবেগের টানে কবিতাগুলি অতি পরিচিত ঘটনা ও সত্যের নতুন আলোতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। একেই বলা যেতে পারে প্রতিবাদী কবিতা।* এই সব মিথ্যা, অন্যায় এবং অপরাধ বহুকাল ধরেই ছিল। কিন্তু কাব্যজগতে তার প্রতিবাদ এত সুকঠোরভাবে আগে দেখা যায়নি। এইখানেই 'সাম্যবাদীর' বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ, এরই গুণে পাঠকসমাজে সুদীর্ঘকাল ধরে এই কাব্যগ্রন্থের জনপ্রিয়তা এতটুকুও কমেনি। আবৃত্তির ক্ষেত্রেও এই কাব্যগ্রন্থটির যথেষ্ট সমাদর বর্তমান।

বস্তুতঃ, আত্মসচেতন কবি হলেই তাঁকে প্রতিবাদী হতে হয়। কেননা, অস্তিত্বের যন্ত্রণা ও সমস্ত 'অসুখ' ছায়া ফেলে তাঁর ঐ কবিতায়। ইয়োরোপে কবিদের ক্ষেত্রে এই বোধ অত্যন্ত তীব্র। তাই বাহ্যিক বা জীবনের সমস্ত সুখ ও শান্তির পরেও এক গভীর অস্বস্তিকর দুঃখ তাঁদের আঘাত করে। তাঁদের প্রতিবাদী কবিতার কণ্ঠস্বর তাই কখনোই থেমে যায়নি। স্পেনে লরকার মৃত্যুর কারণ সেই প্রতিবাদী কবিতা কিংবা পল এলুয়ার যিনি নাৎসী অত্যাচারের বিরুদ্ধে আত্মস্থ অথচ তীব্র বিদ্বেষী তাঁর প্রতিবাদধর্মী কবিতায়। এঁরা অস্তিত্বের অতন্দ্র প্রহরী বলেই সামাজিক উৎপীড়ন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে-ছিলেন। পাবলো নেরুদাও এঁদের সমগোত্রীয়। চিলির এই বয়োজ্যেষ্ঠ কবির সঙ্গে নজরুলের কাব্যধারার সবিশেষ মিল আছে। অন্তরঙ্গ নম্রস্বরের কবিতা বলতে যা বোঝায় সেই ধরনের কবিতার পাশাপাশি শাসক সম্প্রদায়ের অত্যাচার, শোষণ এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কবিতার জনক ছিলেন নেরুদা। সমসাময়িক ব্রেখটও তাই। নজরুলও এই দুই ভিন্ন রসের কবিতা পাশাপাশি আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে রচনা করেছিলেন। রাজনীতির সঙ্গে নজরুলের ন্যায় নেরুদারও ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। প্রায় সমসাময়িক এই দুই কবির চিন্তাধারার অত্যাশ্চর্য মিলটি সবিশেষ লক্ষণীয়।

তুলনামূলকভাবে কবির 'চিত্তনামা' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থটি অপেক্ষাকৃত ছোট। মাত্র পাঁচটি কবিতা এতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-জায়া শ্রীমতী

* "পাঁচমহলা মিনার থেকে দৃষ্টি অবশ্য ক্রমেই সরে আসছিল, 'জ্যৈষ্ঠের দুপুরে গলদঘর্ম বলদ লয়ে চষে যারা রাঙা মাটি' সেই তাদের দিকে, তবু নজরুল ইসলামই বাংলায় প্রথম যথার্থ প্রতিবাদের কবি"—অশ্রুকুমার সিকদার।

বাসন্তী দেবীকে উৎসর্গীত এই কাব্যগ্রন্থে প্রধানতঃ দেশবন্ধুর প্রয়াণ বিষয়ক কবিতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ফলে এই গ্রন্থের 'চিত্তনামা' নামকরণের যথার্থতা অনুভব করা যায়। প্রয়াত নেতার প্রতি কবির শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এই কবিতাগুলির অন্যতম বিষয়বস্তু।

প্রথম কবিতা 'অর্ঘ্য' একটি ছোট্ট মুক্তাবিন্দুর মতোই কবির অন্তরের আপ্লুত বেদনার প্রগাঢ় রসে সিঞ্চিত। 'অকাল সন্ধ্যা' কবিতার যে রসানুভূতি পাঠককে মুগ্ধ করে তা কবির জ্ঞাতসারেই ঘটেছে। সাংগীতিক গুণে সমৃদ্ধ এই কবিতাটি জয়জয়ন্তী রাগাশ্রিত এবং একটি জনপ্রিয় লিরিকধর্মী কবিতা হিসেবেও এটি মর্যাদা পাবার যোগ্য। 'অকাল সন্ধ্যা'র পর 'সান্ত্বনা' কবিতাটির কথা উল্লেখ করা যায়। এই কবিতায় চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুর বেদনাকে কেন্দ্র করে কবি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে যেন বিরহের অতলস্পর্শী সীমাকেও স্পর্শ করতে প্রয়াসী হয়েছেন। সান্ত্বনাও যে ক্ষেত্রবিশেষে কত মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ মেলে কবিতাটির শেষ দুটি চরণে এসে। যেমন—

> আবার যদি না জন্মাত, মৃত্যুতে সে হাসত না।
> আসবে আবার—নইলে ধরায় এমন ভালো বাসত না।

এছাড়া এই কাব্যগ্রন্থের দীর্ঘ কবিতা 'ইন্দ্রপতন'এ কবি চিত্তরঞ্জনের বিবিধ গুণাবলীর প্রশস্তি এবং প্রাচীন দৈবগাথা এবং শাস্ত্রীয় প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। হিন্দু-মুসলমানের বহু দেবদেবীর উপমাও এতে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে।

এই কাব্যগ্রন্থের সর্বশেষ কবিতা 'রাজভিখারী'তেও গীতিকবিতার মাধুর্যটি চমৎকার ফুটে উঠেছে। আবেগসিক্ত কবি এখানে বেদনামিশ্রিত নিভৃত কোণের উদ্বেলতা বারংবার প্রকাশ করেছেন। ফলে আশ্চর্য-সফল-সুন্দর উপমা বা অলঙ্কারের সুষমা ঠাঁই পেয়েছে নজরুলের এই কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে যেখানে কবি লিখেছেন—

> "আঙিনা তোমার নিলে বেদনার গৈরিক রঙে রেঙে,
> মোহ-ঘুমপুরী উঠিল শিহরি চমকিয়া ঘুম ভেঙে।"

এখানে নজরুল বেদনাকে গৈরিকছটায় আবৃত করে যে মাধুর্য সৃষ্টি করলেন তাকেই অকস্মাৎ তীব্র করে তুললেন 'মোহ-ঘুমপুরী'র শিহরণে এবং 'চমকিয়া ঘুম ভেঙে' ব্যবহারে সুতীব্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার মাধ্যমে।

'চিত্তনামা'র পাঁচটি কবিতা মূলতঃ দেশবন্ধুকে উপলক্ষ করে রচিত হলেও স্বাধীনতা আন্দোলন এবং দেশপ্রেমই ছিল এই কবিতাগুলির প্রেরণার উৎস। সেদিক থেকে সমসাময়িক ঘটনাপঞ্জির বিচারে এই গ্রন্থটির গুরুত্ব নিঃসন্দেহে অসামান্য।

'সর্বহারা' (প্রকাশকাল, ১৯২৬) কাব্যগ্রন্থেও মূলতঃ সাম্যবাদীর ন্যায় নান্দনিক ভাব বর্জিত কবিতাই স্থানলাভ করেছে। শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবীকে উৎসর্গীকৃত এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু 'সর্বহারা' নামকরণের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। 'সর্বহারা' কবিতায় সহায়-সম্বলহীন দরিদ্র মানুষের মনের অবস্থা সহৃদয়তার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। সর্বহারাদের মধ্যে জেলে, কৃষক, ধীবর, ছাত্রসমাজ ইত্যাদির প্রতি কবির সহৃদয়তা ও সমর্থন প্রকাশ সুপরিচিত। কৃষকের পরিশ্রমজাত ফসল শয়তানে দখল করে নেবার ফলে তাদের লাঞ্ছনা, অভাব ও কষ্টের সীমা নেই। এই শোষণের বিরুদ্ধে নজরুল সমস্ত কৃষক সম্প্রদায়কে জেগে উঠে সংগঠিত হবার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন 'কৃষাণের গান' কবিতায়। নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের জন্য রচিত 'শ্রমিকের গান' কবিতায় কবি একই মনোভাব প্রকাশ করেছেন। কবি ঐ সম্মেলনে (৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৬) ঐ গানটি নিজে গেয়েছিলেন। ধীবরদের সম্মেলনের জন্যে রচিত 'ধীবরদের গান' কবিতায় কবি ধীবর জীবনের সুখ-দুঃখ ও বেদনার কথা চমৎকারভাবে প্রকাশ করেছেন। এটি প্রথমে 'লাঙল' পত্রিকায় 'জেলেদের গান' নামে (১৪ই মার্চ ১৯২৬) ছাপা হয়েছিল। ছাত্রসমাজের সম্মেলনের জন্য রচিত 'ছাত্রদলেব গান' কবিতার মধ্যেও ছাত্রসমাজের গৌরব-জনক ভূমিকার জয়গান করেছেন নজরুল। উপরোক্ত সমস্ত কবিতায় কবি উক্ত সম্প্রদায়সমূহের গৌরবের কথা স্মরণ করে তাদের জেগে ওঠার জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন। এই সব কবিতায় কবির আবেগ অত্যন্ত তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ফলে দেশের সাধারণ মানুষের কাছে এই কবিতাগুলি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছিল এবং এর প্রভাব যে সমগ্র দেশের জনমানসের উপর যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল তা বলা যেতে পারে।

এই কাব্যগ্রন্থের 'ছাত্রদলের গান' ১৯২৬ খৃঃ মে মাসে রচিত এবং কৃষ্ণ-নগরে ঐ তারিখেই ছাত্র সম্মেলনের উদ্বোধন-সঙ্গীত হিসেবে কবি এটি পরিবেশন করেছিলেন।

যুব সম্মেলনের (২২শে মে ১৯২৬) জন্য লেখা 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতাটিও কৃষ্ণনগরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন-

সঙ্গীত রূপে নজরুল গেয়েছিলেন।* তখনকার সাম্প্রদায়িকতায় বিষাক্ত বিদ্বেষের বিরুদ্ধে নজরুল দেশবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন এই কবিতায়।

পরবর্তী 'ফরিয়াদ' কবিতায় কবি ঈশ্বরের কাছে বিভিন্ন অভিযোগ করেছেন। এবং সকল প্রকার সামাজিক অসাম্য ও অত্যাচারের জন্যে ভগবানকে সহস্র প্রশ্নবানে জর্জরিত করেছেন। যদিও অবশেষে নিপীড়িত জনতার নতুন অভিযান, উত্থান এবং বিজয়ের বার্তাও সদর্পে কবি ঘোষণা করেছিলেন এই কবিতার শেষ কটি ছত্রে এসে।

'সর্বহারা' কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠতম ভাবোদ্দীপক কবিতা 'আমার কৈফিয়ৎ' 'বিজলী'তে প্রকাশিত হয়েছে (১৩৩২ সালের ৫ম বর্ষ ৫১ সংখ্যায়)। এই কবিতাটিতে কবির আত্মদর্শন চমৎকারভাবে প্রকাশিত হয়েছে। উপরন্তু সমসাময়িক সামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক হতাশা ও অচলাবস্থাপ্রসূত আক্ষেপ এই কবিতাটিকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে অধিকতর গুরুত্ব প্রদান করেছে। নজরুলের ব্যক্তিগত আবেগ ও উচ্ছ্বাস এই কবিতায় একই সঙ্গে বেদনা, হতাশা ও অভিমানে পরিপূর্ণ। কবি বেদনায় তিক্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে লিখেছেন—

> রক্ত ঝরাতে পারি না ত. ..,
> তাই লিখে যাই এ রক্ত-লেখা
> বড় কথা বড় ভাব আসে নাক মাথায়, বন্ধু, বড় দুখে।
> অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু, যাহারা আছ সুখে।

কবি সাধারণ মানুষের স্বপক্ষে বীর সৈনিকের মতোই লড়াইয়ের পক্ষপাতী। তিনি তাই তাঁর 'রক্তলেখায়' তাদের সর্বনাশকে লিখতে চেয়েছেন 'যারা কেড়ে খায় তেত্রিশ কোটি মুখের গ্রাস'। তিনি বলতে চেয়েছেন মর্মান্তিক দারিদ্র্যের কথা, সামাজিক অসাম্যের কথা, এবং সেইসঙ্গে শোষণ আর শাসনের অভিশপ্ত বেদনাভরা ইতিহাসের কথা। নারীর অপমান, দাসত্ব, শিশুর ক্ষুধার তীব্র জ্বালা

* "নজরুল ইসলামকে এই সকল সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্যে এত বেশী কাজ করতে হচ্ছিল যে তার কোনো অবকাশই ছিল না। তবুও সে প্রথম তিনটি সম্মেলনের উদ্বোধনী সঙ্গীত শুধু রচনা করেনি, সেই সঙ্গীতগুলিতে সুর দিয়েছিল এবং সম্মেলনগুলিতে গানগুলি সে গেয়েওছিল।...বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্যে সে লিখেছিল 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার'।"—কাজী নজরুল ইসলাম স্মৃতিকথা—মুজফ্ফর আহ্মদ, পৃঃ ৩৬৮।

কবির কোমল হৃদয়কে সহজেই এই সময় বিচলিত করেছে। 'আমার কৈফিয়ৎ' সেদিক থেকে কবির জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ দলিল। এই কবিতায় সর্বনাশের যে প্রার্থনা কবির কণ্ঠে সোচ্চার তা এই কালের বা এই শতাব্দীরই অভিশপ্ত জীবন-দর্শনের প্রকৃত কণ্ঠস্বর যা ক্রমশঃ বেদনায় আজ ক্ষতবিক্ষত।

'সর্বহারার' শেষ দুটি কবিতা 'প্রার্থনা' ও 'গোকুল নাগ'। প্রথম কবিতাটিতে অনাগত বীরের 'বজ্র-সমুদ্যত' আগমনকে আবাহন জানিয়েছেন। এই প্রার্থনা কবি বেদনা বিমোচনের যুগ-সেনানায়কের উদ্দেশ্যেই করেছেন যাতে নব 'অরুণোদয়' ঘটতে পারে। সর্বশেষ কবিতা 'গোকুল নাগ' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২ প্রকাশিত) কবির সাহিত্যিক বন্ধু গোকুল নাগের (সহ-সম্পাদক, 'কল্লোল') অকস্মাৎ মৃত্যুকে স্মরণ করে রচিত।* দীর্ঘ এই কবিতায় কবির বন্ধুপ্রীতি ও স্নেহের প্রগাঢ় পরিচয় অত্যন্ত বিশ্বস্তভাবে ফুটে উঠেছে। নিরহংকার আত্ম-প্রচারে অনিচ্ছুক এই সাহিত্যিক বন্ধুর বহুবিধ গুণের উল্লেখ করেছেন নজরুল এই কবিতায়। তাঁর মরমী হৃদয়ের পরিচয় এর প্রতিটি ছত্রে। আবেগের তীব্রতা ও অনুভূতির গভীরতার দিক থেকে কবিতাটি নিঃসন্দেহে বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

'ফণিমনসা' কাব্যগ্রন্থে (প্রকাশকাল, শ্রাবণ ১৩৩৪) কবির সমস্ত আবেগ এবং উচ্ছ্বাস কিছুটা ভিন্ন প্রেক্ষাপটে প্রকাশিত। এর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে কবির বিদ্রোহী সত্তাটি বিচিত্র বিষয়বস্তুর ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'সব্যসাচী' কবিতায় দেশবাসীর উদ্দেশে কবি জেগে ওঠার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন। শান্তির মিথ্যা স্তোত্র সম্পর্কে কবি এখানে তাঁর দৃঢ় এবং সুকঠিন মতামত প্রকাশ করেছিলেন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের পথে শাসক দলের কোনো ভুয়ো আশ্বাসে দেশবাসীকে না ভোলার কথা বারংবার নজরুল এখানে স্মরণ করেছেন। তথাকথিত দেশসেবকদের হামবড়া ভাবের বিরুদ্ধেও এই কবিতায় তিনি বিদ্রূপের কশাঘাত করতে দ্বিধা করেননি। 'সব্যসাচী' কবিতার শেষ চরণে কবি যা বলেছেন, তার মধ্যে তখনকার পরিচিত ভণ্ড নেতাদের ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কবির মতে—

* গল্পগ্রন্থ 'সোনার ফুল' এবং উপন্যাস 'পথিক'-এর লেখক গোকুল নাগ মাত্র একত্রিশ বৎসর বয়সে (৮ই আশ্বিন ১৩৩২) দার্জিলিঙে অকস্মাৎ পরলোকগমন করেন।

মশা মেরে ঐ গরজে কামান—বিপ্লব মারিয়াছি।
আমাদের ডান হাতে হাতকড়া, বাম হাতে মারি মাছি।
মেনে শত বাধা টিকটিকি হাঁচি,
টিকি দাড়ি নিয়ে আজো বেঁচে আছি
বাঁচিতে বাঁচিতে প্রায় মরিয়াছি, এবার সব্যসাচী,
যা হোক একটা দাও কিছু হাতে, একবার মরে বাঁচি।)

'দ্বীপান্তরের বন্দিনী' কবিতায় ভারতবর্ষের পরাধীনতার গ্লানি ও বেদনার কথা বন্দিনী ভারতমাতার ভেতর দিয়ে যেন প্রতীকধর্মী হয়ে উঠেছে। প্রবর্তকের ঘুরচাকায় অতীতকে পরিত্যাগ করে নবীনকে আহ্বান জানিয়েছেন কবি। ছন্দের জাদুই এই কবিতাটির বড়ো সম্পদ।

চট্টগ্রামের শামসুন নাহারের 'পুণ্যময়ী' পুস্তকের প্রশস্তিই তাঁর 'আশীর্বাদ' কবিতার বিষয়বস্তু। কবি তাজা প্রাণের আবেগকে তাদের হাতে বরণ করেছেন যাদের হাতে সৃষ্টি হবে আগামীদিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যত। 'মুক্তিকামী' কবিতাটি প্রধানতঃ তাদের উদ্দেশ্যেই রচিত।

কবির 'ফণিমনসা'* কাব্যগ্রন্থের অন্যতম বিতর্কমূলক কবিতা 'সাবধানী ঘন্টা'। ১৩৩১ সনের কার্তিক মাসে 'কল্লোল' পত্রিকায় কবিতাটি প্রথমে 'সর্বনাশের ঘন্টা' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থভুক্তির সময় কবিতাটি অনেক স্থানে পরিবর্তিত হয়েছে। এই কবিতাটি প্রকাশিত হবার পর উত্তরে কবি মোহিতলাল মজুমদার 'শনিবারের চিঠি'তে (৮ই কার্তিক ১৩৩১) 'দ্রোণগুরু' কবিতাটি লিখেছিলেন। এই কবিতায় কবি সমসাময়িক প্রচলিত শিল্পসংজ্ঞাকে আক্রমণ করে সুকঠিন বাস্তবতার জয়গান গেয়েছেন। কবির মতে, আর্ট জীবনবোধ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তু নয়, এই পৃথিবী কেবলমাত্র স্নিগ্ধ, শান্ত প্রেমের শাশ্বত সুতিকাগার হতে পারে না। তাঁর বিশ্বাস, এখানে 'প্রেমও আছে সখা, যুদ্ধও আছে, বিশ্ব এমনি ঠাঁই'।** বৈপ্লবিক সমস্ত কর্মপদ্ধতিকে এড়িয়ে

* "ডেমোক্রেটিক সোস্যালিজমের প্রতি নজরুলের মনের প্রগাঢ় অনুরাগ তাঁর 'সাম্যবাদী', 'সর্বহারা' ও 'ফণিমনসা'র বহু কবিতা ও গানে সুপরিস্ফুট।" —আবদুল কাদির (সম্পাদকের নিবেদন : নজরুল রচনাবলী, ২য় খণ্ড, ঢাকা)।

** 'মোসলেম ভারত'এর প্রকাশকালে উক্ত কবিতার শেষ দুটি চরণ ছিল নিম্নরূপ—

বাদশা কবি। সালাম জানায় বুনো তোমার ছোট ভাই।
কইতে গিয়ে অশ্রুতে মোর যায় ডুবে হায় সব কথাই।

গিয়ে অথবা বিদ্রোহী বা বিপ্লবীব দেশপ্রেম এবং আত্মদানকে অস্বীকার করে কোনো সৎ সাহিত্য সুস্থভাবে গড়ে উঠতে পারে না। তিনি মনে করতেন যে বাস্তবতা বিবর্জিত শিল্পের স্থায়ী কোনো মূল্যই নেই। কবিতাটি সজনীকান্তকে উদ্দেশ করে লেখা এবং কবিতাটি সম্পর্কে সমস্ত বিতর্কের মূল কারণ সম্ভবতঃ এখানেই।

'বিদায় মাভৈঃ' কবিতায় জীবনের অসীম ব্যাপ্তি ও সামগ্রিকতাকে কল্পনা করে কবি নব অরুণোদয়ের আশা প্রকাশ করেছেন। 'বাঙলায় মহাত্মা' কবিতায় গান্ধীজীর আগমন এবং চরকাব প্রশস্তি গানই প্রধানতঃ প্রাধান্য পেয়েছিল। চবকাকে নজরুল জাতিভেদের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে বিবেচনা করেছিলেন বলেই সেদিন এই কবিতাটি রচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে গান্ধীজীর পথকে শ্রেয় বলে তিনি গ্রহণ কবেননি। প্রকৃতপক্ষে, নজরুল জীবনে সমস্ত উদ্যমতাকেই প্রথমে গ্রহণ করে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। গান্ধীজীর সুবিশাল উদ্যোগ যথারীতি তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। কিন্তু বাস্তবের দৃষ্টিতে নজরুলের চোখে এই বাস্তবশূন্যতাও অনতিবিলম্বে ধরা পড়েছিল। 'হেমপ্রভা' কবিতায় কবি আন্তরিকভাবে ঐতিহাসিক তুলনা সহযোগে জনৈকা মহিলাব প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন।

বরিশালের কর্মযোগী অশ্বিনীকুমার দত্তের মৃত্যু উপলক্ষে নজরুলের শোক-জ্ঞাপক কবিতা 'অশ্বিনীকুমার' প্রকাশিত হয়। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'লাঙল' পত্রিকায় (৪ঠা জানুয়ারী ১৯২৬)। এই কবিতায় অশ্বিনীকুমারের বহুবিধ গুণাবলীকে স্মরণ করে কবি তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছিলেন।

'ফণিমনসা' কাব্যগ্রন্থে অনুরূপ অনেকগুলি শোকজ্ঞাপক কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই সব কবিতার মধ্যে কবি শরবিন্দু রায়ের অকালমৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'ইন্দুপ্রয়াণ' এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথকে উদ্দেশ করে 'দীল দরদী' (আশ্বিন ১৩২৬, 'মোসলেম ভারত'), 'সত্যেন্দ্রপ্রযাণ' (শ্রাবণ ১৩২৯, 'বিজলী'), 'সত্য কবি' ('কবি সত্যেন্দ্রকে' শিরোনামে 'ভারতী'তে আষাঢ় ১৩২৯ সনে প্রকাশিত), 'সত্যেন্দ্রপ্রয়াণ-গীতি' ('সত্যপ্রয়াণ' শিরোনামে মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত) শিরোনামযুক্ত কবিতাগুলি এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। এইসব কবিতায় যথাক্রমে কবি শরবিন্দু রায় এবং কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বহুবিধ কাব্য-নৈপুণ্য এবং প্রতিভার প্রশস্তি বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে, সত্যেন্দ্রনাথের ব্রঙ্কাইটিস রোগে অকস্মাৎ মৃত্যুতে (২৫শে জুন ১৯২২) কবি অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। ফলে এই সব কবিতায় সত্যেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিজনিত হাহাকার-

বোধই প্রকাশ পেয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথের অসংখ্য গুণাবলী এবং কৃতিত্বের স্মৃতি তাঁকে গভীরভাবে মথিত করেছিল বলেই কবি নিজেকে এইভাবে কবিতার হাতে সমর্পণ করেছিলেন।

এ ছাড়া, দিলীপকুমার রায়ের ইয়োরোপ যাত্রা উপলক্ষে রচিত 'সুরকুমার' কবিতায় নজরুল তাঁকে 'সুরের কুমার' বলে উল্লেখ করেছেন এবং সেইসঙ্গে তাঁর সাময়িক অনুপস্থিতিতে তাঁর নিজস্ব বেদনাই এই কবিতার বিষয়বস্তু। এই কাব্য-গ্রন্থের 'রক্তপতাকার গান', 'অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত', 'জাগরতূর্য' 'গণবাণী' পত্রিকার (বৈশাখ ১৩৩৪) পরপর তিনটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। নজরুলের রাজনৈতিক চেতনার প্রদীপ্ত স্বাক্ষর এই তিনটি কবিতায় সার্থক রূপে চিত্রিত। সাম্যবাদে তাঁর আস্থা এই পর্বের কবিতায় স্পষ্টভাবে সোচ্চারিত। 'গণবাণী'র অন্যতম সম্পাদক কবির বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের প্রভাব অন্ততঃ এই কবিতাগুলির মধ্যে রীতিমতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

(১) ওড়াও ওড়াও লাল নিশান। ...
দুলাও মোদের রক্ত পতাকা
ভরিয়া বাতাস জুড়ি বিমান।
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান॥ (রক্তপতাকার গান)

(২) ওরে সবশেষের এই সংগ্রাম মাঝ
নিজ নিজ অধিকার জুড়ে দাঁড়া সবে আজ
এই অন্তর-ন্যাশনাল-সংহতি রে
হবে নিখিল-মানব-জাতি সমুত্থত॥
(অন্তর-ন্যাশনাল সঙ্গীত)

(৩) ওরে ও শ্রেমিক, সব মহিমার উত্তর-অধিকারী।
অলিখিত যত গল্প-কাহিনী তোরা যে নায়ক তারি॥

উপরোক্ত অংশে লাল পতাকার জয়গান এবং প্রশস্তির মাধ্যমে কবি পৃথিবীর নিপীড়িত জনগণের মুক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের সংগ্রামকে একীভূত করে ফেলতে সক্ষম হয়েছেন। সাম্যবাদীরা একেই বলেন শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের 'আন্তর্জাতিকতা' বোধ।

('যুগের আলো' কবিতায় অনাগতের আগমনে পথ চেয়ে থাকা কবির ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু 'পথের দিশা' কবিতায় নিন্দা-কুৎসা বিজড়িত সমসাময়িক হতাশার মধ্যে কবি পথের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়েছেন।

দুটি কবিতাই যথাক্রমে 'যুগের আলো' (ফাল্গুন ১৩৩৩) ও 'অগ্রদূত' (ফাল্গুন ১৩৩৩) পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়।

এই কাব্যের সর্বশেষে যে দুটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তা প্রধানতঃ হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতিভাবকে প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে রচিত। কবি মনে-প্রাণে অসাম্প্রদায়িক ছিলেন, তাই তাঁর কবিতায় এবং প্রাত্যহিক জীবনেও সেই পরিচয় সুস্পষ্ট। আলোচ্য এই দুটি কবিতা 'যা শত্রু পরে পরে' এবং 'হিন্দু-মুসলিম যুদ্ধ' সেইদিক থেকে বিষয়বস্তুগত বিচারে তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই বিবেচিত। প্রথম কবিতাটি বর্ধমানের 'শক্তি' (আশ্বিন ১৩৩৩) পত্রিকায় এবং শেষোক্ত কবিতাটি 'গণবাণী'তে (আশ্বিন ১৩৩৩) প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বলতে গেলে কবির অসাম্প্রদায়িক জীবনবোধ ও উপলব্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই কবিতাদ্বয়ের মধ্যে অন্তর্নিহিত। সাম্প্রদায়িক কলহের ঘৃণ্য পরিণতির কুফল ও অভিশাপের প্রতি কবি এই দুটি কবিতার মাধ্যমে দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কবি এখানে সহজেই বলেন—

'শত্রুর গোরে গলাগলি কর আবার হিন্দু-মুসলমান।
বাজাও শঙ্খ, দাও আজান।'

তখনকার সেই উন্মত্ত সাম্প্রদায়িকতার কালে নজরুলই এইভাবে একা তাঁর সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী মতবাদের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। ফলে সেই অগ্নিঝরা দিনে সিংহের মতো কেশর একা তিনিই দুলিয়ে দেবার স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন। নজরুলের উদ্দীপক কবিতা প্রধানতঃ এই স্পর্ধার গুণেই এত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

১৯২৯ খৃঃ প্রকাশিত 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থেও নজরুলের অনেকগুলি জনপ্রিয় কবিতা স্থান পেয়েছে। এই কাব্যগ্রন্থটি মাদারিপুর 'শান্তিসেনা' ও বীর সেনা-নায়কদের উদ্দেশে নিবেদিত। মোট চব্বিশটি কবিতার অধিকাংশই দেশের স্বাধীনতা বিষয়ক এবং উদ্দীপনার পৌরুষ কণ্ঠটি এই কবিতাগুলির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থে 'নবপ্রভাবের আহ্বান' ও 'তরুণ তাপস' কবিতায় নতুন জগৎ সৃষ্টির আহ্বান যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি 'আমি গাই তারি গান' ও 'জীবনবন্দনা' কবিতায় যৌবনের শক্তিতে যাঁরা জীবনের পথে আজ এগিয়ে এসেছেন তাঁদের জয়গান করেছেন। 'ভোরের পাখী'র সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা, 'কালবৈশাখী'র আবাহন, 'নগদ কথা'য় দেবতার পায়ে ধর্ণার প্রতিবাদ, এবং

'জাগরণ'এ নতুন যুগের নতুন বাণী শোনাতে কবি প্রয়াসী হয়েছেন। 'জীবন', 'যৌবন' ও 'তরুণের গান' কবিতায় কবির স্বভাবজাত আবেগ নতুন প্রাণের চাঞ্চল্যে সকলকে জাগিয়ে তুলেছে।

ঢাকা মুসলিম সাহিত্যসমাজের মুখপত্র 'শিখা'য় (২য় বর্ষ, ১৩৩৫) 'নতুনের গান' নামে প্রকাশিত 'চল্ চল্ চল্' কবিতাটি বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি তারুণ্যের জয়গানে মুখরিত ভাবোদ্দীপক কবিতা। কোরাস্ গান হিসেবেও বিশ্বের আসরে এটি শ্রেষ্ঠ স্থান পাবার যোগ্য। মুসলিম সাহিত্যসমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধনী সঙ্গীত হিসেবে কবি এটিকে গেয়েছিলেন।*

'ভোরের সানাই' কবিতাটি মূলতঃ সঙ্গীতময়তায় পরিপূর্ণ। কিন্তু 'যৌবন জলতরঙ্গ' (সওগাত, কার্তিক ১৩৩৫) কবিতায় যৌবনের খরদীপ্র তেজ ও শক্তির জয়গান গেয়েছেন কবি। 'রীফ-সর্দার', 'বাংলার আজিজ'** (কার্তিক ১৩৩৪, মাসিক মোহাম্মদী), 'সুরের দুলাল'† ছন্দোগত মাধুর্য এবং কবির অলঙ্কার স্নিগ্ধতার জন্য মনকে স্পর্শ করে। 'নিশীথ-অন্ধকারে', 'বন্দিনী ভারত-মাতার হাহাকার'ও অনুরূপ নিষ্ঠার সঙ্গে প্রকাশিত।

'নওরোজ'-এ প্রকাশিত (আশ্বিন ১৩৩৪) 'শরৎচন্দ্র' কবিতায় শরৎচন্দ্রের বিচিত্র গুণাবলী উল্লেখ করে কবি তাঁর প্রণতি জানিয়েছেন। 'চণ্ডবৃষ্টি-প্রপাত' ছন্দে রচিত এই কবিতায় কবির অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধা চমৎকারভাবে পরিস্ফুট।‡

'অন্ধ স্বদেশ' কবিতা ও 'পাথেয়' কবিতায় আত্মত্যাগের মহিমা ও গুণকীর্তন বর্ণনা করেছেন কবি। এই কাব্যগ্রন্থেই এক প্রফেসর বন্ধুর§ দাড়ি কেটে ফেলার

* ১৩৩৫ ফাল্গুন 'সওগাত'এ কবিতাটি 'নতুনের গান' নামেই পুনর্মুদ্রিত হয়। পাদটীকায় লেখা ছিল, 'নিখিল-বঙ্গ মুসলিম যুবক সম্মিলনীতে এই গানটি গীত হইয়াছিল'।

** 'বাংলার আজিজ' কবিতাটি চট্টগ্রামের পরলোকগত স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টর খান বাহাদুর আব্দুল আজিজের স্মরণে লেখা।

† 'সুরের দুলাল' কবিতাটি দিলীপকুমার রায়ের ইয়োরোপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন উপলক্ষে (মাঘ ১৩৩৪) 'কল্লোল'এর জন্য রচিত।

‡ পাদটীকায় লেখা ছিল, 'স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ষ জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত।'

§ অধ্যাপক মোতাহার হোসেন। (কবিতাটি ঢাকার সাপ্তাহিক 'দরদী'তে প্রকাশিত।)

ঘটনাকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'দাড়ি বিলাপ' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত। এতে কবির কৌতুকপ্রিয়তার প্রমাণ মেলে। স্বর্গীয় দেশবন্ধুর বার্ষিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে রচিত 'তর্পণ' কবিতায় কবি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছেন। এই কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা 'না-আসা-দিনের কবির প্রতি' আশ্চর্য একটি নিটোল মুক্তাবিন্দুর ন্যায় গীতিকবিতার মাধুর্যে ঐশ্বর্যবান।

'প্রলয় শিখা'* নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে প্রথম থেকেই বিবেচিত। ১৯৩০ সালে (১৩৩৭ সন) প্রথম প্রকাশিত আঠারোটি কবিতা সম্বলিত এই কাব্যগ্রন্থটি তৎকালীন সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

'প্রলয় শিখা'** কবিতাটিতে বিশ্বব্যাপী তাণ্ডবের কথা উল্লেখ করে ধ্বংসের ভেতর দিয়ে নব সৃষ্টির উৎসমুখকে আহ্বান করেছেন নজরুল। 'নমস্কার' কবিতায়ও অনাগতের আগমন-ব্যাকুলতা ও 'হবে জয়' কবিতায় যুবশক্তির আত্মত্যাগ ও বেপরোয়া উদ্দাম সৃষ্টিসুখের উল্লাসের কথা বর্ণিত হয়েছে। 'পূজা-অভিনয়' কবিতায় মিথ্যা ও অর্থহীন পূজাচারের প্রতি কশাঘাত করেছেন কবি। কবিতাটিতে প্রাচীন শাস্ত্র, পুরাণ এবং বহু দেবতার উল্লেখ আছে। 'ভারতী-আরতি' মূলতঃ সরস্বতী দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত একটি প্রার্থনা। শিরোনামায় কবি স্বয়ং এটিকে 'তিলক—কামোদ ও শুভাবতী—সাদ্রা ও গাতাঙ্গী' বলে উল্লেখ করেছেন।

কবির 'বহ্নিশিখা' কবিতাটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল এর ছন্দ। প্রতিশোধ-স্পৃহাকে কবি অত্যাচারীর বিরুদ্ধে এই কবিতায় জাগ্রত করবার জন্যে দেবীকে অনুরোধ করেছেন।

এই কাব্যগ্রন্থে তিনটি ছোট কবিতা যথাক্রমে 'খেয়ালী', 'রঙীন খাতা' ও

* 'প্রলয় শিখা' প্রথম সংস্করণ (১৩৩৭)। প্রকাশক—বর্মণ পাবলিশিং হাউস।

** "১৯৩১ খৃঃ ২৬শে মার্চ সাপ্তাহিক 'আহলে হাদিস্' পত্রিকায় 'কবি নজরুল ইসলামের রাজদ্রোহ-অভিযোগ হইতে মুক্তি' শিরোনামায় লেখা হয়… 'প্রলয় শিখা' নামক এক কবিতা-পুস্তক প্রকাশ করিয়া রাজদ্রোহ অপরাধ করায় সুপ্রসিদ্ধ কবি নজরুল ইসলাম প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক ৬ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি হাইকোর্টে আপীল করায় জামীন-মুচলেকায় মুক্ত ছিলেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর সরকার পক্ষ আপত্তি না করায় তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।"

'বৈতালিক' স্থান পেয়েছে। এগুলি বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের আবেগের ফসল হিসেবেই বিবেচ্য।

এই পর্যায়ে 'সমর সঙ্গীত' ও 'চাষার গান' কবিতা দুটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলায় যুদ্ধ বিষয়ক কবিতা খুব কম। যে কটি কবিতা এ পর্যন্ত রচিত হয়েছে 'সমর সঙ্গীত' তার মধ্যে স্বর, বাণী ও ভাবের বিচারে প্রথম শ্রেণীর রচনা বলেই বিবেচিত। সমরে গমনোদ্যত বীরদলের পদধ্বনি এই কবিতায় সার্থক ঝঙ্কার তুলতে সক্ষম হয়েছে। বাংলা কবিতায় একমাত্র এই ধরনের যুদ্ধ বিষয়ক গানের প্রবক্তা হিসেবেই নজরুল অমর হয়ে থাকবেন।

'চাষার গান' কবিতায় কিষাণের জেগে ওঠার দুরন্ত আহ্বান কবির কণ্ঠে ফুটে উঠেছে। জমির স্বত্ব রক্ষার জন্যে চাষীদের অত্যাচারী জোতদার এবং শোষণের বিরুদ্ধে কবি রুখে দাঁড়াতে বলেছেন এই কবিতায়।

'যোগিয়া-টোরি-একতালা' রাগে নির্দেশিত গান* নামে কবিতাটিতেও বিশ্ব-দানবের বিরুদ্ধে কবি দেবী ভৈরবীকে খড়্গ তুলে নেবার অনুরোধ জানিয়েছেন। এই পর্যায়ে কাশিমবাজারের দানবীর মহারাজা স্যার মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কে. সি. আই. ই. মহাশয়ের তিরোধানে লিখিত 'মণীন্দ্র প্রয়াণ', হলদিঘাটের শৌর্য স্মরণে বুড়ি বালামের তীরে বিপ্লবীদের খণ্ড [illegible] ঘটনাকে তুলনা করে লেখা 'নব ভারতের হলদিঘাট', বাঘ যতীনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে 'যতীন দাস' কবিতাটি যথাক্রমে স্থান পেয়েছে। ভাবের দিক থেকে 'মণীন্দ্র প্রয়াণ' কিছুটা পৃথক হলেও অন্য দুটি কবিতায় দেশাত্মবোধ ও সুকঠিন আত্মত্যাগের কথা কবি বারংবার স্মরণ করেছেন।

এই পর্যায়ের শেষ তিনটি কবিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিষয়বস্তুর দিক থেকে নজরুলের স্বকীয়তায় পরিপূর্ণ। 'বিংশ শতাব্দী' কবিতায় নব চেতনার স্ফুরণ ও জয়গান ব্যক্ত হয়েছে। 'শূদ্রের মাঝে জাগিছে রুদ্র' কবিতায় শূদ্রদের অভ্যুত্থানের কথা স্মরণ করে জাতিভেদের বিরোধিতা করেছেন কবি।

কবির 'রক্ততিলক' কবিতাটি 'প্রলয় শিখা'** কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা। 'প্রলয় শিখা' কবিতার ন্যায় এই কবিতায়ও দেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্যে

* নৈহাটি থেকে প্রকাশিত ১৩৩৫ সালে 'খেয়ালী' নামে স্বল্পায়ু মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতাটি প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে আশীর্বাদ স্বরূপ উৎসর্গীকৃত (১৯২৯ খৃঃ)।

** ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ভাদ্র, ১৩৫৬ (১৯৪৯ খৃঃ)।

প্রস্তুত থাকতে এবং রক্ততিলক কপালে পরার জন্যে এগিয়ে আসতে দেশবাসীকে কবি ডাক দিয়েছেন। তাঁর মতে—

রক্তের ঋণ শুধিব রক্তে, মন্ত্র হোক।
হস্ যদি জয়ী, পূজিবেরে তোরে সর্বলোক॥

নজরুলের পরিণত প্রতিভার স্বাক্ষরবাহী কাব্যগ্রন্থ 'শেষ সওগাত' (১৯৫৮) কাব্যগ্রন্থে মোট ৪২টি কবিতা সংযোজিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখেছেন, "নজরুল ইসলামের পরিণত প্রতিভার দান বহুসংখ্যক অপ্রকাশিত কবিতা 'শেষ সওগাত' রূপে এই সংকলনে তাঁর অগণন অনুরাগীদের কাছে উপস্থিত করতে পেরে এ গ্রন্থের প্রকাশকের সঙ্গে আমিও আনন্দিত। প্রথম যুগের কাব্যময় উচ্ছ্বাস 'শেষ সওগাত' কাব্যগ্রন্থে তেমন প্রাধান্য পায়নি। বরঞ্চ দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ এই কবিতার মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। বেদনায় আর্দ্র কবির অন্তর দর্শনের গভীরতায় নবরূপ লাভ করেছে। এই কাব্য-গ্রন্থের কবিতাগুলি সেদিক থেকে কবির উন্মেষ পর্বের চাপল্য থেকে মুক্ত।"

(কবির সুপ্ত সৈনিক আত্মার আহ্বান এই গ্রন্থের 'জাগো, সৈনিক আত্মা' কবিতায় বিধৃত। কবির অন্তরের জাগ্রত বিষাণের আহ্বান তাঁর কানে এসে বেজেছে। কবির আহ্বান :

চলো জাগ্রত মানবাত্মা সামরিক সেনাদল।
যথা প্রাণ বাজে ঝরে পড়ে যেন বাদলের ফুলদল।
মাদল বাজিছে কামানের ঐ শোনো মহা-আহ্বান।
জীবনের পথে চলো আর চলো—'অভিযান, অভিযান—'।

নিরন্ন অসহায় মানুষের ক্রন্দন ও হাহাকারের পাশাপাশি মুক্ত মানসিকতার পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থের কোনো কোনো রচনায় সুপরিস্ফুট। কবির প্রশ্ন:

'আনন্দধাম বাঙলায় কেন ভূতপ্রেত এসে নাচে?
দেশী পরদেশী ভূতেরা ভেবেছে বাঙালী মরিয়া আছে।
এ ভূত তাড়াব, পাষাণ নাড়াব, চেতনা জাগাব সেথা,
ভায়ের বক্ষে কাঁদিবে আবার এক জননীর ব্যথা।
তোমরা বন্ধু, কেহ অগ্রজ, অনুজ, সোদর সম
প্রার্থনা করি ভাঙিয়া দিও না মিলনের সেতু মম।
এই সেতু আমি বাঁধিব, আমার সারা জীবনের সাধ,
বন্ধুরা এস, ভেঙে দিব যত বিদেশীর বাঁধা বাঁধ।'

দেশের মুক্তিযুদ্ধের আহ্বান কবির প্রাণে যে জোয়ারের সৃষ্টি করেছিল তার প্রকাশ 'নিত্য প্রবল হও', 'আগ্নেয়গিরি' ও 'বাঙলার যৌবন' কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে। আবার কবির রোম্যান্টিক মানসের দীপ্তি 'তুমি কি গিয়াছ ভুলে ?' কবিতার মধ্যে প্রতিভাত। বিরহজাত বেদনায় কবির এই রচনাটির সমাপ্তি ঘটেছে। কবির অভিমান এখানে ভরপুর :

কুসুমের মালা দুদিনে শুকায়, থাক অতীতের স্মৃতি
শুকাবে না যাহা আমার গাঁথা এ কাঁটার কথার গীতি ॥

ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যখন কবির বিচিত্র মানসের সফল রূপায়ণ বিদ্রোহী সত্তার সঙ্গে রোম্যান্টিক সত্তার সহাবস্থান ঘটে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'বিদ্রোহী'র চেতনা তাঁর কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে কখনোই নিঃশেষিত হয়নি। তাই 'শেষ সওগাত'এর পরিণত ভাবনায় বিদ্রোহী কবির ভূমিকা আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বিদ্রোহ মোর আসবে কিসে, ভুবন ভরা দুঃখশোক।
আমার কাছে শান্তি চায়
লুটিয়ে পড়ে আমার গায়
শান্ত হব আগে তারা সর্বদুঃখ মুক্ত হোক্।

অর্থনৈতিক শোষণের সাম্রাজ্যবাদী রূপ বস্তুতঃ বিংশ শতাব্দীর শোষণ ব্যবস্থারই পরিবর্তিত রূপ মাত্র।* ধনতান্ত্রিক দেশগুলির বর্তমান ভূমিকা ও সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই নজরুলের মানসিকতাব মূল্যায়ন করতে হবে। 'নবযুগ'এ সেই সতর্কবাণী কবির কণ্ঠে উচ্চারিত। কবির মতে,

---

* "...Neo-colonialism has been defined as a modern form of colonialism in an era of general breakdown of imperialism. Classic colonialism mainly 'Set out to ensure the exploitation of enclosed peoples by other than economic methods. Neo-colonialism, however, is based on including the developing nations in the sphere of capitalist exploitation, an indirect method of subjugating them economically. In fact, neo-colonialism is but a continuation of the colonialist system..." (International Relations : Prof. Raghubir Chakraborty, P. 298.)

মোরা জনগণ, শতকরা মোরা নিরানব্বই জন,
মোরাই বৃহৎ, সেই বৃহত্তেরই আজ নব জাগরণ।
ক্ষুদ্রের দলে কে যাবে তোমরা ভোগ বিলাসের লোভে ?
আর দেরী নাই ওদের কুঞ্জ ধূলিলুণ্ঠিত হবে।

কবির সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ঘৃণা এই কাব্যের বিভিন্ন কবিতার ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই 'টাকাওয়ালা' কবিতায় একই প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হতে দেখা যায়। কবি দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন—

মানুষের রূপে এরা রাক্ষস রাবণ-বংশধর,
পৃথিবীতে আজ বড় হইয়াছে যত ভোগা বর্ব্বর।

কবির পরিণত মানসিকতার মধ্যে যে প্রতিবাদধর্মী মননশীলতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় তা প্রধানতঃ তাঁর মানবতাবোধ তথা আন্তর্জাতিকতার অভিব্যক্তি হিসেবেই বিবেচ্য। তাঁর স্বভাবজাত বর্ণ প্রবণতা এই মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করতেই সাহায্য করেছে।

এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ছন্দিতা' কবিতার মধ্যে দশটি ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার কাব্যিক অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। কবির ভিন্ন ভিন্ন গানের মাধ্যমে স্বরলিপির ঢঙে মাত্রাভিত্তিক রচনার প্রয়াসই এই কবিতাটির প্রেরণাস্বরূপ।

শেষাংশে কয়েকটি রচনার মধ্যে কবির প্রকৃতি-প্রীতি তথা রোম্যান্টিক মনের বিচরণ পাঠকের হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে। বিভিন্ন সময়ে লেখা এই ধরনের অপ্রকাশিত বিভিন্ন ভাবসম্পৃক্ত কবিতা 'শেষ সওগাত'-এ সংযোজিত হয়েছিল। অবশ্য এরই ভেতর দিয়ে কবির সামগ্রিকতা সহজেই ধরা পড়ে।

এই মানসিকতার কবিতাগুলি কবির আত্ম-উন্মোচনের প্রয়াসে পরিপূর্ণ। তাই ভাষায় ছোঁয়া লেগেছিল অন্তহীন আবেগের, অতি পরিচিত বর্ণমালাও সহজেই পরিণতিতে হয়ে উঠেছিল বর্ণাঢ্য। পরিচিত বর্ণ 'অ' সম্ভবতঃ তখন কবির কাছে অদম্যতার প্রতীক, যেমন হয়েছে 'আ' একান্তভাবেই আত্মপ্রতিষ্ঠার মতো। তাই কবির ভাষা এখানে পৌরুষের বর্মে সজ্জিত নব নব অভিজ্ঞতার প্রবল তরঙ্গে নজরুলের হাতে এইভাবে বর্ণ ও ভাষা স্নাত হয়ে অর্জন করেছে চিরন্তনের সিদ্ধি।

প্রাচীন আলংকারিকেরা ঠিকই বলেছেন, **"A poet is a protector of his age, a creator and as well as the shaping force of his time".**

নজরুল সম্পর্কে এই উক্তি এই পর্যায়ে যে সর্বাধিক পরিমাণে সত্য তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

উদ্দীপক কবিতা প্রসঙ্গে কবির উৎসাহ প্রধানতঃ সমসাময়িকতার প্রবাহে বিচার্য। রাজনৈতিক আন্দোলনের তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঘটনাপ্রবাহের আবর্তনে গণমানস যখন উত্তাল, উদ্দীপক কবিতার প্রয়োজনীয়তা তখনই তীব্র হয়ে ধরা পড়ে। বিশেষ করে নজরুলের উদ্দীপক কবিতার বৈশিষ্ট্যই হোলো আপামর জনসাধারণকে দেশপ্রেম তথা স্বাধীনতাবোধ এবং গণজাগরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। মানসিক বিপ্লবের ক্ষেত্রে এই জাতীয় কবিতার দান অনস্বীকার্য। ফলে এই সব কবিতায় প্রয়োজন সুতীক্ষ্ণ শব্দাবলীর ব্যবহার তথা উজ্জীবনী ভাবের সংমিশ্রণ এবং ঐতিহ্য-সচেতন ভাবসমৃদ্ধ বিষয়বস্তুর প্রাধান্য। বস্তুতঃ এরই গুণে গণমানসের নেতৃত্বদানে সক্ষম উদ্দীপক কবিতা দেশের আপামর জনসাধারণের প্রিয় হয়ে ওঠে। অর্থাৎ দেশপ্রেমের যে সুতীব্রবোধ কবিকে দুর্মর করে তোলে তার মূলে সক্রিয় থাকে আশ্চর্য কঠিন পৌরুষ তথা দেশের স্বাধীনতা, কল্যাণ ও মৈত্রীভাবনা। এরই বিনিময়ে সৃষ্ট হয় এই জাতীয় কবিতার পটভূমিকা, বিশ্লেষিত হয় তার ঐতিহ্য।

নজরুলের উদ্দীপক কবিতার ক্ষেত্রেও কবির দেশচেতনা তথা মানবমুক্তির চেতনার প্রভাব তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তিগত জীবনে রাজনীতির বিভিন্ন পর্বে কোনো না কোনো ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কবি অনুরূপ কবিতা রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। একদা 'লাঙ্গল', 'গণবাণী', 'ধূমকেতু', 'বিজলী' প্রভৃতি পত্রিকার মাধ্যমে কবির মনে জাতীয় পরিস্থিতি বিষয়ক যে উপলব্ধি ঘটেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে কবি উদ্দীপক কবিতা রচনায় প্রয়াসী হয়েছিলেন। তাঁর কবি-প্রকৃতির মধ্যে যে দেশচেতনার অনুভূতি বিদ্যমান তা মানবমুক্তি ভাবনার মাধ্যম হিসেবে কবির কাব্যে বিশ্লেষিত হয়েছে। অতি সহজ কথায় দেশচেতনার স্বরূপটিকে নজরুল এই পর্যায়ের কবিতায় বিধৃত করেছেন। কবির সাম্যবোধজনিত ভাবনার প্রভাবও এই পর্যায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ফলে সামগ্রিকভাবে 'অগ্নিবীণা' থেকে 'প্রলয় শিখা' পর্যন্ত কবির দেশচেতনা তথা মানবমুক্তি বিষয়ক ভাবনা এবং সাম্যবোধের অবিমিশ্র রূপায়ণ কবিমানসের মহৎ চেতনার ফসল হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক চেতনা ঃ প্রেমভাবনা ঃ গজল

রোম্যান্টিকতা মানবমনের অন্তর্লীন অভিব্যক্তির কাব্যিক নির্যাস। কাব্যের সুগভীর ভাবনা এর ভেতর দিয়ে কবিকল্পনার বিচিত্র পথে গতি সঞ্চালন করে। সার্থক পরিমিতিবোধ রোম্যান্টিক কবি-মানসের অন্যতম শর্ত। কবি তাঁর অবচেতন মনের অভিব্যক্তিসমূহকে রোম্যান্টিকতায় অলংকারে শোভিত করেন। ফলে কাব্য ফিরে পায় স্নিগ্ধ মানব বিষয়ক কল্পনা এবং স্নিগ্ধতার লাবণ্যময় দ্যুতি। হৃদয়-মনের অনুশীলন ও উপলব্ধির প্রক্রিয়াকে কবিতার প্রাথমিক সংজ্ঞা হিসেবে মেনে নিলেও অলংকরণের নিষ্ঠা, আবেগ ও ছন্দোবদ্ধ বাণী বিন্যাস সেই রোম্যান্টিক মননের আবেগকে অবশেষে সার্থক কাব্যকলার আসনে বসায়। কবিতাকে তাই হতে হয় রোম্যান্সের প্রতিবেশী। পল ভ্যালেরী একদা বলেছিলেন, কবিতার বিষয় সেইটেই যেটা গদ্যে বলার পরেও কবিতাকে চায়। সুতরাং, অতিরিক্ত গদ্যে অপ্রকাশযোগ্য সেই প্রার্থিত অনুভবকে হাত বাড়াতে হয় রোম্যান্সের দিকে। রোম্যান্স প্রকৃতপক্ষে তাৎপর্য পেয়েছে এই সর্বজনীন অনুভূতিবিষয়ক অধিকারের গৌরবে। অতিশয় প্রাচীন এবং সর্বকালের নিয়ামক মানবমনের এই অভিব্যক্তি চেতনার গভীরে নিয়ত প্রবহমান বলেই এটি সম্ভব হয়েছে। বিষয়গত দিক থেকে সাদৃশ্য অপরিবর্তিত থাকলেও প্রাচীনকালের রোম্যান্টিকতার সঙ্গে সাম্প্রতিক রোম্যান্টিক ভঙ্গীর তফাৎ দেখা গেছে প্রধানতঃ এর পরিবেশনের দিক থেকে। প্রাচীন সারল্য ও সহজ প্রকাশের স্থলে বর্তমানে এসেছে সূক্ষ্মতা। আধুনিক কাব্য বিশেষ করে গীতিকবিতায় এসেছে কবির সুগভীর প্রত্যয়জনিত অলংকারিক সূক্ষ্মতা। কোথাও বা আবার দুর্বোধ্য জটিলতার পাশাপাশি এসেছে কাব্যের কল্পনাবিষয়ক তির্যক ব্যঞ্জনা। ফলতঃ, রোম্যান্টিক ভাবনায় কবি-কল্পনাকে ঘিরে তৈরী হয়েছে কাব্যের ভিন্ন এক স্পর্শ-গন্ধময় জগৎ যেখানে শিল্প তার গভীরতার গুণে খুঁজে পায় প্রত্যয়ের শৈল্পিক নিষ্ঠা। পাঠককে অন্তিমে তা কেবলমাত্র আন্দোলিত করেই শেষ হয় না, বরং রেখে যায় গভীরতম কোনো বেদনার স্বর্গীয় সুখের পরিতৃপ্তিবোধ। সত্য, সুন্দর এবং মানবিক কল্যাণবোধের মহতী প্রেরণাই রোম্যান্টিক মননের উৎস। রোম্যান্টিক কবি মাত্রেই তাই মানুষের সীমাহীন শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি বিশ্বাসী এবং আস্থাবান। অর্থাৎ সৌন্দর্যপ্রীতিই

রোম্যান্টিক কবির প্রাণসত্তা। কবির যে বিষাদ সেও এক অবিভাজ্য কাব্য-কলার অলঙ্কারমাত্র। তাই তিনি সহজেই উন্মোচন করেন আমাদের অনুভূতিবোধের অন্তহীন রহস্যকে। ফলে অকথিত ব্যথা বা বিরহের আর্তি তাঁর কাব্যের ভেতর দিয়েই প্রকাশ পায়।

এদিক থেকে নজরুলও ছিলেন পরিপূর্ণভাবে রোম্যান্টিক। তাঁর কাব্যের চরিত্রও ছিল রোম্যান্টিকতার প্রলেপে পরিপূর্ণ। বিশেষ করে তাঁর বিদ্রোহী কবিতার পাশাপাশি স্নিগ্ধ রোম্যান্টিক কবিতাগুলি তাঁর রোম্যান্টিকতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর বিদ্রোহ ধর্ম, সমাজ এবং সর্বপ্রকার সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে। এবং অবশেষে তাঁর ইপ্সিত ছিল অত্যাচার-অবিচার মুক্ত বিচিত্রতায় সুন্দর এক জগৎ। তাঁর এই প্রত্যাশায় ইযোরোপীয় কবিদের মতো আইডিয়ালিজমই একমাত্র প্রেরণা ছিল না। অর্থাৎ নজরুলের কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে আইডিয়ালিজম-এর প্রভাব থাকলেও তা বাস্তবতার (reality) সংস্পর্শ মুক্ত হয়নি। প্রাত্যহিক জীবনের দুঃসহ বাস্তবসঞ্জাত অভিজ্ঞতার তীব্রতা বিস্মৃত হননি নজরুল। তথাপি তাঁর রোম্যান্টিক কবিতায় সূক্ষ্ম চেতনার আবেগ কখনও ভাবের টেন্‌শন থেকে চ্যুত হয়নি। পাশাপাশি এই পরিমিতিবোধের সার্থক উপলব্ধির দৃষ্টান্তরে কবিধর্ম ফিরে পেয়েছে আপন অভিজ্ঞতার ভিন্ন এক মাধুরী। এই মাধুর্য তাঁর কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলংকার।

তাঁর কাব্যে রোম্যান্স নির্দিষ্ট কোনো অনুভূতির সীমানায় আবদ্ধ নয়। কেননা পাশাপাশি তাঁর কবি-চেতনায় ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপটের বিচিত্র আবেগ সক্রিয়। এইদিক থেকে তাঁর কবি-মানস আপন ভাবধারা তথা প্রেম-সৌন্দর্য সমন্বিত এক ভিন্ন জগতের অনুসারী হয়ে উঠেছে। যে-কোনো কবির পক্ষে এই অনির্বচনীয় জগৎ চির আকাঙ্ক্ষিত। বস্তুতঃ, এর ভেতর দিয়ে কবি সত্যের সন্ধান লাভ করে থাকেন। আবার এই সত্যের দর্শনলাভ বিষয়ক আকাঙ্ক্ষায় নজরুলকে বারবার ফিরে যেতে হয়েছে সৌন্দর্যের এক স্নিগ্ধ পেলব অনুভূতির দীপ্তিময় ঐশ্বর্যে। সেখানে কবি নিঃসঙ্গ অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পথের পথিক। কবি-মানসের এই সাধনা আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। তাঁর প্রেমানুভবের টেন্‌শন প্রকৃতপক্ষে তাঁর পৌরুষধর্মী চেতনালব্ধ প্রয়াসেরই দ্যোতক। কবির প্রেম-ভাবনায় যে দীপ্তি তা কাপুরুষের প্রার্থনায় মেলে না। বরং তাঁর রোম্যান্টিক ভাবনার মূলে আছে সদাজাগ্রত সৌন্দর্য পিয়াসী ও সত্যানুসন্ধানী এক কবিমানস যা মেলাতে চায় কল্পনার তীক্ষ্ণতার সঙ্গে বাস্তবের পরিমিত সৌন্দর্যময় সত্তাকে।

হয়তো এরই ফলে নজরুলের প্রেম-বিষয়ক কবিতায় কাব্যোচিত আবেগের তীব্রতা এসেছে, কিন্তু তাতে ঝাঁঝ নেই। অনুরাগ বা অভিমান আছে বটে, তবে ঈর্ষা বা নীচতা সেখানে অনুপস্থিত। রোম্যান্টিক ভাবনায় তাই কোনও অভিযোগ ঠাঁই পায়নি নজরুলের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ তাঁর কাব্যে যে সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক চেতনা পরিশীলিত হয়েছে সেখানে কেবল প্রেম ও সৌন্দর্যভাবনা ছাড়া আর কিছু নেই, থাকা সম্ভবও ছিল না।

প্রসঙ্গত একথা ভুলে গেলে চলবে না যে তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রথম পর্বে রাজনৈতিক চিন্তাপ্রবাহের প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এবং সে সবের মূলে কাজ করেছে তাঁর মানবতাবোধ। সুতরাং এই মানবতাবোধ তাঁর কবিতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই, গীতিকাব্যেও এই বোধকে তিনি কোনোমতেই বিস্মৃত হননি। তাঁর রোম্যান্টিক মনের যে সাবলীল প্রকাশ সেটাও মূলতঃ সম্ভব হয়েছিল এই কারণেই। নজরুল চেয়েছিলেন তার কাব্যকল্পনা এবং আদর্শের মধ্যে সত্যের সার্থক প্রবর্তনা। কল্পনায় তাই তাঁর কাব্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল রোম্যান্টিকধর্মী প্রাবল্যের উচ্ছ্বাস আর বন্ধনহীন পরিচিত সেই উদ্দাম প্রাণময়তা। সম্ভবতঃ, রোম্যান্টিক যিনি তাঁকে সব সময় এইভাবেই ফিরে তাকাতে হয় কল্পনার অন্তহীন সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের দিকে। নজরুলও তাই চেয়েছিলেন।

রোম্যান্টিকতার মূল ঐশ্বর্য সত্য, সুন্দর, ন্যায় ও কল্যাণবোধের মহতী প্রেরণায়। রোম্যান্টিক কবি বস্তুতপক্ষে দৃশ্য, গন্ধ এবং অনুভূতির জগতকে তাঁর কাব্যের বিচরণক্ষেত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। মানুষের প্রতি সুগভীর আস্থা পরিণতিতে তাঁকে মানুষের সীমাহীন শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতি বিশ্বাসী করে তোলে। তখন তার কাছে দেবতার চেয়ে বড়ো হয়ে দেখা দেয় মানুষ। মানুষই চিরকাল প্রকৃত রোম্যান্টিকের কাছে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। পাশাপাশি এই নির্ভরশীলতা এবং দুর্মর আস্থার ফলে কবি নতুন করে প্রতিনিয়ত আবিষ্কার করেন প্রেমের বিচিত্র মহিমা। অবশেষে প্রেমের মুক্তি কবিকে দান করে নবজীবনের দীক্ষা।

নজরুলকে এদিক দিয়ে সার্থক রোম্যান্টিকতার প্রতিভূ বলা যেতে পারে। তাঁর কাব্যের আবেদন আমাদের চিত্তের গভীরে, হয়তো বা হৃদয়েও। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু অনুভবের গভীরতার স্পর্শে আত্মার গভীরতম আলোকে আমাদের পৌঁছে দেয়। ফলে নজরুলের কাব্যে পাঠক খুঁজে পান দুর্নিরীক্ষ্য রহস্যের সন্ধান, আর্তি ফিরে পায় প্রশান্ত প্রস্তাবনা। অন্যান্য কবির মতো

নজরুলের এই রোম্যান্টিক প্রাণসত্তার মূলে আছে কবির অন্তহীন সৌন্দর্য-প্রীতি। তাঁর সমস্ত অস্তিত্বের মধ্যেও মিশে আছে সৌন্দর্যের সহস্রমন্দ্রিত রাগিণী যার প্রকাশ কবির অজস্র কবিতার বিস্ময়কর বিচিত্র স্বরারোপে। কল্পনার নন্দিত প্রয়াস রূপ পেয়েছে এইভাবে নজরুলের কাব্যের অনমুকরণীয় ভঙ্গীতে। আবার তাঁর সঙ্গীতের মধ্যেও প্রাণ পেয়েছে রাগরাগিণীর অবিমিশ্রিত এক অনিবার্যতা যার মূলে আছে নজরুলকাব্যের সেই রোম্যান্স তথা শ্রেয়োবোধ, সহজেই যা সুরের ভেতর দিয়ে মুক্তি পেয়েছে। এ সবই তাঁর রোম্যান্টিক মানসের প্রয়াস মাত্র যা যে-কোনো সৌন্দর্যসাধকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে। সৌন্দর্যময় এক পৃথিবীর স্বপ্নের অঞ্জন কবির সমস্ত চোখ জুড়ে মিশে আছে এবং এই সমস্ত কিছুর মূলে আছে সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক মানসের সুন্দর ভাব-কল্পনা ও তার আকর্ষণ।

রোম্যান্টিক স্বভাবমিশ্রিত প্রভাব নজরুলকে চরিত্রগত দিক দিয়ে অস্থির করে তুলেছে। এমন কি স্বভাবজাত চাঞ্চল্যও কবির রোম্যান্টিকধর্মী মননেরই প্রকাশ। তবু কবির নিবন্ধন শঙ্কা তাঁর স্বপ্নের জগৎকে নিয়ে। যে কল্পনার জগৎ সৌন্দর্য ও আদর্শের উপর নির্ভরশীল তার বাস্তব পরিণতি নিয়ে কবির দুশ্চিন্তা ও অপূর্ণতাজনিত উদ্বেগ বারবার নজরুলের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। পৃথিবীর সমস্ত মহৎ কবির মতোই নজরুলের রোমান্টিক কল্পনা বাস্তবতার সংঘর্ষে আহত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একে অস্বাভাবিক ভাবার কোনো কারণ নেই। কবির কণ্ঠে প্রতিনিয়ত নবজীবনের আহ্বানে প্রথাগত ভাবনার শরিকেরা সহজেই বিব্রত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তদুপরি সে-দিনের সমাজ ছিল অতীতের সুখস্মৃতিকে স্মরণ করার স্বপক্ষে। সেখানে রোম্যান্টিক নজরুল স্বেচ্ছায় সমাজ-আক্রমণের শিকার বা লক্ষ্যবস্তু হয়ে উঠেছিলেন। অজস্র অভিযোগ জমা হয়েছিল সনাতন-পন্থীদের বিচারে, যার আঘাত কবিকে দিয়েছে বেদনা। একদিকে সামাজিক অন্যায়, অসাম্যজনিত আক্রোশ ও হতাশা, অন্যদিকে তার সঙ্গে যোগ হয়েছিল কবি-হৃদয়ের বিষাদের পুঞ্জীভূত মেঘ। কোনো সৃষ্টি কবিসত্তাকে অস্বীকার করে গড়ে ওঠে না। এক্ষেত্রেও নজরুলের সৃষ্টিতে তাঁর ব্যক্তিভাবনার বিষাদ পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশিত। অন্যান্য রোম্যান্টিক কবির মতো নজরুলও ফিরে তাকিয়েছেন অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর দিকে। এছাড়া সার্থক গীতিকবিতার অন্যতম উপাদান হোলো বিষাদ। না পাওয়ার ব্যথা ও তার জন্যে হাহাকার ছড়িয়ে থাকে এইসব কবিতার শরীর জুড়ে। নজরুলের কবিতায় উদ্দাম ও উচ্ছ্বাস,. বিদ্রোহ ও উদ্দীপনী সত্তার সঙ্গে বিস্ময়ে লক্ষণীয় তাঁর উপরোক্ত গীতি-কবিতাধর্মী সূক্ষ্ম রোম্যান্টিক অনুভূতিটুকু। বলতে দ্বিধা নেই যে, এই কাব্যিক

অনুভূতিতে পাওয়া-না-পাওয়ার দ্বন্দ্বজনিত মানসিকতাই তাঁর কাব্যকে সামগ্রিকতা (totality) দান করেছে।

কাব্যধর্মী এই মানসিকতার সাদৃশ্য মেলে ইয়োরোপের অগ্রগণ্য ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ, শেলী, বায়রন, কীটস, ব্রাউনিঙ অথবা সুইনবার্ণের রচনায়। রোম্যান্টিক বিভাইভালের অগ্রপথিকেরা সেদিন ইয়োরোপে চেয়েছিলেন রোম্যান্টিকধর্মী মননের পুনঃপ্রতিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করতে। তাঁদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অনুভূতি মিশ্রিত সৃষ্টির মধ্যে সেই ভাবনাই ধরা পড়েছে। নজরুল জানতেন তাঁর অগ্রজদের ইতিবৃত্ত। বন্ধু মোতাহার হোসেনকে চিঠিতে লিখেছিলেন—

"আমার কেবলি মনে পড়ছে (বোধ হয় ব্রাউনিং-এর) একটা লাইন, 'So very mad, so very bad, so very sad it was, yet it was sweet' আর মনে হচ্ছে, ছোট্ট দুটি কথা—সুন্দর ও বেদনা। এই দুটি কথাতেই আমি সমস্ত বিশ্বকে উপলব্ধি করতে পারি।"*

এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা তাঁর রোম্যান্টিক মননকে দান করেছে অতিরিক্ত মাধুর্য। সুন্দরের স্তবগান করতে চেয়েছিলেন নজরুল। তাঁর মতে—

"...এদের মাঝেই—হয়তো কোটির মাঝে একটি...আসে সুন্দরের ধেয়ানী-কবি। সে রিজার্ভ নয়, ডিউটিফুল নয়, সে কেবলি ভুল করে। সে কেবলি 'falls on the thorns of life, he weeps.' সে সমস্ত শাসন সমস্ত বিধি-নিষেধের ঊর্ধ্বে উঠে সুন্দরের স্তব গান করে, Skylark-এর মতো সে কেবলি বলে, সুন্দর—বিউটিফুল। মিলটনের স্বর্গের পাখীর মতো তার পা নেই, সে ধূলার পৃথিবী স্পর্শও করে না। কবি এবং মৌমক্ষী। বিশ্বের মধু আহরণ করে মধুচক্র রচনা করে গেল এরাই।"...**

কীটসের কাব্যিক চেতনা এবং কাব্য বিষয়ক দর্শন এক্ষেত্রে নজরুলকে কত গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তার পরিচয় মেলে। সৌন্দর্য তথা সুন্দরের সংজ্ঞা এবং উপরোক্ত কবির কল্পনায় তার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ বলে বহুকাল ধরে

* ব্রাউনিং-এর 'Confession' কবিতাটির মূল পংক্তি দুটি ছিল :

How sad and bad and mad it was ?
But then ! how it was sweet !

**মোতাহার হোসেনকে লেখা (২৪. ২. ১৯২৮) চিঠির অংশ, পৃঃ ৩৩। নজরুলের জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়—সম্পাদক সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্য বিভাগ, করাচী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিবেচিত। যেহেতু মানবমনের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতা এবং কাব্যরসের স্বীকৃত পরিমণ্ডলে সেই প্রভাব বিস্ময়কর কাব্যরসের সৃষ্টির সহায়ক হয়ে ওঠে সেইহেতু রোম্যান্টিক কবিমানসের ক্ষেত্রে এই অত্যাশ্চর্য মিল ঘটতে বাধ্য। অর্থাৎ রোম্যান্টিক কাব্যানুভূতির দিক থেকে সৌন্দর্য ও সুন্দরের এই অনুভূতি বিষয়ক উত্তরাধিকাব নজরুলের ক্ষেত্রেও ঘটেছে।

রোম্যান্টিক কবিদেব বিদ্রোহের লক্ষ্য থাকে প্রধানতঃ ধর্ম, ভগবান বা ভাগ্য-বিধাতা, সামাজিক অত্যাচার, অসাম্য ও সংস্কারের প্রতি। ইয়োরোপের কবিদের সেই অভিজ্ঞতার সাদৃশ্য বাংলা কাব্যে প্রধানতঃ নজরুলের ক্ষেত্রে ঘটেছে। তবে শেলী, কীটস বা ওয়র্ডস্‌ওয়র্থ-এর মতো নজরুল মূলতঃ ভাববাদী (idealistic) ছিলেন না। বরং নজরুলের কাব্যভাবনায় বাস্তববোধের (realism) প্রভাবই ছিল বেশী। প্রসঙ্গতঃ স্মরণে রাখতে হবে যে, তাঁর বিদ্রোহ কখনও নির্দিষ্ট কোনো সময় বা ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ থাকেনি। আসলে তাঁব বিদ্রোহ সমাজজীবনেব অসাম্য, দারিদ্র্য ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এক অবিরাম প্রবাহ।

জীবনের প্রতি সুগভীর মমতাবোধ বা নি . আসক্তি রোম্যান্টিক কবিদেব এইভাবেই বিদ্রোহী করে তোলে। নজরুলকেও করেছিল। ফলে তাঁর রোম্যান্টিক মানসের বিদ্রোহ-ভাবনায় একই সঙ্গে ত্রাস বা শঙ্কার পাশাপাশি প্রকাশ পেয়েছে কবির স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধ স্পর্শের সন্ধান। অর্থাৎ রোম্যান্টিক-এর ধর্মানুযায়ী বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে কবি স্মরণ করেছেন প্রেমের মহিমা। বাংলা কাব্যে নজরুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এইখানেই।

নজরুলের প্রেমভাবনার মূলেও ছিল কবির সৌন্দর্য মিশ্রিত প্রাণসত্তার উপলব্ধি তথা শাশ্বত সত্যের প্রতি সুগভীর আস্থা। তাঁর প্রেমভাবনার মধ্যে পাশাপাশি তাই গুরুত্ব পেয়েছে কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা। প্রকৃত-পক্ষে, নজরুলের এই অভিজ্ঞতা তাঁর কবিতাকে বিভিন্ন পর্বের বৈচিত্র্য প্রদানে সাহায্য করেছে। কৈশোরে প্রথম প্রেমের স্মৃতি থেকে শুরু করে যৌবনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রেম ও ভালবাসার স্মৃতির ফসল ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতায়। ফলে রসভাবনার মৌলিকত্ব সার্থক হয়ে উঠেছে ব্যক্তিগত উপলব্ধি তথা অভিজ্ঞতার প্রদীপ্ত স্বাক্ষরবাহী ঐসব কবিতার বহুবিধ প্রক্ষেপণে। ব্যক্তিগত জীবনে প্রেমের বিচিত্র অভিজ্ঞতার পাশাপাশি প্রেমজনিত ব্যর্থতার হাহাকারবোধ এবং হতাশার স্মৃতিকে তিনি আড়াল করতে প্রয়াসী হননি। তাঁর প্রেমভাবনার মূলে তাই একদিকে যেমন প্রেমের বিচিত্রমুখী প্রয়াস অর্থাৎ

প্রেমের বন্দনা গান প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি বিরহমিশ্রিত অনুভূতির তীব্রতাও প্রদীপ্ত হয়েছে তাঁর অজস্র রোম্যাণ্টিক কবিতায়।* আর এরই ফলে তাঁর গীতি-কাব্যে খুঁজে পাই নতুন জীবনমুখী বাস্তবতার ভিন্নমুখী এক তাৎপর্য, যা একান্ত-ভাবে কবির নিজস্ব। এমন কি দয়িতার প্রতি তাঁর আকর্ষণের স্মৃতিকে তিনি স্মরণ করেছেন তাঁর সম্পূর্ণ ভিন্ন কাব্য বিষয়ক প্রকরণের মাধ্যমে। ফলে তাঁর প্রেমভাবনা বাস্তবের সীমারেখার শৈল্পিক রূপায়ণ হয়েও প্রায়শ: তা শাশ্বত চিন্তার মধ্যেই নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এই মর্ত্যভূমির প্রেম সার্থক কাব্য রসানুভূতির ভেতর দিয়ে তাঁর রচনায় কাব্য সত্যের স্পর্শ খুঁজে পেতে চায়। এই প্রত্যাশার গুণে লোকায়ত প্রেমভাবনা সহজেই অতীন্দ্রিয়বাদী হয়ে উঠেছে। কাব্যের ঐশ্বর্য পরিণতিতে এইভাবে বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিলন ঘটায়। নজরুলের প্রেমভাবনার মূলে সমন্বয়ের এই চিন্তা তীব্রভাবে কাজ করেছে। রোম্যাণ্টিক কবিদের প্রেমভাবনায় যে আবেগ ও পাওয়া-না-পাওয়ার বেদনা বা দাহ সক্রিয় থাকে নজরুলের মধ্যে সেই সমস্ত অনুভূতি কেবল যে বর্তমান ছিল তাই নয়, উপরন্তু তার প্রেমভাবনায় সংযুক্ত হয়েছিল মধ্যযুগীয় বিরহ গাথা, প্রাচীন প্রেম ও ঈশ্বর বিষয়ক উপকথা। হিন্দু-মুসলিম ধর্ম ও সুপ্রাচীন কাব্যের বিচিত্র পর্যায় এবং কাহিনীর যোগসূত্রের সংযোজন তাঁর প্রেমভাবনাকে গীতি-কাব্যে নতুন রসাভাসে মূর্ত করে তুলেছে। অর্থাৎ প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ নজরুলের কাব্যকে বিচিত্র ভঙ্গীতে লীলায়িত করেছে, যেমন করেছিল একদা ত্রুবাদুরদের একান্ত ঘরোয়া প্রেম-নিবেদনের মাধুর্য মিশ্রিত কাব্যগ্রন্থগুলি।

রোম্যাণ্টিক ভাবনার ক্ষেত্রে চিন্তাধারায় কবির যে সাযুজ্য আমরা কীটস্ বা ওয়র্ডসওয়র্থ অথবা শেলীর সঙ্গে লক্ষ্য করি তার অমিলটুকুও বিপরীতপক্ষে অতি সহজেই ধরা পড়ে। মর্ত্যমানবীর কল্পনায় উপরোক্ত কবিদের যে মিল নজরে পড়ে তা একান্তই আপেক্ষিক। স্পর্শসুখসঞ্জাত চেতনা বা উপলব্ধির মধ্যে কীটস্ অনুভব করতে চেয়েছিলেন ইন্দ্রিয়সুখ। তাই সেই সুখের স্পর্শানুভূতির তীব্রতা জুড়ে আছে ওই ইংলণ্ডীয় কবির সূক্ষ্ম রোম্যাণ্টিকতায়। এমন কি বিরহ-জনিত হাহাকারসুলভ বেদনা কবির কাব্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে সন্দেহ নেই। সেদিক থেকে কীটস্‌কে স্পর্শের অতীত অথবা অভিজ্ঞতার অনাত্মীয় বলে মনে হয় না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তাঁর এই কাব্যিক

* কৈশোরের প্রেমের অভিজ্ঞতা 'ব্যথার দান' উপন্যাসের ভেতর দিয়ে বিধৃত হয়েছে।

সুষমার মূলে কাজ করেছে কবির অতৃপ্তিজনিত হাহাকার যেটা নজরুলের ক্ষেত্রে ঘটেনি। নজরুলের প্রেমভাবনা বিষয়ক কবিতায় যে বেদনার সুর মিশ্রিত তাতে ক্ষোভ অনুপস্থিত। নিবেদনই তাঁর কাব্যের মূল সুর হয়ে ধরা দিয়েছে। প্রিয়ার রূপ এবং ঐশ্বর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছে। না পাওয়ার ব্যথা কাব্যের বেদনা মিশ্রিত ভাবের অনুরণনে একাকার হয়ে পরিণতিতে তাঁর প্রেমভাবনাকে করেছে মহিমান্বিত, আর এই প্রসাদগুণেই নজরুল নতুন করে তাঁর 'চিরজনমের প্রিয়া'কে কাব্যের অলঙ্কারে শোভিত করেছেন। এই প্রেমভাবনার মূলে একদিকে রয়েছে নারীর প্রতি ভালবাসা, অন্যদিকে সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ। বস্তুতঃ এদিক থেকে তিনি পাঠকদের প্রেমভাবনার মহত্তম প্রতিনিধি। তাঁর প্রেমভাবনা এখানে অনাস্বাদিত আবেগের উন্মোচনকার্যে নিয়োজিত। ফলে কাব্যদর্শনের বিচারে তিনি প্রেমিকের স্বার্থপরতাকে সহজেই অতিক্রম করেছেন, সেইসঙ্গে জয় করেছেন মানবিক দুর্বলতাকেও। অর্থাৎ নজরুল তাঁর প্রেমভাবনার ক্ষেত্রে প্রিয়ার সত্তার মাধ্যমে তুচ্ছতাকে জয় করে ছিনিয়ে এনেছেন প্রেমের মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা। প্রেমের প্রশান্ত প্রাঙ্গণে তাই কবির অবাধ সক্রিয়তা। আত্মনিবেদনই সেখানে মূল কথা। নজরুলের প্রেমভাবনার ও দর্শনের ক্ষেত্রে প্রিয়ার স্মৃতি এবং কবিতা তাই একাকার হয়ে নতুন সার্থকতা লাভ করেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে একেই বলা যেতে পারে কবি ও শিল্পীর দ্বৈতসত্তার মিলন বা নবজন্ম।

বাংলা কাব্যে সার্থক গজল সর্বপ্রথম রচনা করেছিলেন নজরুল। ইতিপূর্বে অতুলপ্রসাদ গজলের ঢঙে কিছু কবিতা লিখেছিলেন বটে, এমন কি দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যেও গজল রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সামগ্রিক-ভাবে প্রকৃত অর্থে গজল বলতে যা বোঝায় তার উদাহরণ একমাত্র নজরুলের গজলধর্মী কবিতার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। বাংলা গানের ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত (classical) প্রধানতঃ খেয়াল, ঠুংরি এবং ভজনের মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নজরুল বাংলা কথার ভেতর দিয়ে ধ্রুপদী গানের স্বাদকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। ফলে ধ্রুপদী গানের সুরকে কিয়ৎ পরিমাণে সরলীকৃত করে তৈরী হয়েছিল আধুনিককালের বাংলা কথাসমৃদ্ধ রাগপ্রধান সংগীত। বস্তুতঃ এরই প্রেরণায় বাংলা গানের বহু বিচিত্র প্রয়াসকে সঞ্চালিত করার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি পারস্য, ইরাক, ইরান এবং উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম সুরের ফসলকে মিলিয়ে দিলেন বাংলা কাব্যে। নতুন দিকও উন্মোচিত হল এই গজল রচনার মাধ্যমে। এবং এই নবতম প্রবর্তনার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি আশ্চর্য-

ভাবে সাফল্যলাভ করেছিলেন।* কবি নিজেও বুঝতে পেরেছিলেন সেকথা। ফলে গজলের গঠনশৈলী এবং আঙ্গিক প্রকরণে তিনি ইচ্ছানুসারে ছন্দ বা মাত্রার বহু বিচিত্র চর্চা করেছেন। এমন কি বহু নতুন কথাও তিনি গজলধর্মী কবিতায় সংযুক্ত করেছেন। ফলে কাব্য খুঁজে পেয়েছিল অনাস্বাদিত এক রসের মাধুর্য যা কবির একান্ত নিজস্ব সৃষ্টি। বাংলা কাব্যে গজল প্রবর্তনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাই নজরুলেরই। কেবলমাত্র গজলের তাগিদেই কাব্যকে এ সবের অন্তর্ভুক্ত করতে কবি প্রয়াসী হয়েছিলেন। বাংলা গজলের জনপ্রিয়তার মূলে ছিল নজরুলের সুগভীর অন্বেষা যা কবি তাঁর কাব্যের ভেতর দিয়ে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রধানতঃ হাফিজ এবং গালিবের কাব্যরসের স্বাদকে এইভাবে স্বীয় কবিতার মাধ্যমে কবি মিশিয়ে দিয়েছেন। বাংলা কাব্যে গজলের এই স্বাদ নতুন বলেই বাংলা কাব্যে তার সমাদর হতে বিলম্ব ঘটেনি। নজরুলের গীতি-কবিতায় গজলের প্রভাব সমস্ত দিক থেকে তাই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলা গজলের ঐতিহ্যবিহীন প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নজরুলকে যে দায়িত্ব বা ঝুঁকি গ্রহণ করতে হয়েছিল তাতে এর সার্থকতা বিষয়ে বহুবিধ সংশয় জাগা একান্ত স্বাভাবিক। বিশেষ করে বাংলা কাব্যে লিরিকের অনুপস্থিতিজনিত সমস্যা কবির ছিল। ফলে সামগ্রিকভাবে বাংলা কাব্যের স্বার্থে সুপ্রাচীন আরবী, পারসী এবং ফারসীর ঐতিহ্যসমৃদ্ধ বস্তুবাস্তবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নজরুলের দৃষ্টি পড়ে।

গজলের মধ্যে ভাবের যে লঘু ভঙ্গীটি নিরন্তর সঞ্চরণশীল তাকেই কবি বাংলা কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। অর্থাৎ একদিকে বিশুদ্ধ পারসিক গজলের

* কবি মোহিতলাল মজুমদার নজরুলের আগে গজল রচনা করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও নজরুলের আগে বেশ কিছু ভাল গজল রচনা করার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা নজরুলের মতো সার্থকতা লাভ করেননি। এঁদের দুজনের পরিশুদ্ধ চেতনার ও শিল্পজাত নৈপুণ্যের তুলনায় সহজাত আবেগ বা কবিত্বশক্তির অভাবের ফলেই এঁরা নজরুলের মতো কোনো ধারার প্রবর্তন করে যেতে সক্ষম হননি। যদিও মোহিতলাল বা সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দের নিপুণ ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সুরের অভিজ্ঞান নজরুলের মতো তাঁদের করায়ত্ত ছিল না। এছাড়া, হাফিজ ও খৈয়ামের রচনার অতিরিক্ত প্রসাদগুণ নজরুলের করায়ত্ত থাকায় তিনি গজলের যথার্থ রূপটি গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

স্বরে গানের মধ্যে প্রায়শঃই দীর্ঘায়িত করার প্রবণতা, যাকে পরিভাষায় বলা হয়ে থাকে 'শায়ের', তারই সাহায্যে পরবর্তী স্তরে দ্রুত তালের সংযোজন নজরুলের বাংলা গজলকে ভিন্নতর রসে পূর্ণ করে তুলেছে। অপরদিকে তেমনি বিষয়াশ্রিত গজলগুলিতে মানবিক আবেগের গভীরতা তাঁর গজলকে এনে দিয়েছে ভিনদেশী মাধুর্যের বিস্ময়কর এক সুতীব্রতা। এই গভীরতা বাংলা গানের ক্ষেত্রে বিরল। হালকা চালে আরবী-ফারসী শব্দের নিশ্চিন্ত অথচ সহজ-সুন্দর ব্যবহারই হোলো নজরুলের গজলগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

ব্যক্তিগতভাবে নজরুল ছিলেন হাফিজের কবিতার একজন অনুরাগী পাঠক। হাফিজের কবিতা অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে পাঠ করে তিনি হাফিজের কাব্যের ঢঙে বাংলায় গান লেখা শুরু করেন। হাফিজ নিজে প্রেমভাবনায় বেদনাবিধুর মানসিকতার কবি বলে তার কাব্যে যে বিরহী প্রেম ও জীবনের সামগ্রিক দর্শনের ছাপাপাত ঘটেছিল, নজরুল তা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। পারস্যের প্রকৃতি ও জীবনধারার মধ্যে যে মাদকতা বর্তমান তারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল হাফিজের কবিতায়। নজরুলের চেতনার মধ্যেও হাফিজের ভাবনার এই অনুভূতি গজল রচনার মধ্য দিয়ে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছে। পরন্তু হাফিজের বহু কবিতা অনুবাদও নজরুল করেছিলেন।

'দোলনচাঁপা' (১৯২৩) নজরুলের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ এবং রোম্যান্টিক কাব্য পর্যায়ের প্রথম গ্রন্থ। অধিকাংশ কবিতা কারান্তরালে রচিত এবং প্রকাশকের বিবৃতি অনুসারে কবিতাগুলি কর্তৃপক্ষের অজান্তে জেলের বাইরে পাচার করে এনে প্রকাশ করা হয়। এই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু প্রেম এবং কবির বেদনা-বিরহ সম্পর্কিত উচ্ছ্বাস এর প্রতিটি কবিতার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ নজরুলের আবেগ তথা অতৃপ্ত প্রেমের হাহাকারকে যেমন একদিকে প্রাধান্য দিয়েছে তেমনি ব্যক্তি-প্রসঙ্গের প্রাধান্য এই কাব্যগ্রন্থকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। আর এরই ফলে প্রেম বিষয়ক সংশয় কবিকে বেপরোয়া করে কল্পনার গভীরতা বা উপলব্ধির সীমানাকে সংকুচিত করেছে। অর্থাৎ কবির প্রেম এখানে বাস্তব জীবনের আকাঙ্ক্ষার মধ্যে নিজেকে যুক্ত করতে প্রয়াসী। কবির প্রেমভাবনা মূলতঃ মানবিক ভাবনাপ্রসূত এবং সৌন্দর্য প্রয়াসের অন্বেষায় নিয়োজিত। প্রেমের দ্বন্দ্ব তাঁকে করে তুলেছে অস্থির। স্পর্শাসক্তির তীব্রতাও এই কাব্যগ্রন্থে তাই অত্যন্ত প্রবল হয়ে ধরা পড়েছে। হয়তো এই মানসিকতা রোম্যান্টিকতার প্রভাব বলেই তা দুর্মর হয়ে উঠেছে 'সৃষ্টি

সুখের উল্লাসে'* কবিতার মধ্যে। প্রেমের বিচিত্র ভাবনার দ্বন্দ্ব সর্বাপেক্ষা প্রখর হয়ে ধরা পড়েছে 'অবেলার ডাক' ও 'পূজারিণী' 'কবিতার মধ্যে। 'পূজারিণী'-কে সে-সময় অনেকে 'বইখানির শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রেম পিপাসার অপূর্ব প্রকাশ' বলে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এই কবিতায় দেহগত পিপাসা ও বেদনার হাহাকার যত তীব্র, গভীরতা সেই তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। ভাবগত তাৎপর্যের দিক থেকে 'অভিশাপ' ও 'আশান্বিতা'য় গভীরতা অনেক বেশী বলে প্রতিভাত। আরবী মোতাকারিব ছন্দে লেখা 'দোদুল দুল' ছন্দের বিচিত্র মাধুর্যে পরিপূর্ণ। 'পউষ' কবিতার মধ্যে প্রকৃতির রূপটি বিদায় বেদনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছে। রোম্যান্টিকধর্মী মানসিকতার স্পর্শ মেলে 'ব্যথা গরব' কবিতায়, যেখানে কবি বলেন,

যতই আমায় সইতে পার
কাঁদতে ততই ধরি আরও,
মারো প্রিয় আরও মারো
তোমার আঘাত-চিহ্ন-রাজে
যেন আমার বুকের মাঝে

*　　*　　*

এই যে তোমার অবহেলা
তাই নিয়ে মোর কাটবে বেলা,
হেলাফেলার বসবে মেলা,
একলা আমার বুকের মাঝে
সুখে দুঃখে সকল কাজে ॥

বিশেষ করে এই কবিতার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রেমভাবনার সাদৃশ্যটুকু সহজেই নজরে পড়ে। 'পূজারিণী' কবিতার ইন্দ্রিয় স্পর্শকাতরতা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত হলেও 'ব্যথা গরব'-এর প্রেমভাবনায় তাঁর সঙ্গে নজরুলের আত্মীয়তা ধরা পড়ে। এছাড়া 'আশান্বিতা', 'আশা' ও 'শেষ প্রার্থনা'য় ধ্বনিত হয়েছে আশার চিরন্তন সুর। প্রেম এসব কবিতায় ব্যর্থতার হাহাকারকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পূর্ণতার প্রতি কবিকে আস্থাবান করে তুলেছে। কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতাটি শিরোনামহীন হলেও মর্মস্পর্শী।

* 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু তৃতীয় সংস্করণে এটি বাদ যায়। —'প্রবাসী' (চৈত্র ১৩৩০)-র মতে।

সামগ্রিকভাবে 'দোলনচাঁপা' কাব্যগ্রন্থ তাঁর পরবর্তী রোম্যান্টিক কাব্য-ভাবনার সূচক হিসেবে গণ্য হতে পারে। প্রথম রোম্যান্টিক কাব্যগ্রন্থ হিসেবে এর মধ্যে কিছু কিছু ত্রুটি থেকে গেলেও এর অধিকাংশ কবিতা একান্ত আবেগ-মিশ্রিত সারল্যের গুণে পাঠকদের হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। আসলে কবির অকৃত্রিম প্রেম ও দয়িতার প্রতি অভিমানের প্রগাঢ়তায় লাভ করেছে আশ্চর্য এক লাবণ্যময় স্নিগ্ধতা। 'দোলনচাঁপা'র সাফল্য প্রধানতঃ এখানেই।

কবির শ্রেয়তম রাজলাঞ্ছিত বন্ধু মুজফ্ফর আহ্মদ ও কুতুবউদ্দীন আহ্মদকে উৎসর্গীকৃত 'ছায়ানট' (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থে পঞ্চাশটি কবিতা ঠাঁই পেয়েছে। এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুও প্রেম এবং কবির প্রেমধারণা তথা প্রেমসাধনার গভীর রূপটি সুন্দরভাবে এখানে ফুটে উঠেছে। কবির প্রণয়ভাবনার গভীরতা ও কল্পনা এই কাব্যে অধিকতর পরিণত এবং প্রেমের বিচিত্র অনুভূতিবিষয়ক স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ। গীতিকবিতার মাধুর্য 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থকে কেবল যে সূক্ষ্ম রোম্যান্টিকতাই দান করেছে তাই নয়, সেই সঙ্গে কবির রূপান্তর অর্থাৎ এই কাব্যগ্রন্থের মধ্যেই বিদ্রোহী নজরুলের প্রেমপ্রতিমার কাছে ধরা দেবার প্রয়াসটুকু সুস্পষ্ট।

'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা 'বিজয়িনী'তে কবির বিদ্রোহী সত্তা এসে ধরা দিয়েছে প্রেমিকার অশ্রুবিন্দুর কাছে। বিদ্রোহী কবির সংগ্রাম-ক্লান্ত ভার তুলে দিতে চেয়েছেন জীবনদেবীর হাতে।* বিভিন্ন কারণে নজরুলের 'বিজয়িনী' কবিতাটি গুরুত্বপূর্ণ। এই কবিতায় কবির কাব্যগত বিচারে বিষয়বস্তু-ভাবনার যে মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছিল তার প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। এই কবিতায় কবির রোম্যান্টিক সত্তা তাই ফিরে পেতে চেয়েছে তার নিজস্ব জগৎ বা কল্পনার প্রচ্ছন্ন সেই রোম্যান্সের স্বদেশকে। কবি লিখেছেন,

> আমার সমর জয়ী অমর তরবারী
> দিনে দিনে ক্লান্তি আনে, হয়ে ওঠে ভারী,
> এখন এ ভার আমার তোমায় দিয়ে হারি,
> এই হার-মানা হার পরাই তোমার কেশে॥

* 'বিজয়িনী' কবিতার মধ্যে কবিপত্নী প্রমীলার প্রভাব নজরে পড়ে। কবির সে-সময় প্রমীলাকে প্রথম দেখার মানসিক অবস্থাটুকু এই কবিতায় ধরা পড়েছে।

* * *

আজ বিশ্বজয়ীর বিপুল দেউল তাইতে টলমল।
আজ বিদ্রোহীর এই রক্ত-রথের চূড়ে
বিজয়িনী। নীলাম্বরীর আঁচল তোমার উড়ে,
যত তূণ আমার আছে তোমার মালায় পূরে,
আমি বিজয়ী আজ নয়ন-জলে ভেসে॥

অর্থাৎ প্রেমের কাছে কবির প্রত্যাবর্তন এই কবিতার মূল বিষয়বস্তু। বিষয়বস্তুর এই প্রাধান্যই ছড়িয়ে আছে 'ছায়ানট'এর বিভিন্ন কবিতায়। বলতে গেলে না পাওয়ার বেদনার সুর, বুক ছড়িয়ে আছে 'চৈতী হাওয়া'য়। এছাড়া 'ছায়ানট'-এর অধিকাংশ কবিতা কুমিল্লায় রচিত হওয়ার ফলে কবির প্রণয়ভাবনার প্রভাব এর অধিকাংশ কবিতায় নিহিত।

কবির মধুরতম প্রেমের বাস্তবিক স্বরটুকু মিশে রয়েছে তাঁর 'পূবের হাওয়া' (১৯২৫)* কাব্যগ্রন্থে। তার অন্তরের বেদনা এবং আকাঙ্ক্ষিত যন্ত্রণার দ্বৈত সত্তা এই কাব্যগ্রন্থে একাকার হয়ে গেছে। মূলতঃ বিরহ-বেদনার অনুরণন 'পূবের হাওয়া'র অধিকাংশ কবিতাকে ঘিরে রেখেছে। কবির নিঃসঙ্গতা তথা মৃত্যু বিষয়ক চিন্তায় আচ্ছন্ন কবির উদ্বেগ ভালবাসাকে ঘিরে গড়ে উঠেছে কবির কাব্যভাবনার নতুন জগৎ। হাল্কা চালে কবি 'পূবের হাওয়া'র কবিতাগুলির মধ্যে প্রণয়ের মৌলিক রস, কে ফুটিয়ে তুলেছেন। বস্তুতঃ গীতিপ্রাণতাই এই কাব্যগ্রন্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গীতিময়তার গুণে অতি তুচ্ছ ঘটনাসম্পৃক্ত বিষয়বস্তু কাব্যের চকিত স্পর্শ লাভ করেছে। 'হোলি' কবিতার মধ্যে রোম্যান্টিক রসবোধ অত্যন্ত তীব্র হলেও পরবর্তী 'বেশরম' ও 'সোহাগ' কবিতায় যথাক্রমে বৈষ্ণব কাব্যের রস এবং মধ্যপ্রাচ্যের কাব্যাস্বাদ তথা স্নিগ্ধতা অতি চমৎকার-ভাবে ফুটে উঠেছে। নজরুলের কাব্যভাবনায় রোম্যান্টিক সূক্ষ্মতার পাশাপাশি সেই ইন্দ্রিয়-সচেতন কল্পনার প্রভাব এই কাব্যে অত্যন্ত ব্যাপক। এই কাব্য-গ্রন্থের শেষ কবিতা 'ফুল কুঁড়ি' কবির স্নিগ্ধ, পেলব ইন্দ্রিয়স্পর্শী কল্পনারই অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উদাহরণ। প্রকৃতপক্ষে, লৌকিক সারল্য মিশ্রিত বর্ণনার প্রসাদগুণে ভাষা এখানে অত্যন্ত ক্ষুরধার হয়ে অন্তরকে বিদ্ধ করেছে। ফলে

* সরকারী নথির তথ্য অনুসারে গ্রন্থটি পৌষ, ১৩৩২ (৩০শে জানুয়ারী ১৯২৬)-এ প্রকাশিত।—নজরুল-জীবনী (রফিকুল ইসলাম), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সমসাময়িক সমালোচকের* কঠোর বিদ্রূপ ও নিন্দা সত্ত্বেও পাঠকদের কাছে 'পূবের হাওয়া' যথারীতি সমাদৃত হয়েছে।

রোম্যান্স এবং প্রেমভাবনা তাঁর পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সিন্ধু হিন্দোল'এরও (১৯২৬) প্রধান বিষয়বস্তু। 'দোলনচাঁপা'য় তাঁর যে নতুন বা ভিন্ন জগতের অনুসন্ধান চলছিল তারই প্রকাশ 'ছায়ানট' ও 'পূবের হাওয়া'য়। 'সিন্ধু হিন্দোল' এ সেই অনুসন্ধান আরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে ছড়িয়ে পড়েছে। কবির কল্পনাময় রাজ্যে যে বৈচিত্র্যের সন্ধান চলছিল তাই যেন আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে সিন্ধু হিন্দোল'-এ এসে। লক্ষণীয়, কবি এখানে সমুদ্রের মধ্যে নতুন করে তাঁর কল্পনার প্রতীকগুলিকে পুনরাবিষ্কার করতে প্রয়াসী। এই আত্মীয়তাবোধ বা উপলব্ধি তাঁকে সিন্ধুর প্রতি সহমর্মিতায় আবদ্ধ করেছে। চট্টগ্রামের সমুদ্রস্মৃতির ফসল এই কবিতাগুলি 'নাহার ও বাহারের' প্রতি উৎসর্গীকৃত। সমুদ্রের বর্ণনা চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে সিন্ধু বিষয়ক তিনটি কবিতায়। অবশ্য 'সিন্ধু হিন্দোল'এর উনিশটি কবিতায় কবির বেদনা ও হাহাকার এবং সেই সঙ্গে কবির প্রেমভাবনাই প্রাধান্য পেয়েছে। সামগ্রিকভাবে সেই বেদনার স্বরই এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচ্য। যেমন—

> তোমার বুকে স্থান কোথা গো - দূর বিদেশীর,
> কাজ কি জেনে? তল কে না পায় অতল জলধির।
> গোপন তুমি আসলে নেমে
> কাব্যে আমার, আমার প্রেমে,
> এই সে সুখে থাকবো বেঁচে, কাজ কি দেখে তীর?
> দূরের পাখী—গান গেয়ে যাই, না-ই বাঁধিলাম নীড়।
>
> (গোপন প্রিয়া)

গীতিকাব্যের মর্মস্পর্শী আবেদন 'পথের স্মৃতি' ও 'উন্মনা' কবিতায় সুপরিস্ফুট। 'দারিদ্র্য' কবিতাটি নজরুলের অতি পরিচিত জনপ্রিয় একটি কবিতা। দারিদ্র্যের প্রতি কবির ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পাশাপাশি দারিদ্র্যের সুকঠিন বর্ণনা এবং পরিণতির প্রতি কবির সপ্রসন্ন দৃষ্টিপাত ঘটেছে এই কবিতায়। 'বাসন্তী' ও 'ফাল্গুনী' কবিতার মধ্যে কবি প্রধানতঃ ছন্দের প্রয়াসে বিশেষভাবে মেতে উঠেছিলেন। পাশাপাশি ভালবাসার আশ্চর্য লৌকিক বর্ণনায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে 'মাধবী প্রলাপ' কবিতাটি যেখানে কবি

* 'প্রবাসী' (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) পত্রিকার পুস্তক পরিচয় বিভাগের সমালোচনা।

অতি সহজেই একটি প্রেম বিষয়ক গাথাকে তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। কবির প্রেমানুভূতির সুতীব্র আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এই কবিতায়। এই পর্যায়ের শেষ কবিতা 'দ্বারে দ্বারে ঝঞ্ঝার জিঞ্জীর' কবির বিদ্রোহী সত্তার পরিণত ভাবনার গুণে এবং ভাবগভীরতার বিচারে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে।

মনে রাখা প্রয়োজন যে কবির দ্বন্দ্বপ্রসূত রোম্যান্টিক চেতনা তাঁকে কোনো ক্ষেত্রেই সমস্যার মধ্যে নিক্ষেপ করেনি। কেননা, ভালবাসা তথা প্রেমকল্পনার যে নির্দেশ আপন স্বভাবের বিনিময়ে অনুভব্য, কবি তাকে কখনোই অস্বীকার করেননি। ববং বিপরীতপক্ষে এই অপ্রতিবোধ্য আবেগকে কাব্যে পরিশীলিত করে অনুভবগ্রাহ্যতার মূল্যে তার কাব্যিক রূপায়ণ ঘটানোতেই তিনি অধিকতর উৎসাহী ছিলেন। 'সিন্ধু হিন্দোল' কাব্যগ্রন্থে তাঁব সেই কাব্যিক চেতনাব অবিমিশ্র রূপটি ধবা পড়েছে। অবশ্য কবির সমগ্র প্রযাসের মধ্যেই রোম্যান্টিকতা একান্তভাবে আশ্লিষ্ট, অর্থাৎ একে কোনোক্ষেত্রেই বিচ্ছিন্ন বিবেচনা করা যায় না। বস্তুতঃ কবির এই একান্ত নিজস্ব প্রবণতা তাঁর বৈশিষ্ট্যেবই পবিচাযক।

নজরুলেব দ্বিতীয় পর্বের কবিতায এই দ্বৈত সত্তার পাশাপাশি অবস্থান লক্ষ্য করা যায। সুতরাং তাঁর কবিকৃতির মধ্যে কবির স্পর্শকাতর মন নিত্য প্রবহমান কল্পনার প্রেমপ্রতিমাকে ঘিরে যে অনুভূতির চর্চা নিরন্তর বর্তমান তারই দ্যুতি ছড়িযে আছে সমগ্র কাব্য-প্রবাহের ঐশ্বর্যে। যে আবেগ-প্রবণতা নজরুলের সর্বাপেক্ষা বড়ো সম্বল তার মুক্তি ঘটেছে এইভাবে। কবির দুর্বার উল্লাস যা একদা তাঁকে ঝড়ের মতো উত্তাল করে তুলেছিল তার বেগ কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ডুব দিযেছিলেন সুরের সুগভীর অতলস্পর্শী ভাবের রাজ্যে। তাঁর রোম্যান্টিক মানস বিক্ষিপ্ততার মধ্যেই ফিরে পেয়েছিল তার চেতনাসমৃদ্ধ ঐক্যের ভিন্ন এক জগতকে। তাই কবির পক্ষে কখনো অসুবিধে হয়নি সৃষ্টির নূতনতর আবিষ্কারে মেতে উঠতে। অর্থাৎ তাঁর রোম্যান্টিক মনের উৎসাহ কখনোই স্তিমিত হয়নি। অবশ্য স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এর মূলে কাজ করেছে যে রোম্যান্টিকসুলভ জীবনাচরণ বা জীবনবোধ তার ভিত্তি ছিল কল্যাণকামিতায়। এরই জন্যে অনেক ক্ষেত্রে তাঁর মানবিক বেদনাবোধ প্রচলিত শিল্পসুলভ নিয়মকানুনকে যথাযথ না মেনে প্রয়োজনবোধে স্পষ্টতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে এর পেছনে কাজ করেছে কবির দেশজ ঐতিহ্য, মানসিকতা ও সমকালীন যুগসমস্যা। রোম্যান্টিক

নজরুল তাই বারবার ফিরে এসেছেন মর্ত্যমানবীর সন্ধানে। দয়িতার প্রতি প্রেম নিবেদনের ভাষায় এই জন্যেই পাঠক পায় না কোনো জটিল রহস্যময়তা বা অপার্থিব কোনো জগতের সন্ধান। তাঁর জীবনদর্শন ও কাব্যের দর্শনের মধ্যে কখনো তাই বিরোধ ঘটেনি।

তাঁর কাব্যের স্থায়িত্বের পিছনেও কাজ করে যাবে কবির দুর্দমনীয় আবেগপ্রসূত রোমাণ্টিকতা যার সাথে পাঠক নিজেকে যুক্ত করবেন নিজস্ব নিরিখের তাৎপর্যে। নজরুলের প্রেমভাবনার মূল্যবোধও স্বভাবতঃই গীতি-কবিতার সারল্যমিশ্রিত আবেগ ও জীবনমুখী সাহচর্যবোধে ভাস্বর হয়ে পাঠকের উপলব্ধি ঘটাতে সাহায্য করবে। বর্তমানকে যিনি সৃষ্টির সঙ্গে জয় করেছিলেন, চিরকালীন সত্য ও লৌকিক শিল্প-সুষমার গুণে তিনি ভবিষ্যৎকেও যে জয় করবেন তার প্রমাণ নজরুলের সাম্প্রতিক জনপ্রিয়তা ও নব-মূল্যায়ন।

অবশেষে, নজরুলের প্রেমের কবিতায় একটি অভিজ্ঞতা আমাদের স্মরণে থেকে যেতে বাধ্য। যে-কোনো সতর্ক পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন নজরুলের প্রেমের কবিতায় পৌরুষের সুস্পষ্ট অনুপস্থিতি। অধিকাংশ স্থলেই কবি যেন অশ্রুসজল প্রেমিক। প্রেমিকার প্রত্যাখ্যানের পরিণতিতে কবির একান্ত হতাশ সুরের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে আছে তাঁর প্রেমের কবিতায়। তাঁর প্রায় সব কটি প্রেমবিষয়ক কাব্যগ্রন্থেই এর অজস্র উদাহরণ মেলে। এই প্রবণতা তাঁর কবিসত্তার স্ববিরোধিতার ফল বলে সন্দেহ হতে পারে, কিন্তু এই সত্য অনস্বীকার্য।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

প্রকৃতিপ্রীতি : উপমা : চিত্রকল্প : প্রতীকী

রোম্যান্টিকতা মূলতঃ প্রকৃতিপ্রীতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে কবি যে রহস্যের দ্বারকে কবিতায় উন্মোচন করতে প্রয়াসী হন সেই কৌতুহল কবিকে পরিণতিতে প্রকৃতিপ্রেমিক রোম্যান্টিকতায় উত্তীর্ণ করে। প্রত্যেক কবির কাছে প্রকৃতির চিরন্তন সৌন্দর্য তথা বিস্ময় একান্ত অনুরাগের বিষয়। প্রকৃতিকে ঘিরে অতি স্বাভাবিক নিয়মে প্রেমিক বা রোম্যান্টিক কবিদের ভাবনা গভীরভাবে নিরন্তর আন্দোলিত হয়ে থাকে। ফলে কবিকে ফিরে তাকাতেই হয় প্রকৃতির অতুলনীয় রহস্যের দিকে। কবিতার উপমা, প্রতিবঙ্গ বা তুলনা প্রধানতঃ প্রকৃতির মাধ্যমেই কবি প্রকাশ করেন। বিশেষ করে তাই রোম্যান্টিক কবিদের পক্ষে প্রকৃতির প্রভাব এড়িয়ে চলা কোনোমতেই সম্ভব নয়।

নজরুলের কবিতায়ও প্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম। শিশুকালে এবং কৈশোরে প্রকৃতির স্নিগ্ধতার ক্রোড়ে কবির যে জীবনস্রোত প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রভাব অতি স্বাভাবিক নিয়মেই তাঁর চিন্তা এবং কল্পনার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে কবিকে প্রকৃতির কোলে বারবার ছুটে যেতে হয়েছে। বিশেষ করে চট্টগ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থটি প্রধানতঃ কবির চট্টলা ভ্রমণেরই ফসল।

প্রকৃতির চিন্তা নজরুলের মধ্যে বিশেষ করে কল্পনার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই সক্রিয় ছিল। কৈশোরে লেটো দলের গানে অংশগ্রহণ কালে তাঁকে যে সব গান বাঁধতে হোতো তা প্রধানতঃ প্রকৃতিকে আশ্রয় করেই রচিত। বালক কবির সেদিনের ভাবনায় এটাই ছিল স্বাভাবিক। ওস্তাদ গোদার দলে আমিনের সঙ্গে লেটোগানে প্রদত্ত জবাব থেকেই কবির প্রকৃতিপ্রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কবির বিদ্রোহী সত্তার মধ্যে যে উচ্ছ্বাস এবং আবেগ ক্রিয়াশীল সেখানেও প্রকৃতি তার নীরব ভূমিকা যথারীতি পালন করেছে। এমন কি 'বিদ্রোহী' কবিতাও এর প্রভাবমুক্ত নয়। ইংরেজী সাহিত্যে ওয়ার্ডসওয়র্থকে যেমন বলা হোতো 'প্রকৃতির কবি' নজরুলকে ঠিক সে আখ্যায় যথাযথ ভূষিত করা যায় না। তাঁর কাব্যে ভাবনার অনুষঙ্গ হয়েই প্রকৃতি ধরা দিয়েছে। প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে যা কিছু সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে কবির অন্তঃস্থিত কল্পনার প্রভাবই সর্বাগ্রে বিবেচ্য।

অর্থাৎ প্রকৃতিপ্রীতি কবির অবশ্যই ছিল, কিন্তু প্রকৃতির ভূমিকা কখনোই কবির নিজস্ব অনুভূতিকে ছাড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়নি। সুতরাং প্রকৃতির সমস্ত সৌন্দর্য ও আকর্ষণ নজরুলের কাব্যভানাকেই মূলতঃ রূপায়িত করতে সাহায্য করেছে। কবির বহু গদ্য রচনায়ও তার স্বীকৃতি মেলে।

কবির নিসর্গভাবনার মধ্যে যে একটি ঐক্যবোধ পাঠকের নজরে পড়ে তা এর ফলেই সম্ভব হয়েছে।

প্রকৃতির সৌন্দর্য তথা অনুভূতি কবির মনে দ্বৈত ভাবের উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম। প্রথমতঃ, যা কিছু দেখা যাচ্ছে তার সৌন্দর্যকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত* করে নেওয়া এবং তার মাধ্যমে সৃষ্টিরহস্যের আবিষ্কারকে উপলব্ধি করা। দ্বিতীয়তঃ, প্রকৃতির আপাতদৃশ্যমান সৌন্দর্যকে মানববিষয়ক চিরন্তন ভাবনা ও দর্শনের মধ্যে মিলিয়ে নিয়ে কবি আবিষ্কার করেন ভিন্ন এক আকাঙ্ক্ষিত দর্শন বা অনুভবকে। কোনো কোনো কবির চেতনায় এই অনুভব শেষ পর্যন্ত কল্পনার ভারে দুর্বোধ্য ঠেকে। কিন্তু নজরুল সৌন্দর্যকে প্রকৃতির নিরিখে উপভোগ করতে চেয়েছিলেন। প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন সারল্যমিশ্রিত সুগভীর কাব্যিক তাৎপর্য ও তার অন্ত[illegible] ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ কাব্যিক অলঙ্কারের সন্ধানে কবি হাত বাড়িয়েছিলেন প্রকৃতি তথা উপমার রাজ্যে। উপমা কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। তাই বলে উপমাই কবিতা নয়, উপমাতেই কবিত্ব। প্রচলিত ধারণানুযায়ী উপমার আবিষ্কারের মধ্যেই কবির শ্রেষ্ঠত্ব। কিন্তু উপমা ব্যবহার আরও জরুরী এবং তাৎপর্যপূর্ণ। উপমা-প্রবণতা আর উপমা-নৈপুণ্য কখনোই এক জিনিস হতে পারে না। বহু কবির উপমার প্রতি অস্বাভাবিক আগ্রহ সত্ত্বেও কাব্যের অন্যান্য শর্তের প্রতি তাঁদের অমনোযোগ লক্ষ্য করা যায়। তাতে উপমার সুপ্রযুক্তির পরিবর্তে শৈল্পিক ব্যর্থতাই পাঠকের নজরে পড়ে। নজরুল তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে সব সময় হয়তো কবিতার সমস্ত শর্ত যথাযথ অনুকরণ করেননি, কিন্তু তাঁর বক্তব্যের সারল্যের গুণে এরূ আবেদন কাব্যের রসাস্বাদনের ক্ষেত্রে কখনোই গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেনি। অবশ্য নজরুলের রচনায় উপমা ব্যবহারের মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহের অভিযোগ অনুপস্থিত। তাঁর চিত্তের কল্পনাধর্মী সূক্ষ্ম গভীরতার গুণে কাব্যের উপমা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিতার ঐশ্বর্য হয়ে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যকে অতিরিক্ত মাধুর্যদান করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই উপমার প্রয়োগেরু

* জীবনানন্দ দাশ।

মাধ্যমে কবির কল্পনা ফিরে পেয়েছে কাব্যের অন্তঃস্থিত লাবণ্য বা দ্যুতি। এই সৌন্দর্য তাই পাঠকের মনে নবতম আবিষ্কারের উত্তেজনা জাগায়। সুতরাং তাঁর কবিতায় প্রকৃতিপ্রীতি ও উপমার সার্থক পরিমিতিগুণের ঐশ্বর্যেই হয়ে ওঠে কবিসত্তার আশ্চর্য সুন্দর এক প্রস্তাবনা, যা প্রকৃতপক্ষে কাব্যসত্তার সুসংহত দ্যোতনারই প্রতীক। এই মহৎ অনুভবের তাড়নায় কবি প্রচলিত উপমার প্রতি দৃষ্টি না দিয়ে অহরহ হাত বাড়িয়েছেন নতুন প্রেক্ষাপটের দিকে। এ কাজে নজরুল দ্বিধা করেননি হাত বাড়াতে প্রাচীন দেবদেবী বিষয়ক আখ্যানে। প্রাচীন অজস্র কাহিনী বা শাস্ত্রের বিচিত্র ঘটনার উদাহরণ সামনে রেখে কবি আয়ত্ত করেছেন তাঁর উপমার অভিজ্ঞতা।

প্রকৃতপ্রস্তাবে, নজরুলের গীতিকবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যমণ্ডিত উপমা যে-কোনো কবির ঈর্ষার বস্তু। তাঁর গীতিকবিতায় অনেক ক্ষেত্রেই উপমার সংযুক্তি ঘটেছে প্রধানতঃ চিত্রকল্প বা রূপচিত্র হয়ে। একথা ঠিক যে, পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক ভাষাতেই উপমার একটি বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। সেদিক থেকে উপমার প্রাধান্য বা আধিক্য মোটেই অস্বীকার করা যায় না। বরং সেই সব ভাষা নিজস্ব গাথা বা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই ক্রমে জনপ্রিয়তা অর্জন করছে এবং উপমাধর্মী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। উপমাধর্মী ভাষা ব্যবহারের সঙ্গে উপমার প্রযুক্তির তফাৎটুকু মনে না রাখলে ভ্রান্তির সম্ভাবনা বেড়ে যাবে।* কারণ ভাষার উপমা-বহুলতা এর নিজস্ব চারিত্র্যেরই পরিচায়ক, এখানে সচেতন প্রয়োগের প্রশ্নটি গৌণ। কিন্তু এভাবে ভাষার নিজস্ব চারিত্র্যের পরিচায়ক হিসেবে যে সব উপমা কাব্যদেহে অবলীলায় ঠাঁই করে নেয় তাতে কবির কল্পনাপ্রতিভা, সাদৃশ্য অনুসন্ধান ও অন্বেষণস্পৃহা এবং সর্বোপরি প্রয়োগক্ষমতার পরিচয় দীপ্ত হয় না। সাদৃশ্য-অন্বেষণে অবশ্য অনেক সময় কবির মানস-সজাগতা, প্রখর-চেতনা, বুদ্ধি ও চাতুর্য স্বাক্ষরিত হয়, এবং এও অনুভব করা যায় যে কবিমন অভিনবত্ব-প্রয়াসী। কিন্তু সাদৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের অন্বেষণে কিংবা চেনা-উপমার চাতুর্যময় ব্যবহারে কবির কল্পনা-প্রতিভার পরিচয় ধরা পড়ে না।

এই উপমা সৃষ্টির মধ্যে কবির ভূমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কবির কল্পনাপ্রতিভার স্পর্শে অন্তঃস্থিত কবি-চেতনা বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে নতুন রূপ-মহিমা আবিষ্কারে সক্রিয় থাকেন। ফলে তাঁর উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে কাব্যের

* নজরুল কাব্যে উপমা : মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, পৃঃ ৭০ (নজরুল একাডেমী পত্রিকা, ঢাকা)।

দ্যোতনা নতুন করে প্রতিভাত হয়। এ কাজে নজরুলও সক্রিয় ছিলেন বলেই তাঁকে নিরন্তর প্রকৃতির দ্বারে হাত পেতে দাঁড়াতে হয়েছে। তাঁর কল্পনায় প্রকৃতি-ভিন্ন উপমার ভিত্তিভূমি ছিল সুপ্রাচীন শাস্ত্রীয় কাহিনী, ইতিহাস তথা লোকাচার অথবা শ্রুতিবিষয়ক ঘটনাবলী। নজরুল অস্তিত্বহীন বস্তুর যে সব কল্পনাকে তাঁর কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন তার মধ্যে বাস্তবের প্রতিফলন অনুপস্থিত থাকলেও রূপসৌন্দর্য তথা কল্পচিত্রের মধ্যে কোনো ত্রুটি ছিল না।

নজরুলের গীতিকবিতাগুলির মধ্যে সৌন্দর্যমিশ্রিত কাব্যপ্রত্যয এত গভীর যে সেগুলি আপনাপন বিশ্বাস বা সিদ্ধান্তের উপর দাঁড়িয়ে আছে। অথচ সেই প্রত্যয়ের অভাব প্রায়শঃই কবিদের বিব্রত করে। বলতে গেলে উপমা এবং বস্তু-নিচয়ের অভাবেই এমনটি ঘটে থাকে। নজরুলের ক্ষেত্রে এর উল্টোটাই ঘটেছে। তিনি কবিতার বক্তব্যে ও ভাষা আবিষ্কারের মধ্যেই নতুন উপমা ও চিত্রকল্পেব মুক্তি ঘটিয়েছিলেন। প্রচলিত উপমায় কবির উৎসাহ অপেক্ষাকৃত কম। এই কার্যে কবির কল্পনাশক্তি, মানসপ্রবণতা প্রকৃতপক্ষে মৌলিক প্রেরণা ও বিশ্বাসের মাধ্যমেই নবদিগন্তের সূচনা করেছে। এর মূলে কবির সামাজিক, রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক প্রত্যয়ের পাশাপাশি ধর্মীয় আস্থার গুরুত্বপূর্ণ প্রভাবটুকু অনস্বীকার্য। প্রত্যয়ের এই সৌকুমার্যেব সার্থক ব্যবহার প্রথম পর্বের কবিতার চেয়ে দ্বিতীয় পর্বের গীতিকবিতায় অপেক্ষাকৃত বেশী। কাব্যের সংহত রূপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবিব পরিণতিবোধেব সঙ্গে সঙ্গেই এব রূপান্তর নজরে পড়ে। পাঠক নতুন করে তাই নজরুলের গীতিকবিতাব মধ্যে আবিষ্কার কবেন সার্থক প্রকৃতি-নির্ভব উপমা-মাধুর্য।

নজরুলের কৈশোর জীবনের স্মৃতিমথিত ঘটনাশ্রয়ী যে সব কবিতা আছে তাতে ঘটনার চিত্রায়ণ ও অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি সহজেই লক্ষ্য করা যায়। এসব স্থলে কবির প্রকৃতি আশ্রয়ী রোম্যান্টিক মানসিকতার পরিচয়টি ধরা পড়েছে। পরবর্তীকালে এই প্রবণতার গুণেই মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ বা বেদনা ইত্যাদি জাতীয় অনুভূতি প্রকাশকার্যে প্রকৃতিব সাহায্য গ্রহণে তাঁর কোনো দ্বিধা দেখা যায়নি। অবশ্য বাল্যকাল থেকেই তাঁর কল্পনাশক্তি এবং কাব্যের মধ্যে বিস্ময়কর অনুভূতি প্রকাশ করার ক্ষমতা করায়ত্ত ছিল। ফলে তাঁর কাব্যে আবেগ ও উপমা-উৎপ্রেক্ষার ব্যবহার হয়েও তা মৌলিক ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছে। লক্ষ্য করবার বিষয় যে নজরুল পরিণত পর্বে এসে তাঁর কাব্যে উপমা প্রয়োগে যথাযথ সাদৃশ্যের সঙ্গে সাদৃশ্যের অন্বেষণেই কেবলমাত্র উৎসাহী ছিলেন না, তাঁর লক্ষ্য ছিল উপমা প্রসূত কাব্যঝঙ্কার যা পাঠককে পৌঁছে

দেবে অনির্বচনীয় আনন্দের দ্বারপ্রান্তে। আর এই কার্যে কবি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করেছেন স্বীয় জীবনের অভিজ্ঞতা, অবচেতন মনে যা কাব্যের সহায়ক হয়েই ধরা দিয়েছে। এই অভিজ্ঞান নির্দ্বিধায় কবি অর্জন করেছিলেন ঐতিহ্য তথা পুরাণের বহু বিচিত্র ঘটনার মাধ্যম থেকে। এবং অবশেষে এইভাবেই কবির উপমা মিশে গেছে কল্পনার তাৎপর্যময় সংহতিতে যার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার কাব্যের নান্দনিক উৎকর্ষে।

সুতরাং, কবিকল্পনার ক্ষেত্রে উপমার গুরুত্ব কবি-কুশলতার পরিচায়ক হিসেবেই দেখা দেয়। অ্যারিস্টটলের কাব্যকলা* বিষয়ক মন্তব্যেও এর স্বীকৃতি মেলে। পাশাপাশি তিনি স্মরণ করেছিলেন কবিতার আরো চারটি অলঙ্কার। যেমন চিত্রকল্প, রূপক, প্রতীক ও নবত্বারোপ যা উপমাকে নির্ভর করেই গড়ে ওঠে। নজরুলের কাব্যকলায় তাঁর উপমা অনেকক্ষেত্রেই শারীরচেতন (sensuous) হবার ফলে তার প্রভাব স্পর্শসঞ্চারী ও ঐন্দ্রিয়িক হয়ে উঠেছে। বহুক্ষেত্রে নিসর্গের অনুভূতি মিলে গেছে তার শারীরচৈতন্যের কল্পনাতে যার প্রভাবে কবি নতুন করে আবিষ্কার করেছেন নারীদেহের নবতম লাবণ্যঘন রূপ। আবার কখনো উপমা প্রয়োগের মধ্যেই বিমূর্ত অনুভূতিকে আশ্চর্য নিষ্ঠায় ও নৈপুণ্যে কবি প্রমূর্ত করে তোলার সাফল্য প্রদর্শন করেছেন। কবির আপন বাসনা যেখানে নিসর্গ প্রকৃতিতে উৎসর্গীত সেখানে তাঁর কল্পনা সহজেই অতিক্রম করেছে প্রথাগত বাধা। ফলে সে সব ক্ষেত্রে নজরুলের উপমা-উৎপ্রেক্ষার চঞ্চল ঐশ্বর্যে তাঁর কাব্য অলঙ্কৃত। অর্থাৎ সেখানে কবি নিরন্তর অলঙ্কার-চঞ্চল ও ইন্দ্রিয়সঞ্চারী। প্রসঙ্গতঃ নিসর্গ প্রকৃতির ক্ষেত্রে কবির মানবত্ব আরোপ তাঁকে অন্যান্য প্রকৃতি প্রেমিকদের তুলনায় বিশিষ্টতা দান করেছে। বস্তুতঃ এর ফলেই নজরুলের কাব্য অর্জন করেছে সম্পূর্ণ নতুন এক ভঙ্গিমা। প্রেম ও বাসনা-নির্ভরতাই এই সাফল্যের দ্যোতক।

অনুরূপভাবে কবিপ্রসিদ্ধির ব্যবহার তাঁর কবিতাকে নতুন ঐশ্বর্য দান করেছে। এজন্যে তাঁকে অনবরত ব্যবহার করতে হয়েছে দেশীয় সৌন্দর্য ও সাহিত্যকৃত পর্বশোভা। উপমার দিক থেকে অধিক ব্যবহৃত শব্দগুলি নিম্নরূপ: বুলবুল,

* Metaphor is the application of an alien name by transference either from genus to species, or from species to genus, or from species to species, or byanalogy, that is, proportion....(XXI, Aristotle's Poetics.)

চকোর, গোলাপ, চাঁদ, চাতক, পাপিয়া, পলাশ, হরিণ, হরিণী, চাঁপা, পদ্মফুল, জ্যোৎস্না। এই নামগুলি প্রধানতঃ তাঁর প্রেমবিষয়ক ও প্রকৃতির প্রশস্তিবিষয়ক কাব্যে স্থানলাভ করেছে। উদাহরণ হিসেবে, বুলবুল, চোখের চাতক, চক্রবাক, গীতি-শতদল, দোলনচাঁপা, শিউলিমালা, শেষ-সওগাত প্রভৃতি গ্রন্থের নাম করা যেতে পারে।

উপমা ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক ভিন্‌দেশী শব্দকে নজরুল বাংলা কবিতার মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে পারস্য দেশের প্রেম বিষয়ক কবিতার মাধুর্য ও শব্দাবলীর তীক্ষ্ণতাকে অক্লেশে কবিতার শব্দ হিসেবে গ্রহণ করতে তাঁর কোনো সংস্কার ছিল না। ফলে বিরহের কবিতায় এই শব্দগুলি বারবাব ফিরে এসেছে কবিতার মধ্যে। বুলবুল (১ম), ছায়ানট, চক্রবাক, সিন্ধু হিন্দোল, সুরসাকী প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থে এর অজস্র উদাহরণ পাওযা যায়। আবার এই উপমা প্রয়োগে নজরুল দ্বিধাহীনভাবে হাত বাড়িয়েছিলেন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক কাব্যের বহু বিচিত্র শব্দরাজির দিকে। রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে ভক্তিবাদের যে করুণ গাথা বিধৃত হয়েছিল অনুরূপ ভাবরসকে নজরুলও নিজস্ব রীতিতে ব্যবহার করার আশ্চর্য কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। 'সুরসাকী' গীতিকবিতার মধ্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—

তরঙ্গ মোর রঙ্গ করে, অঙ্গে লাগে দোল্,
একি এ নেশার ঘোরে তনু মন আঁখি লোল্।

শব্দরাশির মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অজস্র শব্দ কবি ব্যবহার করেছেন। গাগরী, দুহুঁ, পিয়া, চাঁচর, নওল, চন্দ, গোরী, শাওন, আলি, ঘগরী, পুতলা, পহিল, ঠাম, তিতি ইত্যাদি শব্দগুলি নজরুলের গীতিকাব্যে সংমিশ্রিত হয়ে নতুন ভাবের সৃষ্টি করেছে।

এই একই উদ্দেশ্যে নজরুল অক্লেশে প্রাচীন পুরাণের অজস্র ব্যবহার করেছেন। ফলে কাব্যের প্রতিষ্ঠিত অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে উপমায় প্রাচীন পুরাণের ঐতিহ্য সংযুক্ত হয়ে সম্ভাবনার নব্য আবিষ্কৃত তাৎপর্য সূচিত হয়েছে। পুরাণের উদাহরণ এবং উপমা হিসেবে তার ব্যবহার নজরুলের কাব্যের ন্যায় গদ্য রচনায়ও লক্ষ্য করা যায়। তবে কবি প্রধানতঃ তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রেই পুরাণের ব্যবহার বেশী পরিমাণে করেছিলেন। 'অগ্নিবীণা'র অধিকাংশ কবিতায় এর উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। তাছাড়া 'বিষের বাঁশী', 'দোলনচাঁপা', 'বুলবুল', 'চোখের চাতক', 'নজরুল গীতিকা', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'জিঞ্জীর' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থেও এর যথেষ্ট উল্লেখ লক্ষণীয়। অবশ্য হাফিজের

অনুবাদ ও ওমর খৈয়ামের অনুবাদে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই ধর্মীয় অনুশাসনসমৃদ্ধ প্রাচীন উপমার আধিক্য নজরে পড়ে। কবি নিজের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলিতে সেই অভিজ্ঞতার সদ্ব্যবহার করেছিলেন। হিন্দু-মুসলিম কৃষ্টি, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রাচীন প্রভাব সম্পর্কে নজরুলের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। তাঁর কাব্যের উপমার ব্যবহার সেই অভিজ্ঞতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কবির বিখ্যাত কবিতা 'বিদ্রোহী'তে প্রাচীন উপমা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পাশাপাশি হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের পুরাণ বা গাথার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এমন কি সুপ্রাচীন গ্রীকের পুরাণ বিষয়ক উদ্ধৃতি কবির ধর্মীয় সহিষ্ণুতারই পরিচায়ক। জনৈক সমালোচক* একেই উল্লেখ করে বলেছেন, একশো একচল্লিশ পংক্তির এই কবিতাটি পুরাণ প্রয়োগের একটি (tour de force)। যাই হোক 'বিদ্রোহী' কবিতার কয়েকটি অংশে হিন্দু দেবদেবীর নামের উপমা মোটামুটি নিম্নরূপ :

ধূর্জটি, জমদগ্নি, রুদ্র, নটরাজ, অগ্নি, ইন্দ্রানী সুত, কৃষ্ণ প্রণব, ব্যোমকেশ, গঙ্গোত্রী, ঈশান, পিনাক-পানি, ধর্মরাজ, দুর্বাসা, বিশ্বমিত্র, বসুধা, বাসুকি, শ্যাম, বিষ্ণু, শনি, চণ্ডী, বলরাম, ভৃগু ইত্যাদি।

মুসলিম : খোদা, ইসাফিল, বোররাক, জিব্রাইল।

গ্রীক : অর্ফিয়াস।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, হিন্দু দেবদেবীর সঙ্গে মুসলিম ধর্মীয় শব্দাদির সংমিশ্রণ এবং সেই সঙ্গে প্রাচীন গ্রীক কবির (অর্ফিয়াস) উল্লেখ করে ভাবগত দিক থেকে উপমার সাহায্যে একটি মহৎ ঐক্য স্থাপনা করেছেন নজরুল। অবশ্য এই সবকিছুর ব্যবহার মূলতঃ রূপক বা প্রতীক অপেক্ষা আরও গভীরতর উদ্দেশ্যবাহী। এই কবিতায় যে দুর্জয় প্রতিবাদের ভাষা সোচ্চারিত তার ফলেই এইসব দেবদেবীর উল্লেখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিবাদী মানসিকতার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। 'আগমনী' কবিতায় একই উদ্দেশ্যে দেবদেবীদের ধ্বংসের প্রতীক হিসেবে চিত্রিত করার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুতঃ বিদ্রোহী, প্রলয়োল্লাস, ধূমকেতু কবিতায় যেমন হিন্দুদের দেবদেবীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, অপরদিকে কামাল পাশা, কোরবাণী মোহরাম, খেয়াপারের

* আবদুল মান্নান সৈয়দ

তরণী, রণভেরী, সাত-ইল-আরব কবিতায় মুসলিম দেবদেবীর নাম উল্লেখযোগ্য, বিশেষ করে 'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম'এর কবিতায় মুসলিম ইতিহাসের অসংখ্য পুরাণের বহু প্রসঙ্গ নজরে আসে। 'সাম্যবাদী'র কবিতায় যে উপমার প্রয়োগ ঘটেছে তা পূর্বাপেক্ষা অনেকটা ভিন্ন। এখানে পুরাণের প্রয়োগ বাচ্যার্থসূচক। ব্যঙ্গার্থ পুরোপুরি অনুপস্থিত। রূপক বা প্রতীকের প্রশ্নও এখানে তেমন জরুরী বলে বিবেচিত নয়। এইভাবেই কবিকল্পনা হয়ে উঠেছে কবির সৃষ্ট লীলা। প্রতিনিয়ত উপমার সার্থক ব্যবহারেও কবি যেন অতৃপ্ত। ফলে বারবার কবির কল্পনা সংগ্রহ করেছে অপ্রত্যাশিত, বিস্মিত উপমার ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ কাব্যকে গতিশীল করার চিন্তা সব সময়ই কবির মধ্যে কাজ করেছে। অনেক সময় এইভাবে বহু বিচিত্র উপমা ব্যবহারের মধ্যে বিমূর্ত অনুভূতি আশ্চর্যভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পাশাপাশি পরপর একই প্রসঙ্গের উত্থাপনের ফলে যে শব্দের স্নিগ্ধ অনুরণন সৃষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই অনুরণনের মধ্যে (onomatopoeia)।

মোরা ঝঞ্ঝার মত উদ্দাম, মোরা ঝর্ণার মত চঞ্চল।
মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত সচ্ছল॥

কবিকল্পনায় যে উৎপ্রেক্ষা আমরা লক্ষ্য করি তা মূলতঃ উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্যজনিত সংশয়ের ফল। উৎপ্রেক্ষা এইভাবেই কাব্যকে মণ্ডিত করে থাকে।

যে সকল পুরাণ কবির কাব্যে প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে কবির স্বভাবজাত নৈপুণ্যে তাব পুনর্জন্ম হয়েছে। অর্থাৎ পুরাণের নব্য অনুভূতি তথা আবিষ্কার যেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আস্বাদেরই পরিচয় এ ক্ষেত্রে বহন করেছে। এই কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, কবি পুরাণের প্রাচীন ঐতিহ্যকে আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করেছিলেন। পুরাণকে সাবলীলভাবে তাঁর বক্তব্যের মাধ্যম হিসেবে সার্থক ব্যবহারের ফলে বাংলা কাব্যের সম্ভাবনার দ্বার আরও প্রশস্ত হয়ে উঠল। এতে একদিকে যেমন মুসলিম ইতিহাসের পটভূমি পাঠকের অভিজ্ঞতার শরিক হয়ে উঠেছে তেমনি মুসলিম পুরাণকে কবিতায় প্রথম ব্যবহারের অগ্রদূত ও পথিকৃৎ হয়ে নজরুল এক অনাবিষ্কৃত জগতের দ্বার উত্তরাধিকারীদের জন্যে খুলে দিয়েছেন। মূলতঃ কোথাও কোথাও উপমা যেমন অবিকলভাবে অনুসৃত তেমনি পুরাণের ব্যবহারের মাধ্যমেই অন্তর্দিকে ভিন্ন অর্থের গভীরে কবি প্রবেশ করেছেন। এই দ্বিবিধ ভাবের ব্যবহার তাঁর কাব্যপ্রতিভার অন্যতম লক্ষণ।

'ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্' কবিতায় যে সব পুরাণ প্রসঙ্গ উপস্থিত সেগুলো অনেক পাঠকের সম্ভবত জানা নেই এই আশংকায় কবি সে সব উপমার পরিচয় নিজেই দান করেছিলেন। যেমন—লাত, ইবলিস্, রোস্তম, আজরাইল, জুলফিকার, জিবরাইল, আজাজিল, শাদ্দাদ, মিকাইল, ইসরাফিল, ফেরাউন, জীন, খারোজিন ইত্যাদি।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন এই যে উপমা বিষয়ক কার্যে প্রচলিত শব্দাবলী, যেমন, হতো, তারি, সম, যেন, প্রায়, ওব ইত্যাদির প্রভাব নজরুলের কাব্যে বিশেষ দেখা যায় না। তাঁর ব্যবহারের ক্ষেত্রে বস্তুতঃ উপমা এবং উৎপ্রেক্ষা যা উপমারই পর্যায়ভুক্ত তাই গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন, 'তরুণ-অরুণ সম আশাস' (চোখের চাতক), 'ফুলে ফুলে ধরা যেন ভরা' (নজরুল গীতিকা) 'ঝড়ের বনলতার মত', 'লুকিযে কাঁদো কেন' (গান) ইত্যাদি। আবার অনেক সময় দেখা যাব যে স্বধর্ম এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো ধর্মের অনুসন্ধানেও কবির চিত্ত মেতে উঠেছে। ফলে কখনো এক বস্তুর সঙ্গে অপর বস্তুর তুলনার পাশাপাশি তার বৈপরীত্যের অনুসন্ধান সহজেই নজরে পড়ে। কবির উপমাপ্রসূত এই প্রয়াস প্রধানতঃ এসেছে তাঁর অন্তর থেকে। এই স্বারূপ্য চেতনার অনুভবের বিনিময়েই নজরুলের কবিতা আরও অলঙ্কৃত হয়ে উঠেছে। আবার এরই সঙ্গে যুক্ত হযেছে কবির প্রতিসঙ্গ প্রকৃতি যাকে অনেকে 'এক ইন্দ্রিযজ ধারণার মধ্যে অপর ইন্দ্রিয়জ ধারণার রূপান্তর' বলে ব্যাখ্যা করেছেন।* যাই হোক, লক্ষ্য করলে কিন্তু দেখা যাবে যে, প্রতিসঙ্গের ব্যবহারের মধ্যে যে বৈচিত্র্য নজরুলের কাব্যে ফুটে উঠেছে তা ক্রমশঃ মর্মগ্রাহী হয়ে উঠেছে কবির নিজস্ব রূপকানুভূতির সার্থক সংযুক্তিবোধের নৈপুণ্যে। কবি অত্যন্ত সচেতনভাবেই কাব্যে রূপকের মধ্যে দুটি ভাবের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছেন। বাচ্যার্থ ও গভীরার্থ বোধের মাধ্যমে কবির এই দুটি ভাব আত্মপ্রকাশ করেছে। কবির অধিকাংশ কাব্যগীতির মধ্যেই এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়া নজরুলের কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব তাঁর কবিতার অন্তঃস্থিত চিত্রময়তা। কবির সৌন্দর্যলোকের উদ্দেশ্যে কল্পিত অভিসারের আকাঙ্ক্ষা জীবন্ত

* নজরুলের কোনো গানের চরণে দেখা যায় এক ইন্দ্রিয়জ ধারণা অপর ইন্দ্রিয়জ ধারণায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। একে বলতে পারি প্রতিসঙ্গ। র‍্যাঁবো বোদলেআর বা পরবর্তী পরাবাস্তব কবিদের চেতনা রচনায় প্রতিসঙ্গের অবিরল ব্যবহার দেখা যায়।—আবদুল মান্নান সৈয়দ।

রূপ পরিগ্রহ করেছে প্রধানতঃ তাঁর চিত্রকল্পের আশ্চর্য সাফল্যধর্মী পরিবেশনায়। কাব্যগীতির অধিকাংশ অংশেই কবির আলোচ্য চিত্রকল্পের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে। চিত্রের সুষমা তথা সামগ্রিক ঐক্যের সন্ধানসূত্র আবিষ্কার করতে গিয়ে কবি সৌন্দর্যের জগতে ডুব দিয়েছিলেন। হয়তো এরই বিনিময়ে চিত্রকল্পের সৌকুমার্যের মূল্যে কবি ফিরে পেয়েছেন তাঁর ঈপ্সিত ভাবনার নিজস্ব জগৎ। ফলে নজরুলের এই কবিতাগুলি যেন সহজেই হয়ে উঠেছে চিত্রকরের মূল্যবান সংগৃহীত সৌন্দর্য ও সংহতির দীপ্তিময় এক মিছিল।

উপরন্তু, চিত্রকল্প সার্থক হয়ে ওঠার মূলে কাজ করেছে কাব্যের অলঙ্কারবোধ। প্রকৃতপক্ষে, অলঙ্কারের সুচারু ব্যবহারের বিনিময়েই ফুটে ওঠে চিত্রকল্পের মূল্যবান তাৎপর্য। নজরুল তা জানতেন। ফলে তাঁর কবিমানসে সচেতন-ভাবেই কাজ করেছে চিত্রকল্পের মাধুর্যমণ্ডিত কল্পনা। গীতিময়তা মিশ্রিত কাব্য-গীতিতে এই বোধই সর্বদা সুতীব্রভাবে কাজ করেছে। অর্থাৎ কল্পনার মধ্যে চিত্রময়তার অন্তর্ভুক্তি, তথা সংযোজনের মধ্য দিয়ে তাঁর অর্জিত অভিজ্ঞতার দীপ্তি নতুন করে প্রমাণিত। নজরুলের কাব্যের রুচি আঙ্গিকগত অথবা যে অনিশ্চয়তা বা অযত্নের ফলে কবির সুগভীর ভাবনা অনেকক্ষেত্রে উদ্দেশ্যবাহী হতে পারেনি তা থেকেও অধিকাংশ স্থলে মুক্তি দিয়েছে কবির এই চিত্রকল্প বোধ বা নির্মিতিভাবনা। বিবেকের সাথে কোনো বোঝাবুঝি এতে নেই বটে, কিন্তু অনুভূতির সুতীব্র প্রেরণা কবিকে উপহার দিয়েছে বিস্ময়কর চিত্র-কল্পনাজাত বাক্‌প্রতিমা। তাকেই কবি, কাব্যগীতির পংক্তিতে রূপদান করেছেন। উচ্ছ্বাসের বাহুল্য প্রেরণার প্রাবল্যের গুণে বাধা হয়ে হয়তো সেইজন্যেই তাঁর রচনায় দেখা দিতে পারেনি। এই চিত্রকল্প কবির সৃষ্ট অলঙ্কারেরই নব পরিবেশনা মাত্র। সেইজন্যে নজরুলের কবিতায় সুগভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তাঁরই সৃষ্ট অলঙ্কারের লীলা। বস্তুতঃ, কবির এই চিত্রকল্প প্রাণ পেয়েছে প্রধানতঃ ক্রিয়াপদে ও শব্দের সার্থক ব্যবহারের নৈপুণ্যে। তাই বলে কবিতায় গীতিকবিতার মৌলিক ধর্ম থেকে নজরুল কখনোই চ্যুত হননি। অর্থাৎ বিষয়ের সংহতি, ঐক্য এবং কেন্দ্রভাবনা মূলতঃ কবিকে পরিচালনা করেছে। উচ্ছ্বাসের প্রাবল্য ও আবেগের বল্গাহীন প্রেরণা সত্ত্বেও নজরুল কবিতা প্রাথমিক এই শর্তকে কখনো লঙ্ঘন করেনি। হয়তো কবির নিজস্ব বোধ এ কাজে কাব্যের সুচারু দর্শনের অভীষ্ট ফললাভের সহায়ক হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ তাঁর দ্বিধা ছিল না প্রচলিত অন্তর্মিলের বদলে বহু বিচিত্র অন্তর্মিলের প্রবর্তনায়। এমন কি নিজস্ব ভাবনায় নির্দ্বিধেই কাব্যে নজরুল নিরন্তর ব্যবহার করেছেন

মধ্যমিলের অজস্র শব্দতরঙ্গমালা। এর ফলে প্রায়শঃ অনেক লৌকিক শব্দও এসে জমা পড়েছে কবির কবিতার মধ্যে। দু-চারটে ক্ষেত্রে এই মধ্যমিলের জোয়ার-প্রসূত আবেগ কবিকে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই অমনোযোগী করে তুলেছে। কাব্যের ব্যাকরণে সেগুলি অশুদ্ধির দায়ে অভিযুক্ত হলেও পরিবেশগত বৈচিত্র্যের সার্থক রূপায়ণে সেগুলি পাঠকের অন্তরকে পরিণতিতে স্পর্শ করে যায়। কবির সারল্যবোধ এবং বিশ্বস্ততাই তাঁকে বিজয়ীর বাহার হাতে তুলে দিয়েছে। এর সমর্থনে অজস্র উদাহরণ পাওয়া যায় তাঁর কবিতায়। যেমন—

আর পারিনে সাধতে লো সই এক-কোঁটা এই ছুঁড়িকে।
ফুটবে না সে ফোটাবে কে বল্ লো সে ফুল-কুঁড়িকে॥
  ঘোমটা-চাঁপা পারুল-কলি
  বৃথাই তারে সাধল অলি,
পাশ দিয়ে হায় শ্বাস ফেলে 'যায় হুতাশ বাতাস টলি।'
  আ মলো ছিঃ। ওর হল কি ?
সুতোর গুঁতো শ্রান্ত-শিথিল টান্তে ও মন-ঘুড়িকে।
  আর শুনেছিস্ সই ?
ওলো হিমের চুমু হার মেনেছে এইটুকু আইবুড়ীকে॥
সন্ধ্যে-সকাল ছুঁয়ে কপাল রবির যাওয়া-আসাই সার,
ব্যর্থ হল পথিক কবির গভীর ভালবাসার হার।
  জল ঢেলে যায় জংলা-বধূ,
  মৌমাছি দেয় কমলা মধু,
শরম-চাদর খুলবে না সে আদর শুধু শুধু।
  কে জানে বোন্ পথভোলা কোন্
তরুণ চোখের করুণ চাওয়ায় চোখ ঠেরেছে ছুঁড়িকে—
      বসে আছে লো,
  এই লজ্জাবতীর বধির বুকের সিংহ-আসন জুড়ি কে ?

মধুসূদনের ব্যবহৃত 'লো' ছাড়াও এই কবিতায় প্রাত্যহিক জীবনের ঘরোয়া কথার ছড়াছড়ি। উদাহরণ হিসেবে 'আ', 'মলো ছিঃ', 'সুতোর গুঁতো', 'হিমের চুমু', 'আইবুড়ী', 'জংলা বধূ', 'চোখ ঠেরেছে ছুঁড়িকে' ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে। 'লো' কথাটির ব্যবহারের মধ্যে ভাবপ্রকাশের দিক থেকে মধুসূদনের সঙ্গে নজরুলের পার্থক্য লক্ষণীয়। উপরন্তু 'লা'এর অতিরিক্ত

ব্যবহার শব্দগত দিক ছাড়াও কবিতার গঠনের দিক থেকেও একে সুরবাহী করে তুলেছে। যেমন—কে বল্ লো সে ফুল কুঁড়িকে, পারুল কলি সাধলো অলি, শ্বাস ফেলে যায় হুতাশ বাতাস টলি, আ মলো ছিঃ, ওর হল কি, সন্ধ্যে-সকাল ছুঁয়ে কপাল, ব্যর্থ হল পথিক-কবির গভীর ভালবাসার হার, জল ঢেলে যায় জংলা-বধূ, ইত্যাদি। শব্দের নৈপুণ্য অপেক্ষা সামগ্রিক ছন্দকে এইভাবে কবিতার কেন্দ্রীয় ভাবের সঙ্গে ঐক্যের প্রচেষ্টাটুকু একান্তই লৌকিক। রবীন্দ্র-পরবর্তী কাব্যে এই লোকায়ত ভাবনার প্রতিফলন নজরুলের নিজস্ব অবদান। প্রাত্যহিকতার পরিচিত অনুভূতিকে কোনো ভিন্ন পোষাক না পরিয়েও কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করার সম্পূর্ণ কৃতিত্ব নজরুলের।

প্রতীকের সঙ্গে রূপকের পার্থক্য কিছুটা মৌলিক। প্রতীক প্রধানতঃ কল্পনার সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতাপ্রসূত। আপাতগ্রাহ্য মিলের মধ্যেই প্রতীকের সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে ওঠে। রূপক বিমূর্ত ভাবনার ফলশ্রুতি। ইএটস্ একেই বলেছেন আকল্পনা। বস্তুতঃ, রূপক প্রতীক এবং চিত্রকল্প পরস্পর বিশ্লিষ্ট নয়। কিন্তু গুণগত বিচারে এদের পৃথক সত্তা অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য এদের পরস্পর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রয়োজনবোধে অসংখ্য চিত্রকল্পের সমাবেশ সম্মিলিত হয়ে সার্থক প্রতীকে রূপান্তরিত হয়। প্রতীকের এই সার্থকতা নজরুলের কাব্যে রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করে ভিন্নতর এক সংহতি। রূপকের জন্ম অভিন্ন সংমিশনে। প্রতীকের সৃষ্টি পৃথক বিচারবোধের সুষমা থেকেই রূপ পরিগ্রহ করে। আসলে, রূপক সৃষ্টি হয়ে থাকে। যদিও এর মূলে থাকে কবির দেখার ক্ষমতা, অভিজ্ঞতা এবং অনুভূতির কৌলীন্য। নজরুলের কবিতায়, বিশেষ করে দোলনচাঁপা, ছায়ানট এবং চক্রবাকের কবিতাগুলির মধ্যে রূপকের সাফল্য কবির অনন্যসাধারণ কল্পনাবোধের পরিচায়ক। কিন্তু প্রতীকের ভিন্নতর চিন্তা সেইসঙ্গে আমাদের আচ্ছন্ন করে। কেননা কবির অলক্ষ্যে সৃষ্ট হয় প্রতীকের সুচারু রূপায়ণ। আর কল্পনাপ্রতিভার সেই আশ্চর্য নৈপুণ্যের বলেই নজরুল সৃষ্টি করেছেন অজস্র প্রতীকের উজ্জ্বল প্রস্তাবনা।

সচেতন শিল্পবোধের মধ্যে জন্ম নেয় উপমা বা প্রতীক। সেদিক থেকে নজরুলের চরিত্রগত প্রবণতা শিল্পবোধের গুরু ভাবনা থেকে কিছুটা পৃথক। তাঁর প্রবৃত্তির মূলে ছিল শ্রান্তিহীন উচ্ছ্বাস ও আবেগের অন্তহীন জোয়ার। তাঁর সৃজনশীলতাও এর প্রভাবমুক্ত নয়। এই অশ্রান্ত কবির ভাবাবেগ স্বাভাবিক নিয়মেই যুক্তিনির্ভর হতে পারে না। তাই বলে কবির অবচেতন

মানসের কাব্যভাবনার প্রক্রিয়ায় যে সব উপমা বা প্রতীক ভিন্ন ভিন্ন চিত্রকল্পের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে তা কাব্যের বিধিনিষেধের বহির্ভূত নয়। আবেগের তীব্রতায় কিছুটা অযত্ন তাঁর কবিতায় লক্ষ্য করা যায় বটে, কিন্তু সৃজনধর্মী রচনার মাধুর্যে এবং সর্বোপরি শব্দের সার্থক ব্যবহারের গুণে অযত্নের মধ্যেও কল্পনার সার্থক চিত্রণ গভীর অর্থকেই সূচিত করেছে। 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থের কিছু কিছু কবিতায় চিত্রকল্পের সংহতি স্বীয় গভীরতার গুণেই প্রতীকে রূপান্তরিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে নজরুল ক্রমশ: নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ফলে, এই অংশের অনেক কবিতা চিত্রকল্পের অনির্বচনীয় উপভোগ্যতায় অলঙ্কৃত। সৌন্দর্যের রূপমুগ্ধ কবিসত্তা চিত্রকল্পনার গভীরে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। হতে পারে এটা বাস্তবতার নির্মম উপলব্ধির ভাবনা থেকে ভিন্নতর কল্পনার অনুভূতিতে অবগাহন। কিন্তু এতে কবির বিশ্বস্ত জীবনবোধ বা নিজস্ব স্বভাবের অস্বীকৃতি কোথাও দেখা যায়নি। 'আমি দুর্বার, আমি ভেঙে করি সব চুরমার'এর উপলব্ধি ক্ষণিকের বিশ্রাম ফিরে পেতে চেয়েছে গীতিকাব্যের সূক্ষ্মতর রসের মধ্যে। তাই তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছে নিজস্ব ভাবনার ব্যঞ্জনাময় চিত্রকল্প। অনেক সময় এই চিত্রকল্পের রূপায়ণ সেইজন্যেই প্রোজ্জ্বল ও অনুভববেদ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, নজরুলের নিজস্ব কাব্যবোধ অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের গুণে অনন্য হয়ে ধরা পড়েছে তাঁর কাব্যকল্পনায়। রূপক এবং প্রতীকের মূল্যায়ন চিত্রকল্পের মৌলিক ভাবনাকে নিয়েই গড়ে ওঠে। সুতরাং এই তিনটি ভিন্ন কাব্যালঙ্কার পরস্পর বিশ্লিষ্ট নয়। তবু নজরুলের কাব্যে চিত্রকল্প, যাকে কোথাও কোথাও বলা হয়েছে 'ইমেজ' বা 'বাক্‌প্রতিমা' বলে, তা বিশেষ সম্পদ হিসেবে বিবেচ্য। কবিকল্পনা প্রসঙ্গে কবির চেতনার দ্বিবিধ পর্যায়ের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। অর্থাৎ কবির বিমূর্ত (abstract) কল্পনা ও ইন্দ্রিয়ভাবনা (sensuousness) তাঁর কাব্যভাবনার অন্যতম উৎস। ফলে কবির দৃশ্যমান বস্তুনিচয় কাব্যে যখন রূপ লাভ করেছে তখন তাকে বলা যেতে পরে কাব্যিক বর্ণনা (poetic depiction)। অন্যদিকে নজরুলের কাব্যরচনার দ্বিতীয় পর্বে যে অনুভূতি প্রকাশিত তা একান্তভাবেই অন্তর্মুখী। পাঠকের মনোলোকে অবচেতন ভাবের উন্মীলন ঘটাতে এই কবিতার প্রভাব অনস্বীকার্য। অন্তর্লীন এই কবিতার মধ্যে দৃষ্টি ছাড়াও ঘ্রাণ, শ্রুতি, স্পর্শ ও স্বাদের পরিচয় মিশ্রিত থাকে। নজরুলের কাব্যের চিত্রকল্পমায়ায় যে স্নিগ্ধতা পাঠকের হৃদয়কে সহজেই স্পর্শ করে তার মূলে রয়েছে কবির উপরোক্ত ইন্দ্রিয়ানুভূতি। পৃথক পৃথক

বর্ণাভাসের মাধ্যমে এই চিত্রকল্পনা নজরুলের কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে। যদিও কবির আবেগ ও উচ্ছলতা অনুভূতির সংহতিতে ভাস্বর বলেই কবির চিত্রকল্পের সার্থকতা আত্ম বিমোচনের মধ্যেই নিহিত। তাঁর কবিতায় চিত্রকল্পের সার্থকতা কবির স্বভাবজাত স্বরসাম্যের শান্ত পরিণতি হিসেবেই গ্রহণযোগ্য।

বর্ণনার মধ্যে কবি যেখানে ইন্দ্রিয়জ অনুভূতির পরিচয় দিয়েছেন বিভিন্ন দিক থেকে তা উল্লেখযোগ্য। চিত্রকল্পের নৈপুন্য ছাড়াও স্পর্শেন্দ্রিয়ের সুতীব্র অনুভব অনেক ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কথা মনে করিয়ে দেয়। এই দুই কবির সমসাময়িকতা গীতিকাব্যোচিত চেতনার উন্মীলনে সুতীক্ষ্ণ হবার মূলে রয়েছে অনুভূতি বিষয়ক নৈপুণ্য এবং মিল যা পরিণতিতে পাঠকমনে ঔৎসুক্যের সঞ্চার করে। তুলনামূলকভাবে রবীন্দ্রোত্তর কালে নজরুলের পরই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন জীবনানন্দ। সুতরাং ইন্দ্রিয়জ কল্পনার ক্ষেত্রে স্বভাবতঃই এই দুই কবির অনুরূপ উদাহরণের কৌতূহল জাগা স্বাভাবিক। যেমন—

নজরুল :

(ক) ঐ শরম-নরম গরম ঠোঁটের অধীর মদির ছোঁয়াবি

(খ) থলকমলী আঁউরে যেত তপ্ত ও-গাল দুই।

(গ) ইন্দ্রনীল কান্তমণি মেখলার ২১
মেদিনীর নিতম্ব-দোলার সাথে দোল অনুপম।

জীবনানন্দ :

(ক) কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত

(খ) —কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে

(গ) আকাশের বুকে তারা যেন চোখ—সাদা হাত—যেন স্তন—ঘাস।

উপরোক্ত অংশে ঘ্রাণ ও স্বাদের অনুভব এই দুই কবির অনুভূতির তীব্রতাকেই প্রমাণ করে।

পাশাপাশি চিত্রকল্প বিষয়ক ভাবনা অনেক সময় অতিরিক্ত ব্যবহারের চাপে মালিন্যের দায়ে অভিযুক্ত হয়েছে। বহু ব্যবহৃত উপমা অথবা চিত্রের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে তাঁর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। কিন্তু যেখানেই তিনি পরিচিত কাব্যিক অলঙ্কারকে নিজস্ব কল্পনার মাধুরীতে সিক্ত করেছেন, এবং যেখানে ভিন্ন-রসের আধারে পরিবেশন করতে প্রয়াসী সেখানেই তিনি সার্থকতা লাভ করেছেন। বস্তুতঃ সেগুলি অস্বাভাবিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে পরিচিত

ফুল বা ঘোড়ার ব্যবহার তিনি অনবরত করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর আঙ্গিকগত ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতায় আরও যে ফুল বা ফলের উল্লেখ করা হয়েছে তার মধ্যে চামেলী, যুঁই, গোলাপ, টগর, চাঁপা, নীলোৎপল, বকুল, সজনে, বেল, স্থলপদ্ম, কেতকী উল্লেখযোগ্য। ফলের মধ্যে আম, গোলাপজাম, কামরাঙা, জামরুল, ডাব-এর ব্যবহার সবিশেষ লক্ষণীয়। চিত্রকল্পের ক্ষেত্রে পাখীর ব্যবহার নজরুলের কাব্যে প্রায়শঃই ঘটেছে। প্রধানতঃ বুলবুলি, কবুতর, মাছরাঙা, ডাহুক নজরুলের কবিতায় স্থান পেয়েছে নতুন তাৎপর্য নিয়ে। অবশ্য এর সঙ্গে কবি প্রেয়সীর চরণ, গাল, ভুরু, খোঁপা, চোখ, মুখ ও বক্ষের বর্ণনাতে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদানে সমর্থ হয়েছেন।

প্রকৃতি ও ঋতুর বর্ণনাবিষয়ক ক্ষেত্রে নজরুল অসংখ্য চিত্রমালার যে উপহার দিয়েছেন তার মধ্যে বসন্ত ঋতু ও শরতের প্রভাব অনস্বীকার্য। অবশ্য নজরুলের চিত্রকল্পে অতি পরিচিত লৌকিক শব্দ ও কথার ব্যবহার বর্ণনার ক্ষেত্রে নতুন রসের সন্ধান দান করেছে। ছায়ানট, সিন্ধু হিল্লোল ও চক্রবাকের কবিতাগুলির মধ্যে তার পরিচয় সুস্পষ্ট। বস্তুতঃ তাঁর কবিচিত্তের সুতীব্র সংরাগ নিসর্গের তুলনার মধ্যে সঞ্চালিত বলেই এর প্রকাশভঙ্গী এত জীবন্ত হয়ে উঠেছে। উপরন্তু উপমা ও রূপকের মাধ্যমে যে চিত্রকল্প প্রতিষ্ঠিত তার মধ্যে কবি যে মানবত্ব আরোপ করেছেন তার ফলেই সেগুলি কাব্যের মধ্যে এত সক্রিয় ও এত জীবন্ত। সমগ্র কবিতার ক্ষেত্রে এর ফলে নজরুলের সৃষ্টি লাভ করেছে বিশ্বস্ত ঋজুতা, দিব্যবোধ তথা গতি ও সংহতি। প্রধানতঃ এরই বিনিময়ে তাঁর সমগ্র ব্যঞ্জনায় মিশে আছে অনুষঙ্গ এবং অসংখ্য কুশলধন্য কবিত্ববোধ। নজরুলের যে কবিসত্তা বিদ্রোহী বলে পরিচিত তার হাতেই এইভাবে একের পর এক রূপকল্প সৃষ্টি হয়েছে। এই রসাভাব তাঁর মৌলিক বোধের পরিপূরক। যে কবিসত্তা বিদ্রোহী, সে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসাম্যের বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী, যা কবির মতো সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু কবির যে সত্তা প্রতীকীর সুচারুবোধে উদ্বেল, চিত্রকল্পের সার্থক প্রবর্তনায় যার উৎসাহ আন্তরিক তার রসবোধ কেবলমাত্র রসের জন্যেই গড়ে ওঠে না। যদিও, "কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা'ও চেতনার জিনিষ—শুদ্ধ কল্পনা ও একান্ত বুদ্ধির রস নয়।"*

সুতরাং, এদিক দিয়ে বিবেচনা করলে নজরুলের সমগ্র নিষ্ঠাকে তাঁর চেতনালব্ধ অভিজ্ঞতার ফসল বললে অত্যুক্তি হয় না। রূপক, প্রতীক ও চিত্রকল্প সেই আলোকে প্রদীপ্ত পরিণতির শ্রেষ্ঠ সোপানমাত্র।

* জীবনানন্দ দাশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

সাম্যবোধ : আন্তর্জাতিকতা : মানবপ্রেম : সমাজচিন্তা

Poetry is written in language. Language is a social product, the instrument whereby men communicate and persuade each other ; thus the study of poetry's sources cannot be separated from the study of society.*

—Christopher St. John Sprigg
(Christopher Caudewell)

একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যসমালোচক Christopher Caudewell-এর উপরোক্ত উক্তির অনেক আগেই গোর্কি শিল্পীর দায়িত্ব প্রসঙ্গে বলেছিলেন—

"শিল্পী হচ্ছেন তাঁর দেশের ও তাঁর শ্রেণীর মুখপাত্র। তিনি তাঁর স্বদেশ ও সমাজের যেন চক্ষু কর্ণ আর হৃদয় এক কথায়, তাঁর যুগের বাণী বা প্রতিধ্বনি। তিনি যথাসাধ্য সব কিছু জানবেন। অতীতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকবে যত বেশী ততই তিনি তাঁর কালের সর্বজনীন বিপ্লবী রূপ ও কর্তব্যের তীব্রতাকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। জনগণের ইতিহাস তাঁর জানা উচিত, শুধু উচিত বললেই হবে না, তাঁকে তা জানতেই হবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে জনগণের মনোভাব কি তাও তাঁকে বুঝতে হবে।"**

বিংশ শতাব্দীর সামাজিক পরিবর্তন কাব্যের সংজ্ঞার ক্ষেত্রেও মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন সূচনা করেছে। সামাজিক সমস্যাগুলি থেকে কবিরা এই সময় দূরে থাকতে উৎসাহী ছিলেন না। বিশেষ করে মানবিক সমস্যাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচিত নজরুল স্বাভাবিক নিয়মেই জীবনের মৌলিক সমস্যাগুলিকে কাব্যের উপাদান হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কৈশোরের দারিদ্র্যজনিত কষ্ট ও তার অভিজ্ঞতার কথা তিনি ভোলেননি। ফলে তাঁর কাব্যে সমাজচিন্তাপ্রসূত মানবপ্রেম গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। যে সব

* **Illusion and Reality—Christopher Caudwell.**

** বাংলা সাহিত্যে নজরুল—আজহারউদ্দিন খান।

সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী নজরুলকে মানসিক দিক থেকে উদ্বেল করে তুলেছিল তার উল্লেখ এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে কবি ৪৯নং বেঙ্গলী ব্যাটেলিয়ন ভেঙে যাবার পর যখন কলকাতায় ফিরে এলেন, তখন সাধারণের মনে রাসবিহারী বসু ও বাঘা যতীনের উজ্জ্বল দেশপ্রেমের স্মৃতি অম্লান হয়ে আছে। বাঘা যতীনের ঐতিহাসিক বালেশ্বর মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন (৯ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫), বিপ্লবীদের হাতে ভবানীপুরের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩০শে জুন ১৯১৬) ও রাসবিহারীর অস্ত্র আমদানী চেষ্টার ব্যর্থতা যুবমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৭-২৫ সালের মধ্যে অনেক বিপ্লবীর কারামুক্তি, দেশবন্ধুর অহিংস আন্দোলনে যোগ দেবার আহ্বান (১৯২১), গান্ধীজীর বরদৌলি অভিযানের পাশাপাশি সূর্য সেন (চট্টগ্রাম) ও হেমচন্দ্র ঘোষের (ঢাকা) নতুন বৈপ্লবিক কার্যসূচী যুবক নজরুলকে প্রভাবিত করল। গোপীনাথ সাহার টেগার্ট হত্যার চেষ্টা (১৯২৪), বিপ্লবীদের অকস্মাৎ কারাদণ্ড (১৯২৪ সালের বিশেষ অর্ডিনান্স বলে) এবং ১৯২৮-৩০ সালের কংগ্রেসের দুই ভিন্ন মতের লড়াই কবিকে সচকিত করে তুলল। স্কুল-জীবনের লাঞ্ছনা এবং বাস্তব জীবনের শাসন-শোষণ সেই সময় নজরুলের কাব্যজীবনের নতুন দিগন্তকে তাঁর সামনে উন্মোচিত করে। কংগ্রেসের এই সংঘাত সাধারণ স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের মধ্যেও অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছিল। নজরুলকেও এসব ঘটনা আকর্ষণ করল। পার্ক সার্কাসের সেই অধিবেশনে (১৯২৮) স্বরচিত গান পরিবেশন করলেন কবি। মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্রের জি. ও. সি পদ গ্রহণের পাশাপাশি নজরুলের সাংস্কৃতিক প্রচারসংস্থার ভার গ্রহণের ঘটনাটি রীতিমতো উল্লেখযোগ্য।* জনসাধারণের

* "It would show if the revolutionaries had really succeeded in converting the Congress leaders to their ideal of independence. The Congress Volunteer Corps for the session was organised by the revolutionaries as a semi-military body, perhaps to serve the same purpose as the Irish Republican Army did in Ireland in the twenties. Subhas Chandra Bose was the leader of the united revolutionaries and the G O.C of the Volunteer Corps. At Calcutta the older leaders under Mahatma Gandhi postponed, however, the confirmation of the Madras decision for Purna Swaraj by one year."—Gopal Halder. Studies on the Bengal Renaissance, edited by Atul Chandra Gupta. (The National Council of Education, Jadavpur, Bengal.)

মধ্যে স্বাধীনতার স্বপক্ষে উজ্জীবনী গানের প্রচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে চারণ দল গঠন করা হয়েছিল। নজরুল এই সব চারণ কবিদের গাইবার জন্যে তাঁদের উপযোগী গান লিখে দিয়েছিলেন।

সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রবাহের সুস্পষ্ট দুটি ধারা এই সময় নজরুলের নজরে পড়েছিল। প্রথমতঃ, একদিকে কংগ্রেসের প্রার্থিত স্বাধীনতার আন্দোলন যা নরমপন্থীদের বিশেষ করে প্রবীণদের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হচ্ছিল। অন্যদিকে ছিল 'Revolutionary Terrorism', যার প্রভাব গণমানসে তখনো তেমন বেঁধে উঠতে পারছিল না। যদিও বিক্ষিপ্তভাবে অনুষ্ঠিত সশস্ত্র বিপ্লবীদের কার্যকলাপ সে সময়ে ইংরেজ শাসকদের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তথাকথিত Partial Independence প্রস্তাবে দলের মধ্যে প্রবল মতানৈক্যের ঢেউ ওঠে। নজরুল ও সুভাষচন্দ্র ছিলেন ভিন্ন মতাবলম্বীদেরই মুখপাত্র। নজরুলের মতে—

> "স্বরাজ-টবাজ বুঝি না, কেননা ও কথাটার মানে এক এক মহারথী এক এক রকম করে থাকেন। ভারতবর্ষের এক পরমাণু অংশও বিদেশীর অধীন থাকবে না। ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা-রক্ষা, শাসনভার, সমস্ত থাকবে ভারতীয়ের হাতে। তাতে কোনো বিদেশীর মোড়লী করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত থাকবে না। যাঁরা এখন রাজা বা শাসক হয়ে এ দেশে মোড়লী করে দেশকে শ্মশান-ভূমিতে পরিণত করছেন, তাঁদের পাততাড়ি গুটিয়ে, বোঁচকা-পুটলি বেঁধে সাগর-পারে পাড়ি দিতে হবে। প্রার্থনা বা আবেদন-নিবেদন করলে তাঁরা শুনবেন না। তাঁদের অতটুকু সুবুদ্ধি হয়নি এখনো। আমাদেরো এই প্রার্থনা করার, ভিক্ষা করার কুবুদ্ধিটুকুকে দূর করতে হবে।
>
> পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খল মানা নিষেধের বিরুদ্ধে।"*

নজরুলের কাব্যদর্শন মূলতঃ গড়ে উঠেছে এই আপোষহীন প্রবণতাকে কেন্দ্র করেই। অবশ্য বিশ্বের স্বাধীনতাকামী দেশগুলির আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সমসাময়িক কবি বা লেখকেরা তাঁদের স্ব-স্ব ভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করে বিস্ময় সৃষ্টি করেছেন। আন্দোলনের প্রকৃতি অনুধাবন করে তাঁর রচনার মাধ্যমে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক পথের মূল্যায়ন

* ধূমকেতুর পথ (রুদ্রমঙ্গল)।

করতে দ্বিধা করেননি। আইরিশ ফ্রিডম্ মুভমেন্টস্-এর সময়ে বিখ্যাত Irish Ballad, রুশী বিপ্লবের পুরোধা মায়াকভস্কি, চীনের ঐতিহাসিক লঙ্ মার্চের সময়ে গাওয়া বিখ্যাত উজ্জীবনী গান, নাজিম হিকমতের কবিতা, বুলগেরিয়ার ভাপ্‌তসারভ, স্পেনের লরকা ও চিলির নেরুদার কবিতাগুলির ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্বের প্রগতিবাদী মানসের অশেষ শ্রদ্ধার বস্তু। এমন কি আমাদের দেশে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত রবীন্দ্রনাথের গান থেকে শুরু করে ক্ষুদিরাম ও মুকুন্দ দাসের রচনার পাশাপাশি দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ ও ইকবালের রচনাগুলি ঐতিহাসিক বিচারে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান। আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় আফ্রিকার কৃষ্ণকায় মানুষের ঐতিহাসিক আন্দোলনপ্রসূত কবিতা ও গান তাঁদের জীবনে আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। পল রোব্‌সনের বিখ্যাত সেই দুটি গান, Oh Freedom, freedom ! এবং Sometimes I feel like a motherless child-এর অনস্বীকার্য প্রভাবের কথা আজ কে না জানে! পরবর্তীকালে দুর্বার ভিয়েতনামের অমর মানুষ হো-চি-মিন ও চীনের মাও সে-তুঙ ও কু মো জোর পুরানো রচনাগুলির কথাও প্রসঙ্গত মনে পড়ে যায়। নজরুল উপরোক্ত দেশসমূহের অধিকাংশ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতির কথা জানতেন। উপরন্তু সুদূর প্রাচ্যের স্বাধীনতা আন্দোলন (কামাল পাশা ও আনোয়ার) সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। যুদ্ধশেষে করাচী থেকে কলকাতায় ফিরে এসে (১৯২০) সাম্যবাদী বন্ধুদের প্রভাবে তাঁর এই সব ধ্যানধারণার প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্কুল জীবনে বিপ্লবী নিবারণ ঘটকের প্রভাবের পর এই প্রথম নজরুলের বিপ্লবী সত্তার স্ফুরণ ঘটল। ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে অংশ গ্রহণের আগে ১৯২৬ সালে নজরুল বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদ গ্রহণ ও বন্ধু হেমন্ত সরকারের অনুরোধে কেন্দ্রীয় আইন সভার নির্বাচনে মুসলমান সংরক্ষিত আসনে প্রার্থী হয়ে পরাজয় বরণ (জামানত বাজেয়াপ্ত), ১৯২৪ সালে হুগলীতে গান্ধীর সঙ্গে পরিচয় ও 'চরকার গান' রচনা ছাড়াও ১৯২৫ সালে Indian National Congress-এর The Labour Swaraj Party of the Indian National Congress-এর প্রথম ইশ্‌তেহারে স্বাক্ষরদান, বসিরহাট উপনির্বাচনে (প্রার্থী কুতুবউদ্দিনের সমর্থনে) প্রচারকার্যে অংশগ্রহণ (১৯২৫), 'লাঙল' (১৯২৫) পত্রিকার প্রধান পরিচালনার ভার গ্রহণ প্রভৃতি ঘটনার মাধ্যমে কবির বাস্তব রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ হয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯২১ সালে ভারত-বর্ষে কমিউনিস্ট পার্টি গঠন প্রস্তাবের অন্যতম সভ্য মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের সঙ্গে

ঘনিষ্ঠতা, রুশ বিপ্লব স্মরণে সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীন বিজয় উৎসব পালন ও 'প্রলয়োল্লাস' কবিতা রচনা (১৯২১), চটকলের মজুরদের বস্তিতে গিয়ে কবিতা আবৃত্তি ও গান, 'নবযুগ' (১৯২০) কাগজে প্রবন্ধ লেখা, 'ধূমকেতু'র সম্পাদনা (১৯২২) ও 'আনন্দময়ীর আগমনে' লেখার ফলে এক বৎসরের কারাবরণ (১৯২২-২৩) প্রভৃতি ঘটনা তাঁর সমগ্র কাব্যভাবনার উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মানবপ্রেমিক নজরুলের যে আত্মপ্রকাশ তাঁর কাব্যের মাধ্যমে ঘটেছে তার মূলে ছিল কবির অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী, সামাজিক শাসন ও শোষণেব বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মানসিকতা, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত মানবতার স্বপক্ষে জয়গান এবং নির্যাতিত-নিপীড়িত মানবাত্মার শুভ উদ্‌বোধনের আকাঙ্ক্ষা। সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার বীভৎস রূপটি তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তাই তিনি চেয়েছিলেন সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সম্পূর্ণ অবসান। তাঁব বিশ্বাস ছিল সর্বহারা ও নিম্নসমাজের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষেরা একদিন নিশ্চয়ই জেগে উঠবে। বর্তমানকে মূলধন করে তাই তাঁব কাব্যেব জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।

নজরুলের কবিতায় যে সাম্যবোধেব প্রচার দেখতে পাওয়া যায় তা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতবাদের প্রতিনি - করেনি। তাঁর সাম্যবোধ গড়ে উঠেছে প্রধানত: মানবতাবোধপ্রসূত চিন্তাধাবা থেকে, যদিও প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে পৃথক এক মানবতাবোধের প্রভাব তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, সাধারণ মানুষের গণ-জাগরণের মধ্যে তাঁর বিশ্বস্ত ভাবনাকে তিনি আবিষ্কার করতে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর সাম্য বিষয়ক চিন্তাধারার মধ্যে কোনো সংস্কার বা দ্বিধার স্থান ছিল না। তাত্ত্বিক দর্শন তথা সংশয়ের প্রচ্ছন্নতাও তাঁর ভাবনায় সেদিক থেকে অনুপস্থিত। ফলে তাঁব বিদ্রোহ সমস্ত অন্যায়, অসাম্য ও ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। বস্তুত: তাঁর কবিজনোচিত মানসিকতা শোষণহীন, সুখী ও পরিপূর্ণ এক সমাজকল্পনার আদর্শে বিশ্বাসী ছিল বলে মোহান্ধতার পথে কখনোই তিনি অগ্রসর হননি। সামাজিক স্তরে শতাব্দীব্যাপী যে শোষণ চলেছে নজরুলের মতে সেই শোষণের শিকার জাতিহীন, বর্ণহীন কোটি কোটি মানুষের দল। সেই জন্যে পচা, গলা, ভগ্ন এই মেকী সমাজকে ধ্বংস করার আহ্বান তাঁর কবিতায় প্রবলভাবে সোচ্চারিত। সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর জাগ্রত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেই সঙ্গে চাষী ও মজুরের স্বাধিকার আন্দোলনের সংগ্রামকে সমর্থন করে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন। কবির সৃষ্টিধর্মী

প্রবণতা এবং আত্মসচেতনতার প্রভাবে কৃষক-শ্রমিকের জয়গানকে তিনি সমর্থন জানাতে কখনো দ্বিধা করেননি। তাই সমসাময়িক কবিদের মানসিকতা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গী অর্জিত কাব্যের আবেদনে তিনি সহজেই জনমানসের সাড়া পেয়েছিলেন। কোনো অমরত্ব বা প্রতিষ্ঠালাভের কামনা তাঁর মনে স্থান পায়নি। ফ্রান্সের পল এলুয়ার-এর মতো তিনিও বিশ্বাস করতেন যে, কবিরাই হচ্ছে নির্যাতিত, নিপীড়িত মানবতার শ্রেষ্ঠতম মুখপাত্র। সেই দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোথাও নজরুল তাই কাতরতা বোধ করেননি। চিরাচরিত বাঙালী মানসিকতার পরিচিত দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার হতে তিনি কখনোই প্রস্তুত ছিলেন না। এই ভিন্ন মানসিকতার শক্তিতে সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি জন-প্রিয়তার বিচারে অনেক বেশী এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল এবং পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কামিনী রায় প্রভৃতির কাব্যে যে জাতীয়তাবোধ প্রকাশিত তার মধ্যে মননশীলতা থাকলেও নজরুলের সুতীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠের ঝঙ্কার তাতে অনুপস্থিত ছিল। নজরুলের রচনায় সংসদীয় স্বরাজ লাভের বিরুদ্ধ-ঘোষণার জেহাদ ও আপোষধর্মী আন্দোলনের ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে কশাঘাতই অন্যান্যদের থেকে তাঁকে পৃথক করেছিল। সেদিক থেকে তাঁর রাজনৈতিক ধ্যানধারণায় তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের সেই পর্বের অন্যতম নিঃসঙ্গ এক পথিক। কিন্তু যেহেতু রবীন্দ্রনাথের মতো তাঁরও মানুষের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা তাই তিনি মানুষের জয়গানে মুখর হয়ে উঠতে কোনো ক্লান্তিবোধ করেননি। উপরন্তু দেশের রাজনৈতিক তথা অর্থনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ থাকার ফলে নজরুলের কাব্য কেবলমাত্র সৌখীন মজদুরি হয়ে দেখা দেয়নি। তাই কবিতা লেখার অপরাধে সর্বপ্রথম একমাত্র তাঁকেই এক বৎসরের জন্য কারাবরণ করতে হয়েছিল। কারাবাসের অভিজ্ঞতা একদিকে তাঁকে যেমন বাস্তবমুখী হতে সাহায্য করেছিল তেমনি এর ফলে সৃষ্টিস্রোতের সুতীব্র জোয়ার তাঁর কাব্যের ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সাহায্য করেছে। গণজাগরণের সঞ্জীবনী মন্ত্র কাব্যের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় সেদিন ইংরেজ শাসক তাঁর তিনটি কাব্যগ্রন্থ 'ভাঙার গান' (১৯২৪), 'বিষের বাঁশী' (১৯২৪) ও 'প্রলয়শিখা' (১৯৩০) বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হয়েছিল। যুবশক্তিকে দেশপ্রেমের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন নজরুল। ফলে তারুণ্যের জয়গান, নবীনের জন্মোৎসব ও

আন্তর্জাতিক সৌভ্রাত্র্য তাঁর কবিতার অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচিত। এই আন্তর্জাতিকতার পুরস্কার তাঁর কবিতায় নবদিগন্তের সূচনা। বাংলা কাব্যের সীমা পেরিয়ে নজরুল ব্যাপক পটভূমিকায় কবিতাতে বিষয়বস্তু সম্প্রসারণের কাজে হাত বাড়ালেন।* আর এরই ফলে জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোত-ধারাটির সঙ্গে অবহেলিত, নির্যাতিত সাধারণ মানুষের যোগাযোগ সাধিত হোলো। জাতীয় জীবনের পক্ষে এর প্রভাব হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সুতরাং নজরুলের কাব্য মূলতঃ রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, যদিও তাঁর কাব্যে সাম্যবাদী চিন্তা, মানবপ্রেম বা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে কাব্যের আবেদন দু-একটি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় কোথাও তেমন ব্যর্থ হয়নি। অনবদ্য সৃষ্টির নৈপুণ্য ও ঝঙ্কার কোথাও অনুপস্থিত নয়। একই সঙ্গে সংগ্রামী মানুষের কণ্ঠে গণবিপ্লবের আহ্বান প্রচারিত হল তাঁর কবিতার মধ্যে। আবিশ্ব বিপ্লবের আহ্বান বাংলা কবিতায় সেই সর্বপ্রথম নজরুলের কবিতায় পরিলক্ষিত হোলো। পূর্বে উল্লিখিত আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে কবির 'অন্তর ন্যাশন্যাল' সঙ্গীত রচনাটি একদিকে যেমন সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তিসংগীত হিসেবে পরিচিত তেমনি বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এটি নবদিগন্তের সূচক হিসেবেই বিবেচ্য।

সাম্যবাদী চিন্তাধারার অন্যতম ফসল তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ—'সাম্যবাদী' (১৯২৫) ও 'সর্বহারা' (১৯২৬)। বন্ধু আনওয়ার হোসেনকে লেখা পত্রে নজরুল লিখেছেন—

* "বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে নিয়ে ভারতীয় ভাবধারার বিভক্ত যে রূপটি দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যে একটি ধারা agnostic অর্থাৎ সংশয়বাদী, ঈশ্বর আছেন কি নেই তা নিয়ে তর্ক করে না, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই, মূল tendency (ঝোঁক বা প্রবণতা) হচ্ছে বস্তুজগৎ ও বাস্তব জগৎটাকে বিশ্বাস করার দিকে,—এই দিকেই তাঁর ঝোঁক বেশী। ফলে এর দৃষ্টিভঙ্গী মূলতঃ secular সাহিত্য-চিন্তায়, এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন শরৎচন্দ্র ও নজরুল। আর একটি ধারা হচ্ছে, যেটা ধর্মীয় ঐতিহ্যের সংগে মানবতাবাদের মূল্যবোধগুলিকে সংমিশ্রিত করতে চেয়েছে—এই ধারার প্রতিনিধিত্ব করেছেন মূলতঃ রবীন্দ্রনাথ।"—শিবদাস ঘোষ, (ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক আন্দোলন ও আমাদের কর্তব্য) মার্কসবাদ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন, পৃঃ ১০৮।

"আমি জানি না—লেখা প্রাণহীন হচ্ছে কিনা।...আমার লেখার উদ্দামতা হয়ত কমে আসছে—তার কারণ আমার সুরের পরিবর্তন হয়েছে। আপনি কি আমার 'সাম্যবাদী' পড়েছেন ?...আমি আমার মনের কুঞ্জে আমার বংশীবাদকের বিদায় পদধ্বনি আজও শুনতে পাইনি। তবে তার নবীনতার সুর শুনেছি। সেই সুরের আভাস আমার 'সাম্যবাদী'তে পাবেন।"

কবির এই নবীনতর সুর বলতে সাম্যের সুরকেই বোঝায়। তাছাড়া উপরে উল্লিখিত দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নামকরণের* মধ্যেও সাম্যবাদী চিন্তার বাস্তব প্রভাব অনুভূত হয়। এই দুই কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কার্ল মার্কসের দর্শনের মিল অত্যন্ত বেশী। যে আর্থিক শোষণকে উপলক্ষ করে মার্কস তাঁর Capital গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সেই শোষণের বিরুদ্ধে নজরুল রুখে দাঁড়িয়েছেন তাঁর উপরোক্ত কাব্যগ্রন্থের প্রতিটি পাতায়। 'সাম্যবাদী' গ্রন্থের এগারোটি কবিতার মধ্যে প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সোচ্চারিত। দেশ-কাল-পাত্রের ভেদাভেদকে অস্বীকার করে তিনি ধর্মীয় ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে সম্মিলিত ঐক্যের জয়গান গেয়েছেন। ধর্মের মোহান্ধতা ও শাস্ত্রের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত হোলো—

(১) তোমাতে রয়েছে সকল কেতাব সকল কালের জ্ঞান,
সকল শাস্ত্র খুঁজে পাবে সখা খুলে দেখ নিজ প্রাণ।

(সাম্যবাদী)

(২) শাস্ত্র না ঘেঁটে ডুব দাও সখা, সত্য-সিন্ধু-জলে।

(ঈশ্বর)

(৩) পূজিছে গ্রন্থ ভণ্ডের দল।—মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ,—গ্রন্থ আনেনি মানুষ কোনো।

(৪) তবু জগতের যত পবিত্র গ্রন্থ ভজনালয়
ঐ একখানি ক্ষুদ্র দেহের সম পবিত্র নয়।

(মানুষ)

মানবতাবাদে বিশ্বাসী কবির কণ্ঠে এই বিশ্বাসবোধই প্রকাশ পেয়েছে তাঁর অধিকাংশ রচনায়। কবি ভগবানের শক্তিতে আস্থাবান এবং সেই শক্তির উদ্‌বোধন ভগবানের সৃষ্ট মানবের মধ্যে আবিষ্কার করতে তিনি প্রত্যাশী।

* সর্বহারা—Proletariat.

এই শ্রেণীর কবিতায় মূল সুর শ্রেণীসচেতনতার আলোতেই বিবেচ্য। তৎকালীন পৃথিবীর সাম্যবাদী আন্দোলন তাঁকে গভীরভাবে উৎসাহিত করেছিল। বিশেষ করে সাম্যের সমর্থনে ও প্রেরণায় রচিত 'সর্বহারা' গ্রন্থের দশটি কবিতা, যেমন সর্বহারা, কৃষাণের গান, শ্রমিকের গান, ধীবরদের গান, ছাত্রদের গান ইত্যাদি কবিতায় মার্কসীয় চিন্তাধারার ঘনিষ্ঠ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একই ভাবধারার প্রকাশ আমরা তাঁর রচনা রাজা-প্রজা, সাম্য, কুলি-মজুর, মিথ্যাবাদী, সাম্যবাদী, ফরিয়াদ, আমার কৈফিয়ৎ প্রভৃতি রচনার মধ্যে পেয়েছি। বক্তব্যের তীব্রতা এবং স্পষ্টবাদিতার জন্যে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাম্যবাদী প্রচারের সঙ্গে সেগুলি একাকার হয়ে গেছে। যেমন—

(ক) রাজার প্রাসাদ উঠিছে প্রজার জমাট রক্ত-ইটে,
ডাকু ধনিকের কারখানা চলে নাশ করি কোটি ভিটে।
(চোর-ডাকাত : সাম্যবাদী)

(খ) আজ চারদিক হতে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
এ ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
(কৃষাণের গান : সর্বহারা)

(গ) যত শ্রমিক শুষে নিঙ্‌ড়ে প্রজা
রাজা-উজির মারছে মজা,
এবার জুজুর দল ঐ হুজুর দলে
দলবি রে আয় মজুর দল।
ধর হাতুড়ি, তোল্‌ কাঁধে শাবল॥
(শ্রমিকের গান : সর্বহারা)

(ঘ) আজ নিখিলের বেদনা আর্ত পীড়িতের মাখি খুন,
লালে লাল হয়ে উদিছে নবীন প্রভাতের নবারুণ।
(কুলি-মজুর : সাম্যবাদী)

শ্রেণী-সংগ্রামের মূল সুরটি প্রত্যক্ষ হয়ে এই সকল অংশে ধরা পড়েছে। সাম্যবাদের সংজ্ঞানুযায়ী ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সাম্রাজ্যবাদের সৃষ্টি হয়েছে শোষিত মানুষের শ্রম ও রক্তের বিনিময়ে। তাই নজরুল বিশ্বাস করতেন, 'ছোটদের সব চুরি করে আজ বড়রা হয়েছে বড়।' তাঁর সেদিনের বক্তব্যের যথার্থতা আজকের পৃথিবীতে সমপরিমাণে প্রযোজ্য। তিনি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন—

যারা যত বড় ডাকাত-দস্যু জোচ্চোর দাগাবাজ
তারা তত বড় সম্মানী গুণী জাতি-সঙ্ঘেতে আজ।*

কবির দূরদর্শিতার পরিচয় এইখানে সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে। পাশাপাশি সমাজচিন্তার মৌলিক দিগ্‌দর্শন হয়ে নজরুলের কবিতা বাংলা কাব্যের রূপান্তর ঘটিয়েছে। রাজনৈতিক ভণ্ডামীর রূপটি তাঁর সমাজচিন্তার মধ্যে ধরা পড়ার ফলে তিনি কঠিন ও তীব্রভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপের মাধ্যমে সেগুলির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সাধারণ মানুষকে স্বাধীনতার নাম করে যে প্রতারণা এক সময় করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী গর্জে উঠেছিল। তিনি বিদ্রূপের সুরে বলেছিলেন—

রয়ে নাক ম্যালেরিয়া মহামারী,
স্বরাজ আসিছে চড়ে জুড়ি-গাড়ী,
চাঁদা চাই, তারা ক্ষুধার অন্ন এনে দেয়, কাঁদে ছেলেমেয়ে।
মাতা কয়, ওরে চুপ হতভাগা, স্বরাজ আসে যে, দেখ চেয়ে।

স্বরাজ সম্পর্কীয় সমকালীন অতিশয়োক্তির বিরুদ্ধে কবির প্রতিবাদ এই অংশে সুস্পষ্ট। তাঁর বিশ্বাস,

ক্ষুধাতুর শিশু চায়না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত একটু নুন।
বেলা বয়ে যায়, খায়নিক বাছা, কচি পেটে তার জ্বলে আগুন।
কেঁদে ছুটে আসি পাগলের প্রায়,
স্বরাজের নেশা কোথা ছুটে যায়।

... ...

আমরা ত জানি, স্বরাজ আনিতে পোড়া বার্তাকু এনেছি খাস।
কত শত কোটি ক্ষুধিত শিশুর ক্ষুধা নিঙাড়িয়া কাড়িয়া গ্রাস
এল কোটি টাকা, এল না স্বরাজ।
টাকা দিতে নারে ভুখারি সমাজ।

(আমার কৈফিয়ৎ : সর্বহারা)

প্রথাগত আন্দোলনের স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞাত থাকায় এর প্রতি কবির বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তাঁর কণ্ঠে ছিল উদাত্ত আহ্বান :

* কার্ল মার্কস-এর মতে, 'মূলধনের যখন আবির্ভাব হয়, তখন তার আপাদমস্তক, প্রতি লোমকূপ থেকে রক্ত আর ক্লেদ ঝরতে থাকে।'

নির্যাতিতে জাতি নাই জানি মোরা মজলুম ভাই
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই।
একা স্বরে আর বকিতে দিব না ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি
এই ভেদজ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটি।
(ঈদের চাঁদ)

এই প্রবণতাব মধ্যে সাম্যবাদী ধ্যানধারণার যোগাযোগ অত্যন্ত প্রবল।* এছাড়া নজরুলের সমাজবিষয়ক চিন্তার মধ্যে শেলী, গোর্কি ও হুইটম্যানের প্রভাব অনস্বীকার্য। মানবপ্রগতির প্রশ্নে যোহান বোয়ার ও বেনাভ্যাঁর এবং নীতিবোধের প্রশ্নে নজরুলের সঙ্গে প্রুধুঁব প্রচুর মিল আছে। প্রচলিত নৈতিকতার কোনো মূল্য তাঁর কাছে ছিল না। 'বারাঙ্গনা' কবিতায় তাঁর এই মানসিকতার প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবির মানবপ্রেম দর্শনেব মূলে কাজ করেছে তাঁব অন্তঃস্থ সুতীব্র জীবনাসক্তি। তাই সমস্ত প্রকার ধর্মীয় সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে তাঁর কণ্ঠ কাব্যের মাধ্যমে সরব হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে যা ধর্মদ্রোহিতা বলে মনে হয় তা মানবপ্রেমিক কবির জীবনাসক্তির (attachmen ১ life) পরিচায়ক। কবির মানবপ্রেমের ভিত্তি ছিল সাম্যবাদ ও গণতন্ত্র। এরই জন্যে কবির উদারতার সঙ্গে প্রচলিত ধর্মীয় রক্ষাকর্তাদের বিরোধ বা দ্বন্দ্ব অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা সে সময় আমাদের সামাজিক অনুশাসনকে গ্রাস করে রাখার ফলে কবির উদার মানবতাবোধ ধর্মীয় প্রধানদের মনঃপূত হয়নি। কোনোরকম যুক্তিবাদকে আশ্রয় না নিয়েই নজরুলকে 'যবন' বা 'কাফের' ইত্যাদি আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের পর থেকে ভারতবর্ষের সমাজজীবনেও ইয়োরোপের জাগ্রত জনমানসের প্রভাব এসে পড়ে। ফলে বর্তমানকে নিয়ে মানুষের যুক্তিবাদী মনন সামাজিক স্তরে

* কমিউনিস্টদের সম্পর্কে কার্ল মার্কস্ লিখেছেন,

"They openly declare their ends can be attained only by the forcible overthrow of all existing social conditions. Let the ruling class tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win." (Communists Manifesto.)

নব মূল্যায়নের প্রয়াস পায়। লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁর কাব্যে ধর্মকে ত্যাগ করার প্রচেষ্টা প্রায় অনুপস্থিত। কবির বিরোধ প্রচলিত অমানবিক মূল্যবোধ তথা সনাতনী ধর্মীয় মোহান্ধতাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। বিপরীতপক্ষে, নজরুল এ দেশের সামাজিক জীবনে ধর্মের দুরন্ত প্রভাব সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁর বিবেচনায় শতাব্দীর এই সংস্কারবোধের সঙ্গে বিপ্লবী প্রয়াসের বিরোধ অনিবার্য। তাই কবি মোহান্ধ মানুষের চিরাচরিত মূল্যবোধকে কাব্যের ক্ষেত্রে সরাসরি অস্বীকার করার প্রবণতা থেকে বিরত ছিলেন। পরিবর্তে তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্য ছিল ধর্মের উদার ব্যাখ্যার মাধ্যমে যুক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করা। ধর্ম ও যুক্তির সমন্বয়ের ফলে মানুষের মন যে স্বভাবতঃই আবেগের স্রোতধারা থেকে সরে এসে মুক্তির পটভূমিতে দাঁড়াবার সুযোগ পাবে কবি তা জানতেন। এইজন্যেই তিনি বৈপ্লবিক ভাবনাকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের আলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। অর্থাৎ ধর্মীয় প্রেরণাকে হিন্দু-মুসলমানের সংহতি বিষয়ক আধুনিকধর্মী সমাজ-সচেতনতায় রূপান্তরিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এই সচেতনতা থেকেই জন্ম নেয় কবির বৈপ্লবিক মনন। প্রচলিত ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে যে সব সম্ভাব্য চরিত্র বা পরিণতি সাধারণ মানুষের কাছে আদর্শ হিসেবে গ্রাহ্য সেগুলিকে তিনি অক্লেশে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কোনো বাধাই এ ক্ষেত্রে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারেনি। তাই হজরত মোহাম্মদের মধ্যে সাম্যের প্রতীক নতুন করে আবিষ্কার করার মধ্যে কবির ছিল অন্তহীন উৎসাহ। একই বিশ্বাসবোধকে কেন্দ্র করে কবি খলিফা ওমর অথবা শ্রীকৃষ্ণ ও খালেদের চরিত্র চিত্রণে অগ্রসর হয়েছিলেন। এদের চরিত্রের মধ্যে কবি সাম্য, মৈত্রী ও মানবতার প্রতীকীকরণ ঘটিয়েছেন। সম্ভবতঃ এরই ফলে তাঁর কাব্যে এত সুচারুভাবে ঐতিহ্য ও পুরাণের আধুনিক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে। বিপ্লবী ভাবনার প্রকাশ ক্রমশঃ ঐতিহ্যের বিশ্বাসবোধকে নির্ভর করে দান করেছে কবির একান্ত নিজস্ব সুতীক্ষ্ণ ব্যঞ্জনা।

কবির ধ্যানধারণা বা প্রতীতির সঙ্গে সাম্যবাদী ধ্যানধারণার মৌলিক পার্থক্যটুকু স্মর্তব্য। সাম্যবাদী দর্শনে ধর্মকে প্রগতিবিরোধী হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। ধর্ম বলতে প্রচলিত ধর্মীয় বিধিনিষেধ তথা আচারের নির্দেশাদিকেই মূলতঃ বোঝানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের কাছে ধর্মের অনুভূতি আত্মশুদ্ধির মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সেগুলোকে ঘিরে রয়েছে অসংখ্য সংস্কার। এবং সাধারণ মানুষ ধর্মের আকর্ষণে অধিকাংশ স্থলে পাপ্ত,

পুরোহিত ও মৌলভীর প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। যদিও অভিজ্ঞার বিনিময়ে বোঝা যায় যে, সাধারণ স্তরে ভালোমন্দ মিশ্রিত মানুষের জীবনে ধর্মের প্রভাব একান্ত মানসিক নির্ভরশীলতাস্বরূপ দেখা দেয়। কিন্তু কুসংস্কারের জগদ্দল পাথর ধর্মের ক্ষেত্রে এর মৌলিক বোধ ও মূল্যায়নের পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। ফলে ধর্ম সেক্ষেত্রে হয়ে ওঠে সুবিধাবাদী শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার। সাম্যবাদীরা একে সেই আশঙ্কায় পুরোপুরি বর্জন করার পক্ষপাতী। কিন্তু নজরুল ধর্মকে অস্বীকার করতে চাননি। ধর্মের নৈতিক শিক্ষাকে সম্পদ বলে তিনি গ্রহণ করেছেন। ধর্মের মৌলিক উপাদানসমূহকে নতুন এবং প্রকৃত ব্যাখ্যার আলোকে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি গণ-মানসকে জাগ্রত কবতে চেয়েছিলেন। নজরুলের কাব্যে মানবতা এর ভেতর দিয়ে ফিরে পেয়েছে নতুন এক বোধ বা দিগদর্শন (dimension)। 'প্রলয় শিখা' কবিতায় কবির সেই কণ্ঠ সরব হয়ে ধরা পড়েছে। তাঁর মতে—

কাটায়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা
ধ্বংস করেছি ধর্মযাজকী পেশা।—
ভাঙি মন্দির, ভাঙি মসজিদ্,
ভাঙিয়া গির্জা গাহি সঙ্গীত,
এক মানবের একই রক্ত-নেশা।

বিশ্ব মানবতার জয়গান এইভাবেই তাঁর কাব্যের মৌলিক উপাদান হয়ে উঠেছে। সেদিক থেকে তাঁর ভাবনার পুরোধা সক্রেটিস ও টমাস পেইনের মানবতাবোধ প্রসূত চিন্তাধারার নৈকট্যও সেই সঙ্গে অনুভব করা যায়। অর্থাৎ সাম্যবাদী ধ্যানধারণার প্রেক্ষাপটে বিশ্ব মানবতাবোধের উদ্‌বোধন করতে চেয়েছেন কবি। যদিও এই কাব্যিক দর্শন পরিণতিতে মার্কসীয় জীবনদর্শন বা অন্য কোনো বিশেষ মতবাদের যথার্থ প্রতিরূপ হয়ে ওঠেনি। সুতরাং তাঁর কাব্যদর্শন মানব বিষয়ক সুস্থ কল্পনা ও প্রগতিভাবনার সংরাগ হিসেবেই বিবেচ্য। হয়তো একেই বলা যেতে পারে ইতিহাস-অনুসৃত এক ধারা, যাকে পরিভাষায় কাব্যের দ্বান্দ্বিক প্রকাশ বলা হয়ে থাকে। এই অনিবার্যতার প্রস্তুতি সমসাময়িক আবর্তের মধ্যেই অনুপ্রাণিত। সমসাময়িকতার সেই বোধ বা অনুভূতিকে একদা যেমন এলিয়ট সাহেব* গ্রহণ করেছেন তাঁর সুতীব্র বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী প্রত্যয়ে, তেমনি নজরুলের কাব্যের মানবতাবোধও সমসাময়িক সমস্ত প্রতিকূলতাকে অতিক্রম

* T. S. Eliot.

করেছে কেবলমাত্র তাঁর সারল্য মিশ্রিত ঐ মানবপ্রেম ও প্রগতির বিনিময়ে। এই বিশ্বাসবোধ নিঃসন্দেহে মিশে গেছে তাঁর অভিজ্ঞতার দীপ্তলোকে। কেননা আন্তরিক উপলব্ধি ব্যতীত এই বিশ্বাসবোধ অসম্ভব। যদিও নজরুলকে এই উপলব্ধির অভাবজনিত দুষ্টতার জন্য অনেকেই এক সময় অভিযুক্ত করেছিলেন, কিন্তু স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, উপলব্ধি ব্যতিরেকে কাব্যের সংহতি কোনো ক্ষেত্রেই যথার্থ প্রকাশ পায় না। এই জন্যে কবির উপলব্ধিজাত ন্যায়বোধ প্রত্যাশিত আবেগের ভেতর দিয়েই কাব্যিক রূপ নেয়। ফলে এই অভিযোগ কেবলমাত্র অনুরূপ বিবেচনায় পরিত্যাজ্য। এ ছাড়া উপলব্ধির তীব্রতা অথবা গভীরাত্মক কোনো বোধ কবির কাব্যে কতখানি ফুটে উঠেছে সেটা কবিতার প্রকৃতি বা বিষয়বস্তুর উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। সব রচনাই যেমন গভীরাত্মক অনুভূতির কোনো পরিচায়ক হতে পাবে না তেমনি সামগ্রিকভাবে কবির উপলব্ধির ক্ষেত্রে শূন্যতা কল্পনা করাও একান্তই কষ্টকল্পিত প্রয়াসমাত্র।

আন্তর্জাতিকতা বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। সামাজিক স্তরে যে বোধ পরস্পরকে মানব সমাজে নির্ভরশীল করে তোলে, বৃহত্তর পটভূমিকায় তাকেই আন্তর্জাতিকতাবোধের ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে মানুষের ন্যায়-নীতিবোধ সংস্কার ও মানব প্রগতিবিষয়ক কল্পনা প্রধানতঃ আন্তর্জাতিক পটভূমিকা পর্যন্ত বিস্তৃত হবার সুযোগ পেয়েছে। আন্তর্জাতিকতা সাম্যবাদের অন্যতম শর্ত। বিংশ শতকে সাম্যবাদের দ্রুত প্রসার ও পরিচিতির মূলে কাজ করেছে এই আন্তর্জাতিকতাবোধ। প্রকৃতপক্ষে, পৃথিবীর সামগ্রিক ইতিহাস মূলতঃ শাসক ও শোষিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস। সুতরাং, দেশ, জাতি ও পাত্র নির্বিশেষে ইতিহাসের গতিপথের মূল ধারাটি একে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে আমরা যাকে বলি যুক্তির পর্ব বা age of reason তার মধ্যে এই বোধের বীজ সুপ্ত ছিল। তারপর ক্রমশঃ যুক্তিবাদী মননের প্রসার ও ব্যাপ্তির ফলে পরস্পরের এই সাযুজ্য ও অভিন্নতাবোধ দ্রুত পরিচিতি লাভ করেছে।

নজরুলের কাব্যে স্বাভাবিক নিয়মেই এই আন্তর্জাতিকতার প্রভাব বিস্তারলাভ করেছে। তিনি সমগ্র মানবজাতির ঐক্য ও সংহতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। সামাজিক শোষণমুক্ত এক কল্পিত সমাজে তিনি আন্তর্জাতিক ভাব বিনিময়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের শোষিত মানুষের অত্যাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে তাঁর সুদৃঢ় প্রতিবাদ অভিন্ন আন্তর্জাতিকতার পরিচয় দান করে। এ ছাড়া সমগ্র মানবজাতির প্রতি কবির শ্রদ্ধা ও অনুরাগ

তাঁর উদার মানবতাবোধ ও দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। তাই কবি একদিকে যেমন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে রাখীবন্ধনের কাজটুকু সম্পন্ন করেছিলেন, অপরদিকে কাব্যিক দর্শনকে আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় স্থান দিয়ে বিশ্ব মানবের আর্তি ও বেদনাকেই কবি প্রকাশ করেছিলেন। কবির আহ্বান—

ধর্ম জাতির নাম লয়ে এরা বিষাক্ত করে দেশ,
এরা বিষাক্ত সাপ, ইহাদেরে মেরে কর সব শেষ।

(গোঁড়ামি ধর্ম নয় : শেষ সওগাত)

অর্থাৎ সামগ্রিক জীবনে কোনো গোঁড়ামি বা ভেদাভেদ কবির অভিপ্রেত নয়। সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকতাবোধ নিপীড়িত মানবসমাজকে পরস্পর আবিষ্কার করার কাজে সাহায্য করবে। তাঁর কাব্য এই অনুভূতির জয়গানে মুখরিত। রবীন্দ্রনাথ এক বৃহৎ পৃথিবীর কল্পনা করেছেন। কিন্তু তাঁর কাব্যে পৃথিবীর বৃহৎ পটভূমিকায় আত্মশক্তির উদ্বোধন প্রাধান্য পেয়েছে। অপরপক্ষে, নজরুলের কবিতায় পৃথিবীর শ্রমজীবী (toiling masses) মানুষের ঐক্য ও সম্প্রীতি আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় রূপায়িত করার প্রত্যাশা প্রদীপ্ত হওয়ার ফলে কবি লাভ করেছেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সার্থকতা। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন :

যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দনরোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না,
অত্যাচারীর খড়্গ কৃপাণ ভীম রণ-ভূমে রণিবে না—
বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত
আমি সেইদিন হব শান্ত।

(বিদ্রোহী : অগ্নিবীণা)

তাঁর ভাবনার এই আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাধান্য ও পরিচয় তাঁর কবিতায় সুস্পষ্ট। কবির কবিতায় 'আমিই' পৃথিবীর নির্যাতিত, নিপীড়িত সত্তার প্রতিভূ মাত্র। এদিক থেকে কবির কণ্ঠস্বর সমগ্র বিশ্বমানবতার প্রতিনিধিত্ব করার সম্মান অর্জন করেছে।

নজরুলের কবিতা পাঠকের সামনে বিস্তৃত পটভূমিকায় মানবজাতির মৌলিক সমস্যা তথা অসাম্য ও শোষণের প্রতি দৃষ্টিপাত ঘটাতে সক্ষম হয়েছে মূলতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যায়ে এক ও অভিন্ন শোষণ ব্যবস্থা দেশ-কাল নির্বিশেষে একই পদ্ধতি অনুসরণ করার ফলে চরিত্রগত দিক থেকে তার কোনো পার্থক্য পরিলক্ষিত হবার নয়। দ্বিতীয়তঃ, শোষিত মানুষের ভাষা ও উপলব্ধি প্রতিকারের ক্ষেত্রে একই প্রতিবাদী ভাষায় রুখে দাঁড়াতে অভ্যস্ত। তাই 'প্রলয়োল্লাস' কবিতার মধ্যে কবি জনগণের

বৈপ্লবিক সাফল্য এ দেশের শোষিত মানুষের চিত্তে ঢেউ তুলেছে। আবার সুদূর প্রাচ্যের কামাল পাশার বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম তাঁর কবিতায় নতুন তাৎপর্যের সূচক হিসেবে চিহ্নিত। এ ছাড়া কালো মানুষের স্বাধীনতাবোধ কেবলমাত্র মানবিক কারণেই কবির কাব্যে আদর্শ হিসেবে ধরা দেয়। রবীন্দ্রনাথের 'দেশে দেশে আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া'র বাসনা নজরুলের কাব্যে অত্যাচারিত মানুষের সৌভ্রাত্র্যসূচক বন্ধনের মধ্যেই প্রকাশিত হযেছিল। কবির এই আন্তর্জাতিকতা-বোধ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন কবি বলেন—

তোমার দেওয়া এ বিপুল পৃথ্বী সকলে করিব ভোগ,
এই পৃথিবীর নাড়ী সাথে আছে স্বজন-দিনেব যোগ।

(ফরিযাদ : সর্বহারা)

লক্ষণীয়, কবির ভাবনায় আবিশ্ব মানবজাতিব কল্পনা সুস্পষ্ট আভাষিত। তিনি সমগ্র মানবজাতিব অধিকাবের কথা উল্লেখ করে পৃথিবীর সমগ্র জাগ্রত মানসের কাছে আবেদন জানিযেছেন।

প্রসঙ্গত সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পটভূমিকাটুকু আলোচনা বা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তিরিশের দশকে বিশ্বব্যাপী শ্রমিক-মজুর শ্রেণীর সৌভ্রাতৃত্বের প্রভাব ক্রমশঃ আন্তর্জাতিকতা-সমৃদ্ধ মানসিকতাকে সুদৃঢ় করতে সহায়তা করেছিল। সর্বহারা শ্রেণীর বিপ্লবের পরিপ্রেক্ষিতে সোবিয়েত দেশের মানুষ তিরিশেব দশকে গড়ে তুলেছিল দুর্ভেদ্য ঐতিহাসিক প্রতিরোধ। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী মনোভাব দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার পশ্চাতে সেদিন কাজ করেছে পৃথিবীর সব শান্তিবাদী মানুষ। মানসিক তথা চিন্তাভাবনার নৈকট্যের বিনিময়ে সাধারণ মানুষ সহজেই সেদিন অনুভব করেছিল মানব-প্রগতির আকাঙ্ক্ষিত ভিন্ন একটি পরিপ্রেক্ষিত। আন্তর্জাতিকতা সেই পরিপ্রেক্ষিতের নবতর সূচনা। অর্থনীতির ভঙ্গুর পরিণতি মানবিক মূল্যবোধ ও জীবনের ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি করেছিল আন্তর্জাতিকতা সেখানে বয়ে নিয়ে এল নবলব্ধ চেতনায় উদ্ভাসিত নৈকট্যের স্নিগ্ধ মানবিক উপলব্ধি। তাই ইয়োরোপের সমসাময়িক কবি, শিল্পী ও লেখকের কাছে আন্তর্জাতিকতার গুরুত্ব স্বীকৃতি পেয়েছিল পরম আত্মবিশ্বাসে। ঝোড়ো সময়ের মুখে আন্তর্জাতিকতা নিঃসন্দেহে নিশানার মত কাজ করেছিল।

নজরুল এই স্রোত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেননি। তাছাড়া জার্মানীতে হিটলারের অবাধ তাণ্ডব, উগ্র জাতীয়তাবাদের উল্লাস ও উদ্দামতা, মুসোলিনীর মদমত্ততা ও গণতন্ত্রের সমাধি সারা ইয়োরোপের মাটিকে কাঁপিয়ে তুলেছিল। ফলে নজরুল রাজনীতিগতভাবে আন্তর্জাতিকতার প্রতি

ঝুঁকে ও তাঁর কাব্যে আন্তর্জাতিকতার সমর্থন করে পাঠকমনে রীতিমতো সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। উপরন্তু নজরুলের জীবনে রাজনীতিগত কারণ ও প্রগতি-পন্থী ধ্যানধারণার দরুণ আন্তর্জাতিকতা তাঁর কাব্যে গৃহীত ও সমাদৃত।

অবশ্য নজরুলের রচনায় এই আন্তর্জাতিকতাবোধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। আন্তর্জাতিক ভাবধারার সঙ্গে কবির পরিচয় ঘটে সৈন্যবাহিনীতে থাকার সময় থেকেই। কেননা গোপন সুড়ঙ্গপথে কবি ব্যারাকের মধ্যেও নিষিদ্ধ রাজনৈতিক গ্রন্থ ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই সময়ই অনুরূপ-ভাবে কলকাতা থেকে গোপনে পাঠানো রুশ বিপ্লব সম্বন্ধীয় কাগজপত্র ও সিডিশন কমিটির (রাওলাট) রিপোর্ট তাঁর হাতে পৌঁছেছিল। সৈন্যবাহিনীর ব্যারাকে নিজের ঘরের সামনে অক্টোবর বিপ্লব উপলক্ষে প্রবন্ধ পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্যে তাঁর আন্তর্জাতিক যোগসূত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। 'লালফৌজের' দেশপ্রেম ও রুশ বিপ্লব সম্পর্কে আলোচনার ফলশ্রুতি 'ব্যথার দান' পুস্তকে পরোক্ষভাবে এর উল্লেখে এবং 'প্রলয়োল্লাস' কবিতায় বিপ্লবের জয়গানে। প্রকৃতপক্ষে, সেই থেকেই নজরুল আন্তর্জাতিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যে আন্তর্জাতিকতা সেইজন্যই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। গদ্য রচনায় এর পরিধি আরও বিস্তৃত। তাছাড়া 'ব্যথার দান' নায়কের লালফৌজে যোগদানের ঘটনা গল্পে বর্ণিত হলেও প্রকৃতপক্ষে রুশ বিপ্লবের স্বার্থে সেই ফৌজে ভারতীয়দের যোগদান ও আত্মত্যাগের ঐতিহাসিক প্রমাণ ও সম্মতি মেলে In common they fought* নামক পুস্তকে। এইভাবে বাস্তব জীবনে যে আন্তর্জাতিকতা কবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল তার প্রকাশ তাঁর কাব্যদর্শনের মধ্যেও পরবর্তীকালে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। এছাড়া নজরুলই সর্বপ্রথম বাংলা কবিতায় প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিকতার প্রশস্তি গেয়েছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল স্পষ্ট। কোনো রহস্যের ধোঁয়ায় কাব্যকে তিনি কোনোদিন আচ্ছন্ন করতে চাননি। ফলে তাঁর বিশ্বাসবোধের ভিত্তিস্বরূপ যে আন্তর্জাতিকতা তাকেই তিনি বক্তব্যের মাধ্যমে নির্দ্বিধায় প্রকাশ করেছেন। এই তেজোদীপ্ত ঋজুতার গুণেই তাঁর কবিতা অর্জন করেছে কাব্যের দুর্লভ পৌরুষ। আন্তর্জাতিকতা এই পৌরুষ প্রেরণারই কেন্দ্রভূমি।

*** In common they fought.—Published by Foreign Languages Publishing House, Moscow, 1957.**

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গীতিধর্মী কবিতা : ইসলামী রচনা ও শ্যামাসঙ্গীত

গীতিকবিতার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সঙ্গীতময়তাই কবিতার প্রাণ। কাব্যধর্ম যেমন স্বাভাবিক অর্থে শব্দ, ছন্দ ও বিন্যাসের গুণে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে তেমনি গীতিরসাত্মক স্নিগ্ধতার বিনিময়ে কাব্য অর্জন করে অতিরিক্ত কাব্যকলার সঙ্গীত-ধর্মী সুষমা। সঙ্গীতময়তা কাব্যের রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে তাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ একটি উপাদান।

সার্থক গীতিকবিতা পরিণতিতে সার্থক সঙ্গীত সম্ভাবনা নিয়ে রচিত হয়ে থাকে।* রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমস্ত গীতিকবিতাই সঙ্গীতধর্মী মর্যাদায় পরিপূর্ণ। অনুরূপভাবে নজরুলের রচনারীতির দ্বিতীয় পর্বে যে অজস্র গীতিকবিতার সৃষ্টি হয়েছে তা নজরুলের কাব্যজগতে ভিন্ন একটি অধ্যায়ের সূচনা করেছে বলা যেতে পারে। লক্ষণীয় যে গীতিকবিতার অস্বাভাবিক সাফল্যের পর থেকেই নজরুল ক্রমশঃ সঙ্গীতের রাজ্যে অধিকতর মনোনিবেশ করেছিলেন। একদা তিনি নিজেই বলেছিলেন যে তাঁর কবিতা লোকে হয়তো ভুলেও যেতে পারে কিন্তু তাঁর গান লোকে কখনো ভুলবে না। তাঁর নিজের বিশ্বাস, গানের ক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি দিয়ে যেতে পেরেছেন।**

যে সমস্ত গীতিকবিতা নজরুল রচনা করেছিলেন সেগুলি সাঙ্গীতিক বিচারে নিম্নলিখিতভাবে বিভক্ত :

দেশাত্মবোধক, খেয়াল, ঠুংরী, গজল, হাসির গান, শ্যামাসঙ্গীত, ইসলামী

* ..."a musical poem is a poem which has a musical pattern of sound and musical pattern of the secondary meanings of the words which compose it, and that these two patterns are indisoluble and one. And if you object that it is only the pure sound, apart from the sense, to which the adjective musical can be rightly applied, I can only reaffirm my previous assertion that the sound of a poem is as much an abstraction from the poem is the sense...." The Music of Poetry : T. S. Eliot. P.57 (Selected Prose).

** নজরুল গীতি : কাজী মোতাহার হোসেন।

গান, বাউল, ভাটিয়ালী, ধ্রুপদ, কীর্তন, মর্সিয়া, মুর্শিদী, ভাওয়াইয়া, মারফতী, ঝুমুর ও বিদেশী সুরাশ্রিত গান।

এছাড়া নাটক ও ছায়াছবির জন্যে বিভিন্ন স্বাদের কিছু গানও তিনি রচনা করেছিলেন। তাঁর গীতিধর্মী কবিতার মধ্যে সুর ও ছন্দের এই অপূর্ব সংমিশ্রণের মূলে রয়েছে কবির রাগ-রাগিণীসুলভ অভিজ্ঞান। তিনি প্রথমে শিয়ারশোল স্কুলের সহকারী শিক্ষক সতীশচন্দ্র কাঞ্জিলাল ও পরে মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেব ও গ্রামাফোন কোম্পানীতে এসে ওস্তাদ জমীরুদ্দীন খাঁর কাছে সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন। ফলে কবি তখন রাগ-রাগিণীর মৌলিক সূত্রগুলি ব্যাপকভাবে আয়ত্ত করার সুযোগ পান। পরে গীতিধর্মী রচনার মধ্যে সেইসব বিচিত্র লুপ্ত রাগ-রাগিণীর চর্চা ও গবেষণায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। এবং বলা বাহুল্য, এ কাজে অর্থাৎ রাগ-রাগিণীর চর্চায় ও গবেষণায় তিনি আশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছেন।* এ প্রসঙ্গে নিজেই তাঁর ভাষণে বলেছিলেন—

> "ওস্তাদেরা কেউ গানের বি.এ. কেউ বা এম.এ. পাশ। আমি হয়ত ম্যাট্রিক পাশ হলেও হতে পারি। কিন্তু এমন কতকগুলো জিনিব জানি যা এম.এ. পাশ বা ডক্টর উপাধিধারীর যোগ্য।"**

নজরুলের এই উক্তি আপাতদৃষ্টিতে বাহুল্য মনে হলেও সত্যের বিচারে অতিরঞ্জিত নয়। তিনি তাঁর কাব্যপ্রতিভার বিনিময়ে অতি সহজেই সার্থক গীতিকাব্যের দুর্লভ সম্মান লাভ করেছিলেন। উপরন্তু সুরকার হিসেবে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত ও অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তার প্রভাবে তিনি গীতিধর্মী কবিতা রচনা ও পরবর্তী স্তরে সঙ্গীতের সার্থক রূপায়ণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। স্বয়ং গীতিকার ও সুরকার হবার ফলে এবং সর্বোপরি গায়ক বলে নজরুল অতি সহজেই সমস্ত ব্যাপারটাকে আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছেন। এইজন্যেই বাংলা গানের ক্ষেত্রে তাঁর স্থান রবীন্দ্রনাথের ঠিক পরেই।

স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, গীতিকবিতায় সার্থক চয়ন ও সুরের যথার্থ মিশ্রণ ব্যতীত কোনো প্রকার সাফল্যই সম্ভব নয়। প্রথমে সেই দিক বিবেচনা করে

---

* "সাহিত্যে দান আমার কতটুকু জানা নেই, তবে এইটুকু মনে আছে সঙ্গীতে আমি কিছু দিতে পেরেছি। সঙ্গীতে যা দিয়েছি সে সম্বন্ধে আজ কোন আলোচনা না হলেও ভবিষ্যতে যখন আলোচনা হবে, ইতিহাস লেখা হবে, তখন আমার কথা সবাই মনে করবেন—এ বিশ্বাস আমার আছে।"—নজরুল (১৯৩৮ খৃঃ জনসাহিত্য সংসদের উদ্বোধনী সভায় সভাপতির ভাষণ।)

** সূত্র : ঐ

কবির সংগীতধর্মী রচনাগুলির গঠনশৈলী সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। কবির সঙ্গীত বিষয়ক কাব্যগ্রন্থগুলির বিভিন্ন পর্যায়ে যে রূপান্তর সাধিত হয়েছে তাতে কবির মানসিক ক্রমবিবর্তনের একট ধারা লক্ষ্য করা যায়। কবির রোম্যান্টিক ভাবনার পাশাপাশি, মানবিক মূল্যবোধ ও সুগভীর আত্মিক দর্শনের সঙ্গে যে লোকায়ত ভাবনা বা প্রকরণের প্রবণতা নজরে পড়ে তা কবির ভাবনায় বিচিত্র প্রয়াসের তাৎপর্যকেই সূচিত করে। এর মূলে রয়েছে কবির অন্তঃস্থ চেতনার অন্তহীন আগ্রহ ও সন্ধানী জাগ্রত মানস। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এই সঙ্গীতধর্মী কাব্যসম্ভার একান্ত বিস্ময়ের বস্তু।

এই দিক থেকে বাংলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে গুণগত উৎকর্ষ এবং সার্থক রচনা প্রসাদের দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে আছে নজরুলের 'বুলবুল' (১ম, ১৯২৮) কাব্যগ্রন্থটি। গীতিকবিতা বলতে সাধারণতঃ আমরা বুঝি কাব্যগুণান্বিত গান অথবা গীতিধর্মী ছোট কবিতা। প্রকৃতপক্ষে, কাব্যবিচারে 'গীতি' শব্দটি মোটেই অপ্রয়োজনীয় নয়। বরং এর দ্বারা ব্যঞ্জিত হয় কবির সূক্ষ্ম হৃদয়াবেগ, আর এই হৃদয়াবেগের শিল্পসম্মত প্রকাশই কাব্যের সংজ্ঞায় গীতিধর্মী কবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লক্ষণ। এই সব কয়টি গুণ নজরুলের কবিতায় বর্তমান।

এ ছাড়া সার্থক গীতিকবিতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ এর অন্তঃস্থিত ভাবের সর্বাঙ্গীন সংহতি। 'বুলবুল' কাব্যগ্রন্থে নজরুলের প্রেম বিষয়ক অনুভূতি ব্যক্তিগত সেন্টিমেন্টের সীমাকে অতিক্রম করে সর্বাঙ্গীণ হয়ে ওঠার মূলেও কাজ করেছে কবির রোম্যান্টিক আবেগ এবং কাব্যধর্মী নিষ্ঠার প্রগাঢ় সংহতি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় নজরুলের কাব্যে ভাষা ও ছন্দ সম্পূর্ণরূপে ভাবের অনুগামী হয়ে ওঠার ফলে ভাবের উত্থান-পতন নির্দিষ্ট হয়েছে যথাক্রমে কবির ছন্দস্পন্দন, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং প্রয়োগ ও ধ্বনির অবশ্য প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে।

বস্তুতঃ, এর কবিতাগুলি কবির কখনো আন্তর-অভিঘাতের প্রতিক্রিয়ায় আবার কখনো বা ভাবের ঘনীভূত আবর্তনে এবং গীতিরস নির্যাসের প্রাবল্যে সৌন্দর্যের অনির্দেশ্য পথে যাত্রা শুরু করেছে। কবির রোম্যান্টিক মনের সূক্ষ্ম কোমল ভাবরসসিক্ত অনুভূতি এই কবিতাগুলির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বলতে গেলে এই ভাবতন্ময়তা তাঁকে গীতিকাব্যের সৌন্দর্যমিশ্রিত পরিমণ্ডলের সন্ধান এনে দিয়েছে। আর এই সাফল্যে সহযোগিতা করেছে নজরুলের রচনানিপুণ ভাষা এবং সংযম-স্নিগ্ধ ব্যঞ্জনা। যে আন্তরিকতা সার্থক গীতিকবিতার প্রাণ হিসেবে বিবেচিত 'বুলবুল'-এ তাই যথার্থভাবে উপস্থিত।

'বুলবুল'-এর প্রথম সংস্করণে বিয়াল্লিশটি কবিতা ছিল (আশ্বিন ১৩৩৫)। কবিবন্ধু বিপ্লবী ও সাধক অমলেন্দু দাশগুপ্তের 'বুলবুলের কবি' শিরোনামা সম্বলিত একটি আলোচনা দ্বিতীয় সংস্করণে (পৌষ ১৩৩৫) প্রথমে সন্নিবেশিত হয় এবং অতিরিক্ত সাতটি কবিতাও এতে স্থান পেয়েছিল। এছাড়া এর অধিকাংশ কবিতাই গান হিসেবে লেখা এবং মূলত কবিকৃত সুরের মাধুর্যে বাংলাদেশের শ্রোতাদের কাছে তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।*

'বুলবুল' (প্রথম খণ্ড, আশ্বিন ১৩৩৫) রচনার পর থেকে কবির সঙ্গীতরচনা বা গীতিরচনার কাল পুরোপুরি শুরু হোলো বলা যেতে পারে। কেননা এরপর প্রায় একটানা চৌদ্দখানা গীতিকবিতার সংগ্রহ বা গানের বই প্রকাশিত হয়। রচনার কালানুসারে সেগুলি নিম্নরূপ :

১। বুলবুল (১ম খণ্ড), আশ্বিন ১৩৩৫ সাল (১৯২৮ খৃঃ)
২। চোখের চাতক, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ (১৯২৯)
৩। চন্দ্রবিন্দু (প্রথম সংস্করণ ১৩৩৭, সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত) ১৯৩০ খৃঃ (১৯৪৫ খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়); দ্বিতীয় মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৩৫২ (১৯৪৬ খৃঃ)
৪। নজরুল গীতিকা (ভাদ্র ১৩৩৭, ৯৩০ খৃঃ
৫। নজরুল স্বরলিপি (শ্রাবণ ১৩৩৮) ১৯৩১ খৃঃ
৬। সুরসাকী (আষাঢ় ১৩৩৮) ১৯৩১ খৃঃ
৭। জুলফিকার (ভাদ্র ১৩৩৯) ১৯৩২ খৃঃ
৮। বনগীতি (আশ্বিন ১৩৩৯) ১৯৩২ খৃঃ
৯। গুলবাগিচা (১৩৪০) ১৯৩৩ খৃঃ

* নজরুল ইসলামের কাব্যালোচনায় তাঁর গানগুলি কবিতা হিসেবেই আলোচিত হবে। তাঁর বহু গান স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা। এই প্রসঙ্গে আমরা যেন মনে রাখি যে রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলী' গীতিগ্রন্থটি কবিতার বই হিসেবেই নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল। সমগ্র 'গীতাঞ্জলী'র মধ্যে 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' এবং 'হে মোর চিত্ত পুণ্য তীর্থে'র আবৃত্তি দীর্ঘ হলেও সে দুটি সঙ্গীত হিসেবে গীত হয়। হাফেজ যে গীতিকবিতার কবি, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস যে গীতিকবিতার, নজরুল ইসলামও সেই গীতিকবিতার কবি।'—শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ।

১০। গীতি শতদল (বৈশাখ ১৩৪১) ১৯৩৪ খৃঃ

১১। স্বরলিপি (শ্রাবণ ১৩৪১) ১৯৩৪ খৃঃ

১২। স্বরমুকুর (আশ্বিন ১৩৪১) ১৯৩৪ খৃঃ

১৩। গানের মালা (কার্তিক ১৩৪১) ১৯৩৪ খৃঃ

১৪। বুলবুল (২য় খণ্ড) ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ (১৯৫২ খৃঃ)

এর মধ্যে প্রধানতঃ 'নজরুল গীতিকা' গ্রন্থে বিভিন্ন সুরের বিন্যাস অনুযায়ী যথাক্রমে প্রায় পঁয়ত্রিশটি গজল, উনত্রিশটি খেয়াল, বাইশটি ঠুংরী, চৌদ্দটি দেশাত্মবোধক, ছয়টি টপ্পা, ছয়টি ধ্রুপদী, ছয়টি কমিক, সাতটি ভাটিয়ালী ও বাউল এবং দুটো কীর্তন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এ থেকে বুঝতে অসুবিধে হয় না যে, প্রকৃতপক্ষে তাঁর কাব্যগীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য এই সংগীতময়তায়। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলও এই জন্যেই কাব্য ও সুরের জগতে অবাধে যাতায়াত করেছেন। ফলে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই গীতিকবিতার সার্থক ঝঙ্কারে হয়ে উঠেছে যথার্থ কাব্যসংগীত। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বস্তুতঃ অধিকাংশ ভালো গানই যেমন ভালো কবিতা, তেমনি ভালো কবিতা ছাড়া ভালো গানও অসম্ভব। ফলে অবাক হবার কিছু থাকে না যখন নজরুলের কবিতা ও গান সম্পর্কে কোনো সমালোচক উক্তি করেন, "His best songs are his best poems and, when considered in conjunction with the music, his strongest claim on posterity affects on...His music has functioned germinally, for without him as a predecessor, the later departure of that brilliant musical talent, Himangshu Dutta, Surasagar, would have scarcely been possible."*

মোট দশ বছরের কিছু কম সময়ের মধ্যে নজরুল যে সব কাব্যগ্রন্থ রচনা করেছিলেন তাতে সংগীতেরই ছিল প্রাধান্য। এবং তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত তাঁর গজল গানের সম্ভার। কবির বন্ধু নলিনীকান্ত সরকারের ভাষানুযায়ী প্রথম যে গজল গানটি (১৩৩৩ সাল) কৃষ্ণনগরে কবি রচনা করেছিলেন তা হোলো 'নিশি ভোর হোলো জাগিয়া'। মতান্তরে ঢাকায়

* Nazrul and Modern Bengali Music, (New Values, Sep. 1949) by Buddhadeva Basu.

রচিত 'কে বিদেশী মন উদাসী' (১৩৩৩) গজলটিও প্রথম গান হিসেবে পরিচিত।*

যাই হোক, 'বুলবুল' (১ম খণ্ড) কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই গজল গান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। মনে রাখতে হবে, অতুলপ্রসাদ গজল গানের প্রথম প্রবর্তক হলেও তিনি তাঁর রচনাকে হিন্দুস্থানী গজলের প্রাধান্যমুক্ত করতে পারেননি। কিন্তু নজরুল তা পেরেছিলেন। 'বুলবুল' কাব্যের অধিকাংশ গজলেই বাংলা গানের মেজাজটি পরিপূর্ণ। গজল গানের প্রথাগত রূপটি আজকাল অনেকেরই জানা। বিশেষ করে বিশুদ্ধ পারস্যের গজল সুরের নিয়মানুযায়ী গানের মাঝে মাঝে দীর্ঘায়িত ঢঙে আবৃত্তি, যাকে বলা হয় 'শাএর' তার অনুকরণ এবং পরমুহূর্তে দ্রুত তাল সংযোজন করে গাওয়ার যে পদ্ধতিটি চালু আছে তার কথা অনেকেই জানেন। এবং বলা বাহুল্য, নজরুল এর সবগুলি যথাযথ আয়ত্ত করে তা বাংলা গানের ঢঙে ফেলে তার পুরোপুরি বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

এই গানগুলো রচনার পেছনে যে সব ঘটনা কাজ করেছিল তাতেও অবশ্য যথেষ্ট নাটকীয়তা বর্তমান ছিল। নজরুল তাঁর মানসিকতার বিভিন্ন পর্বে নিজস্ব ভাবনা ও আবেগের স্ফুরণ ঘটিয়েছেন ঐ সব রচনার মধ্যে। ফলে বিশেষ বিশেষ মেজাজের প্রতিফলন এই গানগুলির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যায়। পুত্র বুলবুলের অকালমৃত্যুতে কাতর কবির স্মৃতির পর্দায় ধরা পড়েছে সেই সব বিচিত্র সুরের আনাগোনা। মূলতঃ কবির পদচারণা ছিল বৈচিত্র্যের সহস্র লীলাভূমিতে। ফলে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশকে কবি কাব্যগীতির আধারে এক করে নিয়েছিলেন। সাধারণতঃ দেখা যায় গীতিরচনার ক্ষেত্রে একান্ত সৌষ্ঠবের অধিকারী কবিরও আবেদনগত মূল্যায়ন শেষ পর্যন্ত অপর্যাপ্ত বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু নজরুলের ক্ষেত্রে তেমনটি ঘটেনি। আসলে নজরুল তার প্রতিভার বিনিময়ে অর্থাৎ এই দুটো দিককেই এক করে জুড়ে দিয়ে অন্তরের বাণীটিকে প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, এর ফলে গজল গানের ক্ষেত্রে বাংলা গানের মুক্তির জানালাটি খুলে গিয়েছিল। আর এরই ফলে

* আবদুল কাদিরের মতে কলকাতার পার্শী থিয়েটারের মালিকের অনুরোধে নজরুল ফার্সীতে প্রথম গজল (গুলসনকে চুম্‌চুম্ কহতে বুলবুল) লেখেন। এবং এই গজলটির অনুসরণেই প্রথম বাংলা গজলটি (কে বিদেশী মন উদাসী) লেখেন।

নজরুলের কাব্যগীতির মাধ্যমে আমাদের প্রাচীন অধুনালুপ্ত রাগ-রাগিণীর বা মার্গ সংগীতের অন্তপ্রবেশ বাংলা গানের ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে। সম্প্রতি বাংলা গানের মধ্যে মার্গ সংগীতের যে মিশ্রণ চলেছে তারও প্রবর্তক নজরুল। ইতিহাসের অভিজ্ঞতা থেকেই বোঝা যায় যে, কালোত্তীর্ণতার ক্ষেত্রে প্রাচীনের অচলাবস্থা ভেঙ্গে না ফেলতে পারলে কোনো উপায় নেই। বাংলা গান নজরুলের মাধ্যমে সনাতনীর বাধা উৎরাতে পেরেছে বলেই সে নিরন্তর গতিবেগ থেকে এখনও চ্যুত হয়নি।

অন্যদিকে কবির প্রেমিক সত্তা এবং মানবপ্রীতি ও প্রকৃতির প্রতি নিবিড়ময়তার গুণেই গড়ে উঠেছে তাঁর কবিমানস। এরই জন্যে কবি সুদূর ইরাণী মেয়ের নাচের ছন্দ, অথবা আরবের বেদুইন কন্যার গানের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করেছিলেন। কবি জানতেন যে নৃত্য আর সঙ্গীত হোলো কাব্যের দুই বিমূর্ত কলা। ফলে তাঁর রচনায় এই দুইয়ের সার্থক মিলন সম্ভব হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর গানের মধ্যে কথা আর সুরের বৈচিত্র্য অঙ্গায়িত হয়েছিল অতি সহজেই। তাই প্রেম-প্রকৃতি বিষয়ক ভাবনার মাধ্যমে যে সব গজল গানের সৃষ্টি হয়েছিল বাংলা কাব্যে তা আজও সারল্য ও হৃদয়ের নিবিড় উষ্ণ আলিঙ্গনের সৌহার্দ্যে ভাস্বর।

কবি কিছু গজল গানকেও ঠুংরী ও দাদরার আঙ্গিকে ফেলে রচনা করেছিলেন। আসলে গজল গান রচনার পেছনে তার সুর ও কথার বহু বিচিত্র অন্তহীন পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাবনা কাজ করেছিল। আর তারই প্রেরণায় বাংলা গানকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের বহু বিচিত্র পথে মিলিয়ে নতুন স্বাদ আমদানী করতে তাঁর ছিল অনলস প্রয়াস। বলতে দ্বিধা নেই, সে চেষ্টায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে বহুকাল ধরে উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে প্রসার ঘটেছিল তা মূলতঃ নবাব-বাদশা, জমিদার বা অভিজাত শ্রেণীর অর্থানুকূল্যেই সাধিত হতো। ফলে তা প্রধানতঃ সেই সব শ্রেণী বা সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ মানুষের পক্ষে তার রসাস্বাদন বা উপভোগের অথবা শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল একান্ত সংকুচিত। নজরুল তা লক্ষ্য করেছিলেন। কৈশোরের সহজাত সঙ্গীত প্রতিভা এবং পরবর্তীকালে ওস্তাদ জমিরুদ্দীন খাঁর কাছে ('ঠুংরী বাদশা' বলে খ্যাত) সঙ্গীত শিক্ষালাভ করার ফলে তাঁর পক্ষে গীত রচনা ও তাতে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর ব্যাপক ব্যবহার সম্ভব হয়েছিল। তাঁর রচনায় প্রচলিত সুরের পরিবর্তে তাই বিভিন্ন

রাগ-রাগিণীর মিশ্র ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। এবং এর মধ্যে, জয়জয়ন্তী-খাম্বাজ, নটমল্লার-ছায়ানট, ভৈরবী-আশাবরী-ভূপালী, কালাংড়া-বসন্ত-হিন্দোল, বেহাগ-তিলককামোদ-খাম্বাজ, তিলককামোদ-দেশ, সিন্ধু-কাফি-খাম্বাজ, ভৈরোঁ-ভীমপলশ্রী, ভূপালী-মিশ্র, সিন্ধু-কাফি, শাহানা-জয়ন্তী, ভৈরবী-পিলু, কালাংড়া-বেহাগ, বাগেশ্রী-কাফি, দুর্গা-খাম্বাজ-পিলু, বেলাওল ঠাঁটের দুর্গা, দেশ-সুরট, নটমল্লার-ছায়ানট, তিলককামোদ-দেশ, শাহানা-জয়ন্তী, দেশ-পিলু, খাম্বাজ-পিলু, জৌনপুরী-আশাবরী, বিভাস-মিশ্র, গৌরমল্লার, দুর্গা-মান্দ, বৃহন্নট-কেদারা, ইমন-বেলাওল, মেঘ-বসন্ত, হিন্দোল-শ্রীপঞ্চমী, মালকৌষ-ভৈরবী, নটনারায়ণ ইত্যাদি বাংলা সঙ্গীতকে গৌরবান্বিত করেছে। এছাড়াও, বিশুদ্ধ রাগিণীতে কবি যে সব খেয়াল গান রচনা করেছিলেন তার মধ্যে প্রধানতঃ দরবারী, পূরবী, ভূপালী, কানাড়া, ইমনকল্যান, টোরী, বাগেশ্রী, হিন্দোল, মালকোষ, যোগিয়া, আড়ানা, পিলু, খাম্বাজ, বেহাগ, আশাবরী, ভৈরবী ও জৌনপুরী সমধিক উল্লেখযোগ্য।

গীতিকবিতা রচনাব পাশাপাশি কবি নিজে স্বয়ং কিছু কিছু রাগকে বিভিন্ন রাগের সংমিশ্রণেব মাধ্যমে আবিষ্কার করেছিলেন যা ছিল একান্তই তাঁর নিজস্ব সম্পদ। তাঁর দেওয়া নামানুসারেই সেগুলি পরিচিত। এর মধ্যে নির্ঝরিণী, সন্ধ্যামালতী, বনকুন্তলা, দোলন-চম্পা, মীনাক্ষী, বেণুকা, রূপমঞ্জরী, আশা-ভৈরবী, শিবানী-ভৈরবী, অরুণ-রঞ্জনী, অরুণ-ভৈরবী, উদাসী-ভৈরবী, অরুণা-মঞ্জরী, নাগ-সাবাবলী, নাগধ্বনি-কানাডা, সুরদাসী-মল্লার, শিব-সরস্বতী, দেবযানী, আশা-ভৈরবী, রুদ্র-ভৈরব, যোগিনী, শঙ্করী, ও রামদাসী-মল্লার, বিজয়া, খাম্বাবতী ও ধূপমঞ্জরী অধিক পরিচিত।

উপবোক্ত রাগিণী ছাড়াও কবির সৃষ্ট শাঙন, মালগুণ্‌চ, পাহাড়ী, টোরী মান্দ, রসিয়া, কানরী, জংলা প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর অবদানও উল্লেখযোগ্য।

এসব কার্যে তাঁকে প্রচলিত ও নতুন উভয় পদ্ধতিতেই রাগের সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়েছে। সৃষ্টির প্রেরণায় কবির সংগীতভাবনা তাই দ্বিধা করেনি নতুন রাগের সৃষ্টিতে সনাতনী বাঁধ ভেঙে এগিয়ে যেতে, অর্থাৎ ওস্তাদের কৌলীন্য ও বিধি-নিষেধের বেড়াকে সৃষ্টির তাগিদে অকাতরে অমান্য করতেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। বিশেষ করে তাঁর সৃষ্ট রাগপ্রধান গানের কথা এ-ক্ষেত্রে উল্লেখ করা চলে। সেখানে তিনি বাংলা গানের উপযোগী স্থায়ী, অন্তরা, আভোগ ও সঞ্চারী প্রথাকে রাগপ্রধান গানেও যথারীতি ব্যবহার বা প্রবর্তন করেছিলেন।*

* উদাহরণ হিসেবে উল্লেখযোগ্য : (১) কুহু কুহু কুহু কোয়েলিয়া, (২) ফুলের জলসায় নীরব কেন কবি, (৩) শূণ্য এ বুকে পাখী মোর ফিরে আয়, ইত্যাদি।

এছাড়া হিন্দুস্থানী কাঠামোকে বাংলায় প্রবর্তন করে নজরুল অনেকগুলি রাগিণীর ব্যবহার করেছিলেন। এই সব গানের আয়তন ছোট হলেও ভাবরসসিক্ত কথা বা বাণীতে তা সমৃদ্ধ। উল্লিখিত খেয়ালগুলির মধ্যে আনন্দ, মেঘ, বাহার, গৌরমল্লার, নটবেহাগ, দরবারী ও জয়জয়ন্তীর নামই প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য।*

এছাড়া যে সব সুপ্ত, অপ্রচলিত, অর্ধলুপ্ত রাগ-রাগিণী তাঁর মহৎ সংগীত প্রতিভার নিরন্তর প্রয়াসে নতুন করে ধরা পড়েছিল সেগুলোর মধ্যে বিশেষ করে মালগুঞ্জ বিজয়া, কৌশিকী, শিবরঞ্জনী, খাম্বাবতী, রাগেশ্রী ইত্যাদির নাম করা চলে।

রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলও যে দক্ষিণ ভারতীয় কর্ণাটকী রাগ-রাগিণীর প্রতি আসক্ত ছিলেন তার যথেষ্ট প্রমাণ মেলে তাঁর রচনাব মধ্যে এবং বিশেষ করে স্বরারোপের ক্ষেত্রে কবির পুনরুদ্ধারের ক্লান্তিহীন প্রয়াসে।

নজরুল রচিত গীতিকবিতাব সাঙ্গীতিক রূপ সম্পর্কে কোনো কোনো সমালোচকের বিভ্রান্তিকর মন্তব্য রীতিমতো আপত্তিকর। উপরন্তু কোনো কোনোটি আবার স্ব-বিরোধিতায় পরিপূর্ণ।** সুতবাং সে সম্পর্কে আলোচনা নিরর্থক।

যাই হোক, শ্রেণীবিভাগ করলে দেখা যায় যে নজরুলের 'বুলবুল' (১ম)

* মেঘমেদুর বরষায় (জয়জয়ন্তী), আজি নিঝুম রাতে (দরবারী), দূর বেণু কুঞ্জে (আনন্দ), পিউ পিউ বোলে (বাহার), ফিরে নাহি এলে প্রিয় (গৌরমল্লার), গগনে গগনে চমকিছে দামিনী (মেঘ), রুম ঝুম ঝুম বাদল (নটবেহাগ) ইত্যাদি।

** (ক) "নজরুল তাঁর অগ্রজদের মত দেশকালের মহৎ সাধনার অঙ্গীভূত নন, কেননা তাঁর সময়ে বাংলার সমাজ ছিল বিশ্বকল্পিত যুদ্ধ-ধ্বংস-বিদ্রোহ-বিপ্লব সংকুল, জনগণ ছিলেন ইহলৌকিক রোমাঞ্চ-নির্ভর। বিশুদ্ধ সংগীতে তাঁর রীতিমাফিক অধিকার ছিল না।" পৃঃ ১২৬।

(খ) "নজরুলের সুর রচনার সামর্থ্য বেশি করে উপলব্ধ হয় রাগ সংগীত-গুলিতে।" পৃঃ ১৩৪।

(গ) "নজরুলের প্রতিভার বিশেষত্ব ছিলো, যে-কোনো প্রসঙ্গে তিনি চমৎকার গান বানাতে পারতেন।"—সুধীর চক্রবর্তী, পৃঃ ১২৯। ('রবীন্দ্রনাথ ও সমসাময়িক সংগীতকার' : সম্পাদনা—অরুণ ভট্টাচার্য।)

কাব্যগ্রন্থে গজলের প্রভাব যেমন অপেক্ষাকৃত বেশী, তেমনি তাঁর 'চোখের চাতক' কাব্যগ্রন্থে উচ্চাঙ্গ সংগীতের রাগ-রাগিণীর অধিকতর প্রভাবও সবিশেষ লক্ষণীয়। সুরসাধক বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে (মন্টু) উৎসর্গীকৃত কাব্যগ্রন্থের (বুলবুল, ১ম) উনপঞ্চাশটি (৪২+৭) গানে প্রধানতঃ কবির স্নিগ্ধ-কোমল কাব্য-ভাবনারই প্রাধান্য ছিল। 'চোখের চাতক' কাব্যগ্রন্থের (১৩৩৬) ৫১টি কবিতা বীণাকণ্ঠী প্রতিভা সোমকে উৎসর্গ করা হয়েছিল এবং তাতে মূলতঃ ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সার্থক ব্যবহারটুকু সহজেই নজরে পড়ে। স্মরণ থাকতে পারে যে দিলীপকুমার রায়ই প্রথম নজরুলের গান জনসাধারণের কাছে প্রচারকার্যে, বিশেষ করে নজরুলের গজল গানের* প্রচারে সর্বপ্রথম উদ্যোগী হয়েছিলেন। অপর-দিকে নজরুলের ছাত্রী ঢাকার প্রতিভা (রাণু) সোমকে (বর্তমানে লেখিকা প্রতিভা বসু) তিনি প্রধানতঃ রাগমিশ্রিত গানের সংগ্রহ কাব্যগ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন। প্রতিভা সোমকে উৎসর্গীকৃত 'চোখের চাতক' (১৯২৯) কাব্যগ্রন্থে ভাটিয়ালী কার্ফা, কীর্তন, পরজ একতালা, ছায়ানট দাদরা, মাঢ়-কাওয়ালী, বৃন্দাবনী সারং-কাওয়ালী, গৌড় সারং-ঘৎ, নাগধ্বনি-মধ্যমান ইত্যাদি সুরের প্রাধান্য সবিশেষ লক্ষণীয়।

'চোখের চাতক' বস্তুতঃ কাব্যগীতি পর্যায়ে দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ (১৯২৯)। মোট ৫৩টি কবিতা সংযোজিত এই কাব্যগ্রন্থে কবির রাগাশ্রিত রচনার প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। রাগ-রাগিণীর বিচারে এই অংশে জয়জয়ন্তী, খাম্বাজ, ভৈরবী, পিলু, বাগেশ্রী, জৌনপুরী, সারং, টোরী, মূলতানীর প্রাধান্য ঘটেছে। এছাড়া ভাটিয়ালী, কীর্তন ও গজলের অন্তর্ভুক্তি কবির রচনা-বৈচিত্র্যের পরিচায়ক। সাঙ্গীতিক বৈচিত্র্য ছাড়াও এই কাব্যগ্রন্থের কাব্যিক বোধ ও অনুভূতির ব্যঞ্জনা বাংলা গীতিকবিতার অন্যতম সম্পদ। যেমন—

* "গজল, ঘজল, আরবী শব্দ। ইহা একপ্রকার প্রেমবিষয়ক কবিতা বা গীতি। গজল একটি বিশিষ্ট রীতিতে সুর করিয়া পাঠ বা গান করা হয়। ফারসী ভাষায় রচিত গজল জগদ্বিখ্যাত। ইহা সাধারণতঃ অনেকগুলি পদে রচিত হয়। প্রথম পদকে মাৎলা বলে এবং এই পদের দুইটি লাইনের অন্তে মিল থাকে। পরবর্তী পদগুলির শেষ লাইনে একই ছন্দ প্রযুক্ত থাকে। ফারসী সাহিত্যের অনুকরণে উর্দু সাহিত্যে গজল প্রচলিত হইয়াছে। বাংলায় নজরুল ইসলাম গজল রচনা করেন।" (ভারতকোষ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৬৫, রাজ্যেশ্বর মিত্র।)

(ক) শিয়রে বসি চুপি চুপি চুমিলে নয়ন
মোর বিকশিল আবেশে তনু
নীপ-সম, নিরুপম, মনোরম ॥

(৭ নং)

(খ) আমার শাখায় যবে ফোটেনি ফুল
আমি চেয়েছি পথ আশায় আকুল,
আজ ফোটা ফুলে কাঁদে কেন
কুসুম ঝরার দুখ ॥ (২৪ নং)

(গ) অশোক রঙন ফুটে
কিশোর-হৃদয়-পুটে,
কপোল রাঙিয়া উঠে
অতনুর অনুরাগে ॥ (৩৬ নং)

'চোখের চাতক' কাব্যগ্রন্থে নজরুলের প্রেমকল্পনার স্পর্শেন্দ্রিয় অনুভূতির বিকাশ তাঁর রোম্যান্টিক কবিমানসেরই অভিব্যক্তি। ফলে সুর চয়নের ক্ষেত্রেও কবির দৃষ্টি ছিল স্নিগ্ধ রাগিণী তথা পেলবধর্মী প্রবণতার দিকে। কবির অতৃপ্তি-জনিত তিয়াস এই কাব্যের সঙ্গীতময়তার মধ্যেই সুপরিস্ফুট।

'নজরুল গীতিকা' (১৯৩০ খৃঃ) গ্রন্থে যে ১২৭টি গান সঙ্কলিত হয়েছে তার মধ্যে আটাশটি নতুন রচনা। বাকী ৯৯টি রচনা কবির পূর্বে প্রকাশিত রচনা থেকে সংগৃহীত। যে সমস্ত কাব্যগ্রন্থ থেকে এগুলি সংকলিত হয়েছে তার মধ্যে অগ্নিবীণা, পূবের হাওয়া, সর্বহারা, ফণিমনসা, জিঞ্জীর, বুলবুল (১ম), চোখের চাতক, সন্ধ্যা, প্রলয়শিখা, চন্দ্রবিন্দু ছাড়াও 'মহুয়া' নাটক (মন্মথ রায়), 'জাহাঙ্গীর' নাটক (মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) ও 'আলেয়া' গীতিনাট্য প্রভৃতি থেকে এর অনেক রচনা গ্রহণ করা হয়েছে। লক্ষণীয়, সেই সর্বপ্রথম নজরুলের গীতিকবিতা সম্পূর্ণ গীতিকা বা গান শিরোনামায় প্রকাশিত। এবং রবীন্দ্রনাথের ন্যায় নজরুলের গানও তখন থেকেই 'নজরুল গীতি' হিসেবে সাধারণের কাছে প্রচারিত ও সমাদৃত। যদিও বেতারে (আকাশবাণী, কলকাতা) 'নজরুল গীতি' কথাটি নজরুল সুস্থ থাকাকালে কখনো প্রচারিত হয়নি। ১৯৪০ খৃঃ থেকে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে বাংলা গানের দুটি বিভাগ চালু করা হয়। অর্থাৎ মূলতঃ ছন্দপ্রধান রচনাকে আধুনিক গান এবং রাগের প্রাধান্য মিশ্রিত গানকে রাগপ্রধান বাংলা গান বলে তখন থেকেই গ্রহণ করা হোলো। যাই হোক,

পরবর্তীকালে স্বাধীনতা দিবসে (১৫ই আগস্ট ১৯৪৭) বেতারে সর্বপ্রথম নজরুল রচিত গানকে 'নজরুল গীতি' বলে ঘোষণা করা শুরু হয়।* অবশ্য এর অনেক আগেই জনসাধারণের কাছে নজরুলের গান 'নজরুল গীতি' হিসেবে গৃহীত ও প্রচারিত হয়েছিল।

'নজরুল গীতিকা' সেই দিক থেকে বিভিন্ন কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের 'গীতবিতান'-এর মতো এতে বিচিত্র স্বাদের এবং ভাবের রচনা সংকলিত হয়েছে। বহুল প্রচারিত দেশাত্মবোধক রচনাগুলি ছাড়াও এতে যথাক্রমে ঠুংরী, হাসির গান, গজল, ধ্রুপদ, কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী, টপ্পা ও খেয়াল গানের সংযোজন এই সংগ্রহটিকে অধিকতর মর্যাদা দান করেছে।

১৯৩১ খৃঃ প্রকাশিত 'সুরসাকী' (আষাঢ়, ১৩৩৯) কাব্যগ্রন্থে কবির সূক্ষ্ম রোম্যান্টিকতা ও প্রেমভাবনার যুগল সম্মিলন সাধিত হয়েছে। এর ৯৮টি রচনায় প্রধানত: কবির প্রেম বিষয়ক অনুভূতির বহুবিচিত্র ভাবনা ও কল্পনার পরিচয় মেলে। কবির রোম্যান্টিক মানসের বৈচিত্র্য প্রতিটি রচনায় ছড়িয়ে আছে। প্রেয়সীর প্রতি মান-অভিমান, বিরহ-বেদনা এবং আনন্দ-উল্লাসের নানা ভাবরসে সুরসাকী পরিপূর্ণ। প্রেমবিষয়ক গীতিকবিতার বিচারে এগুলি নিঃসন্দেহে বাংলা কাব্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। গানের সুর ছাড়াও কেবলমাত্র কাব্য বিচারের ক্ষেত্রে ভাবের গভীরতায় এবং শব্দের আশ্চর্য ব্যবহারের সার্থকতায় এই কবিতা-গুলি নজরুলের পরিণত কাব্যকলার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবেই গণ্য হবার যোগ্য। যেমন—

(ক) মৃত্যু-আহত কণ্ঠে তাহার
ঐ কি এ গানের জাগিল জোয়ার,
মরণ বিষাদে অমৃতের স্বাদ
আনিলে নিষাদ মম ॥ (১নং)

(খ) সুরের গোপন বাসর-ঘরে
গানের মালা বদল করে
সকল আঁখির অগোচরে
মন দেখাতে মোদের মিলন। (৮নং)

(গ) পিছনে পড়ে চাঁদের কিরণ নিটোল তারি গায়ে,
সন্ধ্যা সকাল আসে তারি আল্‌তা হতে পায়ে। (৫০নং)

* সঙ্গীতশিল্পী সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার।

প্রকৃতির বিচিত্র রূপের বর্ণনায় কবি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে প্রতীকের সার্থক ব্যবহার এবং তাঁর শিল্পকুশলতার পরিচয় দান করেছেন এই কাব্যের প্রায় প্রতিটি কবিতার মধ্যে। ব্যক্তিগত ভাবনার নিরিখে বিচার্য এই সব রচনার মধ্যে অভিমান, রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি কিছুই বাদ যায়নি। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে বিষয়বস্তুর দিক থেকে কবিতাগুলি প্রেমবঞ্চিত কবি-হৃদয়ের হৃদয় মথিত বেদনারই ইতিহাস। কিন্তু কবি তাতে উদ্‌ভ্রান্ত হননি, এমন কি তাঁর আত্ম-প্রত্যয়ও কখনোই কোনো ক্ষেত্রে ক্ষুণ্ণ হয়নি। আসলে, কবির প্রেম সর্বগ্রাহী। কবি চেয়েছিলেন প্রেয়সীদের অখণ্ড প্রেম। তাই খণ্ড-প্রেমে কবির তৃপ্তি ছিল না। যদিও প্রেয়সীরা তাঁকে অখণ্ড ও সুগভীর ভালোবাসার মর্যাদা দান করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু কবির ভালবাসা অন্ধ। আর এই জন্যেই তাঁর এই সব রচনার মূলে রয়েছে ঈপ্সিত প্রেমের প্রেরণা। তাঁর কবিতার মধ্যে সেই বিরহকাতর কবি-হৃদয়েরই নীরব অশ্রুপাত।

বস্তুতঃ, কবিতার মধ্যে কবির ভালবাসা বিশ্বের ভালবাসা হয়ে কবি-চিত্তকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। অর্থাৎ কবিতার ভেতর দিয়েই যেন কবির নব-জাগরণ ও আত্মোপলব্ধি ঘটেছে। পৃথিবীর সকল কবির মতো নজরুলের অভিমানও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পরিপূর্ণ ভালবাসার অর্থ কেবলমাত্র আত্মসমর্পণ নয়। মান-অভিমানও তারই মধ্যে অলক্ষ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তীব্র হয়ে ওঠে। নজরুলের ক্ষেত্রে তার অন্যথা ঘটেনি। অবশ্য তাঁর গভীরতার আত্মজিজ্ঞাসা ও প্রেমের সুস্নিগ্ধ মধুরতম স্পর্শ মূলত: গীতিকবিতার মধ্যে শান্ত-সৌন্দর্যমিশ্রিত প্রশান্তিতে আরও মধুর হয়ে উঠেছে। কবির সঙ্গীতশিক্ষক ওস্তাদ জমিরউদ্দিনকে উৎসর্গীকৃত 'বনগীতি' (১৯৩২ খৃঃ, আশ্বিন ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত) কাব্যগ্রন্থে মোট ৭১টি কবিতায় ভক্তি-রসাশ্রিত প্রেমভাবনার জয়গান সূচিত হয়েছে। কবির ভালবাসা কখনো এই কাব্যে কৃষ্ণ-রাধার প্রেমকল্পনাকে স্মরণে রেখে গ্রথিত হয়েছে, আবার কোথাও বা গ্রাম্য সঙ্গীত রচনার মাধ্যমে প্রকৃতির সুনিবিড় তন্ময়তার মধ্যে তা বিস্তার লাভ করতে প্রয়াসী। এই কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'স্বদেশী গান' পর্যায়ের 'নমঃ নমঃ নমো / বাঙলাদেশ মম' (১৬ নং) কবিতাটি। কবির দেশপ্রেমমূলক পর্যায়ের এই রচনাটি বাংলা কাব্যে সৌন্দর্যবর্ণনার বিচারে স্থায়ী স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। গ্রাম্য বর্ণনার পাশাপাশি (বনগীতির কবিতাগুলির মধ্যে বিরহজাত বেদনার রস সৃষ্টিতে কবির বৈচিত্র্যমুখী ভাবনারই পরিচয় মেলে।

ভজন গানগুলির মধ্যেও ঈশ্বরের প্রতি আরাধনার শান্ত ও শাশ্বত রূপটি কাব্যের স্নিগ্ধতায় পরিপূর্ণ।

'বনগীতি'র মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংযোজন ঝুমুর গান। কৈশোরের অভিজ্ঞতার বিনিময়ে কবি ঝুমুর গান রচনায় হাত দিয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, ঝুমুর গান সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

প্রধানতঃ পুরুষ কর্তৃক গীত আদিবাসী বসতি-সীমায় প্রচলিত সঙ্গীত যা ঝুমুর গান হিসেবে প্রচলিত তা বিভিন্ন ভাষায় গাওয়া হলেও সুরগত ঐক্যই এই গানের বৈশিষ্ট্যকে রক্ষা করেছে। লক্ষণীয়, ভাষার পরিবর্তন হলেও সুর এবং আঙ্গিকের অপরিবর্তনীয় প্রভাবের গুণে ঝুমুর গান সমৃদ্ধ। তিনটি পদের সমন্বয়ে, যথাক্রমে 'সাধারণ—চড়া—খাদ' পর্যায়ে বিভক্ত এই ঝুমুর মাদলের বাদ্য ও বাঁশী সহযোগে পরিবেশিত হয়। প্রত্যক্ষ জীবনের বাস্তবতার ছোঁয়া মিশ্রিত বিষয়-বস্তুই ঝুমুরের বৈশিষ্ট্য। প্রথমে আদিবাসী জীবনের বিচিত্র কথা অবলম্বনে ঝুমুর গান রচিত হলেও পর্যায়ক্রমে এতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার প্রভাব দেখা দেয়। অবশ্য তা সত্ত্বেও এতে মৌলিক আদিবাসী ঝুমুরের বহিরঙ্গ জগতের মাধুর্যটুকু বিসর্জিত হয়নি। পরবর্তীকালে বাংলার ী-কবিদের মধ্যেও ঝুমুর রচনার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এর ফলে ঝুমুর ক্রমশঃ এর সহজ সরল সংক্ষিপ্ত আদিবাসী রূপটি হারাতে থাকে। অর্থাৎ আদিবাসী ঝুমুর বাস্তব-ভিত্তিক স্বাধীন সত্তাটি হারিয়ে সুনির্দিষ্ট কাহিনী (রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা) কেন্দ্রিকতার ফাঁদে ধরা পড়ে। ফলে আজকাল ঝুমুরের ক্রমবিকাশের ভবিষ্যৎ ক্রমে ক্রমে অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অথচ এতকাল ঝুমুর গান নিরক্ষর সমাজের মধ্যে সর্বাধিক প্রচারিত (মৌখিকভাবে) উপজাতিগত বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধিত্ব করে এসেছে।

প্রখ্যাত ঝুমুর শিল্পী কমলা ঝরিয়ার মতে, ঝুমুর গানের প্রচলন হয় সর্বপ্রথমে বিহারের অন্তর্গত ঝরিয়া অঞ্চলে।* এক সময় ঝরিয়া ছিল আঞ্চলিক সঙ্গীতের অন্যতম আকর্ষণীয় কেন্দ্র। ঝুমুর গানের প্রাচীন স্রষ্টাদের মধ্যে শ্রীভদ্র ছিলেন অন্যতম। বলতে গেলে তিনিই ছিলেন ঝুমুর গাইয়েদের পথপ্রদর্শক। তাঁর গায় ও সৃষ্টি ঝুমুর গানের ঐশ্বর্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এছাড়া প্রায় বছর পঞ্চাশেক পূর্বে 'ভবপিতা' নামে এক ব্যক্তিও ঝুমুর গানের অন্যতম রচয়িতা বলে পরিচিত। ভবপিতা বৈদ্যনাথ ধামের বাসিন্দা ছিলেন এবং সেখানেই তিনি

* ঝুমুর গানের বিখ্যাত শিল্পী কমলা ঝরিয়ার সাক্ষাৎকার।

তাঁর অজস্র ঝুমুর গান রচনা করেছিলেন। এ ছাড়া অধর দাসের নামও ঝুমুর রচয়িতা হিসেবে উল্লেখযোগ্য। ইনিও বহু ঝুমুর গান রচনা করেছিলেন।*

পরবর্তীকালে আদ্রা (খড়গপুর, পশ্চিমবঙ্গ) অঞ্চলের পঞ্চকোট গ্রামটি হয়ে উঠেছিল ঝুমুর চর্চার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্রস্থল। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পুরুষ ও মহিলারা গ্রামের সেই ঝুমুর উৎসবে এসে অংশ গ্রহণ করতেন। অবশ্য শোনা যায় বহুকাল আগে সাঁওতাল অধ্যুষিত অঞ্চলেই নাকি প্রথম ঝুমুর গানের প্রবর্তন হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে, বীরভূমের সাঁওতাল অধ্যুষিত অনেক অঞ্চলে এখনো ঝুমুর গানের প্রচলন আছে। বছর পঞ্চাশ-ষাট আগে বিহারের প্রধান সঙ্গীত বলতে এই ঝুমুর গানকেই বোঝাত।

ঝুমুর গানের অন্যতম লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ :

(ক) পাহাড়ের ছাপ এবং প্রভাব।

(খ) মোটামুটি পাঁচটি পর্দার নাড়াচাড়া।

(গ) গেঁয়ো কথা ও মৈথিলী শব্দের আধিক্য।

(ঘ) ঠুংরীর কিছুটা ঢঙ।

(ঙ) মূল ঝুমুরে বাংলা কথার অনুপস্থিতি।

প্রাচীন ও মূল ঝুমুর রচয়িতাগণ কেউ বাংলা জানতেন না বলে মূল বা প্রাচীন ঝুমুর গানে বাংলা কথা অনুপস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে বাংলা-ভাষায় অনেকেই অবশ্য ঝুমুর গান লিখেছিলেন। সাঁওতাল পরগণার সিংভূম ও মালভূম অঞ্চলের ঝুমুর গান প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের প্রেমকে অবলম্বন করে রচিত। ফলে সে সব রচনায় রাধার দেহতত্ত্ব ও যৌবনের ভিন্ন ভিন্ন রূপের বর্ণনা প্রকাশিত। যেমন—

* প্রখ্যাত লোকসাহিত্য গবেষক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য ঝুমুর গানের বিস্তৃত আলোচনায় ভবপ্রীতা (ভবপিতা) ওঝা ছাড়াও দীন নরোত্তমা, দ্বিজ টিমা, বিনোদ সিংহ, মহিলা কবি ননীবালা, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি রচয়িতাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁর মতে, বীরভূমের ঝুমুর গানে কীর্তনের প্রভাব দেখা যায়। উপরন্তু, তিনি বিভিন্ন শ্রেণীর ঝুমুরের কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন, দাঁড়শালী ঝুমুর, পাতানাচের ঝুমুর, খেমটি নাচের ঝুমুর, কাঠি নাচের ঝুমুর, ছো-নাচের ঝুমুর, ভাদুরিয়া ঝুমুর ইত্যাদি। বাংলার লোকসাহিত্য—ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

ঘামে ভিজল পাতল শাড়ী
ছাপিত না রহে কুচাঞ্চ গিরি
খেলে দিশা অঠহর
ঢুলে নাগরী নাগর গো
প্রেমে বিভোর ঢলঢল মধুকর ॥

অথবা,

আজও নাগর বড় আওল রে সখি
স্বপ্নামে আওয়ে নন্দলাল
সোনাকেরি পোয়াপাটি
রেশমে ঘেরাওল খাঁটি
সেজ পরি শুতে প্রভু নন্দন রে
রঘু নন্দন রে সখি
স্বপ্না যে আওযে নন্দলাল।
লাল পালকিয়া জরবিছানওয়া
তঁহি শুতে প্রভু নন্দ~ ~ে
সখি স্বপ্নামে আওযে নন্দলাল ॥

বলা বাহুল্য, উপরোক্ত দুটি ঝুমুরই মৈথিলী ভাষায় লেখা। এবং এগুলি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে রচিত বাংলা ঝুমুরের একটি উদাহরণ—

বলগো তায় ফিরে যেতে
বল গো যেন আর আসে না
আমায় সে দিল মনোবেদনা
যে দিল
কালো রূপ হেরিব না
তারে দূরেতে নিকালো গো তায়
বল গো তায়……॥
ও বিশাখা ও ললিতে
তোরা জানিস্ ভালো মতে
জেনে শুনে হাতে হাতে
দিলি গো গরল ও তায় ফিরে যেতে
কাঙাল অধর দাসে কয়

সখি এ কথায় সন্দেহ হয়
সখিদেরও একা নয়
তাতে তোমারও দোষ ছিল গো
তায় ফিরে যেতে…॥

লক্ষণীয় যে, এই ঝুমুরটিতে ভাষার আটপৌরে ভঙ্গীটি ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে। মৈথিলী ভাষায় রচিত ঝুমুর গানে সহজেই যে বৈষ্ণব-পদাবলী ও প্রেমভাবনার ছায়াপাত ঘটেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন—

মন নিল মন মোর
যাইতে যমুনাতে হেরি যদুনাথে
ফিরিতে পথেতে পদ অঠরে
সখি মন নিল মন মোব ॥
যেমতি আকাশে চন্দ্রিমা-প্রকাশে
তেমতি উদয় হৃদয় নাগর
সখি মন নিল মন চোর
যদি শ্যামভাবে কুল মান যাবে
কারে রাখি কারে করি অনাদর
সখি, মন নিল মনচোর ॥

নজরুলের জীবনে কৈশোরের ঝুমুর গানের স্মৃতি ও তার প্রভাব ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। পরিণত বয়সে নজরুলের রচিত ঝুমুর গানে সেই অভিজ্ঞতার সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। তাঁর রচনার মধ্যেও রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও ভাবনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, আদিবাসী সাঁওতালদের মাদলের ছন্দের ছন্দের তার ঝুমুর রচনার মধ্যে মিশে বাংলা গানের ক্ষেত্রে নতুন একটি সম্ভাবনার দ্বারকে উন্মুক্ত করেছে। বেদেনী, সাপুড়ে ও জিপসীদের নিয়ে রচিত গানের মধ্যে ঝুমুর গানের সুর বসিয়ে কবি প্রাচীন একটি লুপ্ত সম্পদকে বাংলা গানের আসরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

'বনগীতি'র দ্বিতীয় সংস্করণে (আষাঢ়, ১৩৫৯) আগেকার ১৬টি গান বাদ দিয়ে নতুন আরো ২২টি গান তাতে সংযুক্ত করা হয়েছিল।* তাতে প্রধানতঃ

* দ্রঃ আবদুল আজীজ আল-আমান্ 'বনগীতি'র ছিয়াত্তরখানি গান' বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর সংকলিত 'নজরুল রচনাসম্ভার' (৩য়) গ্রন্থে। (সূচীক্রম দ্রষ্টব্য)।

ইসলামী গান এবং কয়েকটি ভক্তিমূলক গান ছাড়াও কয়েকটি ঝুমুর (সাঁওতালী) গান ছিল।

'গুলবাগিচা' (১৯৩৩) কাব্যগ্রন্থে কবির মতে "ঠুংরী, গজল, দাদরা, চৈতী, কাজরী, স্বদেশী, কীর্তন, ভাটিয়ালি, ইসলামী ধর্ম-সঙ্গীত প্রভৃতি বিভিন্ন ঢং-এর গান দেওয়া হইল। আমার সৌভাগ্যবশতঃ ইহার প্রায় সমস্ত গানগুলিই ইতিমধ্যে লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে।" এই জনপ্রিয়তার মূলে সুরবৈচিত্র্য এবং লৌকিক বিষয়বস্তুর প্রাধান্য কাজ করেছিল। মূলতঃ 'গুলবাগিচা'র দু-চারটি ছাড়া আর সবগুলি গানই কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হবার পূর্বেই স্বদেশী মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করা হয়েছিল। এই সাতাশীটি গানের মধ্যে প্রেয়সীর প্রতি কবির মান-অভিমান এবং ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। উপরন্তু প্রিয়ার রূপবর্ণনা এবং সৌন্দর্যের প্রশস্তি এই কবিতাগুলির মধ্যে বর্তমান। মূলতঃ গ্রাম্য ছবি এবং লৌকিক বর্ণনাসুলভ অনুভূতির ফলে এই কবিতাগুলির অতিরিক্ত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে।

১৯৩৪ খৃঃ নজরুলের চারটি কাব্য যথাক্রমে (১) গীতিশতদল (১০১টি রচনা), (২) সুরলিপি (স্বরলিপি), (৩) সুরমুকুর (স্বরলিপি), (৪) গানের মালা (৯৫টি রচনা) প্রকাশিত হয়। এর আগে একই বছরে এতগুলি গ্রন্থ কখনো প্রকাশিত হয়নি। বলতে গেলে সেই সময়ে নজরুল গানের রাজ্যে পুরোপুরি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। ফলে বিভিন্ন সুর নিয়ে তখন তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না। এ কাজে তাঁর সাফল্যের পরিমাণই বেশী। আসলে গানের রাজ্যে কবি তখন ডুবেছিলেন। জনপ্রিয়তার ফলে রেকর্ড, সিনেমা, নাটক, বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গান লিখে দেবার কাজে তিনি আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ফলে কিছু কিছু রচনায় ভাবের গভীরতার পাশাপাশি অসংলগ্ন শব্দ বা কথা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু তাঁর সুবিশাল সৃষ্টির তুলনামূলক বিচারে এগুলি বলতে গেলে কিছুই নয়। সৃষ্টির সুবিশাল পরিপ্রেক্ষিতে যৎসামান্য অপচয়ের সম্ভাবনা সমস্ত দেশে সমস্ত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

'গীতিশতদল' (১৯৩৪)-এর ১০১টি গানের সবগুলিই 'গ্রামোফোন' ও 'স্বদেশী মেগাফোন' কোম্পানীর রেকর্ডে রেখাবদ্ধ হয়েছিল একথা কবি প্রারম্ভে 'দুটি কথা' নামক বক্তব্যে নিজেই জানিয়েছিলেন। ফলে, এই গ্রন্থে বিচিত্রধর্মী রচনার স্বাদ পাওয়া যায়। আরবী সুরের অনেক গান এই অংশের অন্তর্ভুক্ত।

এছাড়া কীর্তন, ভজন, হোরীর গান ও বাউল গানের পাশাপাশি দ্বৈত গান এবং ব্যঙ্গ মিশ্রিত কিছু হাস্যরসাত্মক রচনাও এই গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। কবির ভক্তি-প্লুত হৃদয়ের প্রকাশ যেমন কীর্তনের মধ্যে প্রকাশিত তেমনি ভোজপুরী হোরীর চটুল মেজাজটুকু তাঁর এই অংশের কয়েকটি কবিতায় বর্ণিত। প্রকৃতপক্ষে, কবির বিচিত্রধর্মী মানসিকতার পবিচয় এই কাব্যগীতি সংগ্রহের মধ্যে সুপরিস্ফুট। কাব্যগুণের দিক থেকে বিচার করলে এব সমস্ত রচনাই রসোত্তীর্ণ একথা বলা যায না। কিঞ্চিৎ চটুল শব্দের প্রয়োগেও অনেক রচনার গাম্ভীর্য শেষ পর্যন্ত রক্ষিত হয়নি। কবিকে জনপ্রিয়তার মূল্য অনেক সময়ে অত্যধিক রচনার বিনিময়ে দিতে হয়েছে। ফলে অনেক সময সে সব রচনা ফরমায়েসীর মানকে অতিক্রম করতে সক্ষম হযনি। কেবলমাত্র চাহিদানুযাযী বিচিত্র রস ও সুরের জন্য গান লেখার মূল্য এভাবে নজরুলকে অনেক ক্ষেত্রে দিতে হয়েছে। কেবলমাত্র সুবের মনোহারিত্বের গুণে সেগুলি জনপ্রিযতা লাভে ব্যর্থ হযনি।

কবির স্নেহভাজন অনিলকুমার দাসকে উৎসর্গীকৃত 'গানের মালা' গীতি-সংগ্রহে (১৯৩৪) যে ৯৫টি রচনা স্থান পেযেছে সেগুলিও কবির বিচিত্র গীতিধর্মী রচনার ফসল বলা যায। বঙ্গজননীর বর্ণনার সার্থক রূপাযণ এই কাব্যগ্রন্থের ৩৭নং গান 'এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী' রচনাটি সাধারণ পাঠক ও শ্রোতার হৃদয়কে এর সারল্যের গুণে স্পর্শ কবে। যেমন—

> শাপ্‌লা শালুকে সাজাইযা সাজি শরতে শিশিরে নাহিয়া,
> শিউলি ছোপানো শাডী পরে ফের আগমনী-গীতি গাহিয়া।
> অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনী॥

প্রকৃতির স্নিগ্ধ বর্ণনার মাধুর্য রচনাটির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ রচনাই কাব্যরসাশ্রিত প্রসাদগুণে পরিপূর্ণ। বলতে গেলে প্রায় প্রতিটি রচনাই পরিণত চেতনার সাক্ষ্য দেয়।

'বুলবুল' (২য় খণ্ড) ১১ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৯ (১৯৫২ খৃঃ) প্রকাশিত হয়। কবির অসুস্থতার পর কবিপত্নী প্রমীলা এই খণ্ডে নজরুলের ১০১টি কবিতা-সমৃদ্ধ গীতিকবিতার সংকলন প্রকাশকালে 'নিবেদন' শিরোনামায় মুখবন্ধে লিখেছিলেন—

"কবির আধুনিক গানগুলি সংকলন করে 'বুলবুল ২য় খণ্ড' প্রকাশ করা হল। তাড়াতাড়ি প্রকাশ করার জন্য ছাপায় কিছু ভুল থেকে গেছে। পরবর্তী

সংস্করণে আশা করি কোন ভুল থাকবে না। এই গানের বইটির আর একটি বিশেষত্ব এই যে, এর মধ্যে কবির আধুনিক অপ্রকাশিত কতকগুলি গান আমরা দিতে পেরেছি। নজরুলগীতি যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের কাছে এই বইটি সমাদর পেলে, আমি আমার প্রথম প্রচেষ্টাকে সার্থক বলে মনে করব।

ইতি—

নিবেদিকা

প্রমীলা নজরুল ইসলাম

(পুস্তকাকারে বুলবুল ২য় খণ্ডের প্রকাশিকা)"

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বুলবুল ২য় খণ্ডের কবিতাগুলি কবির কাব্য-গীতির শ্রেষ্ঠ নৈপুণ্যের পরিচয়ই প্রধানতঃ বহন করেছে। কবির মানবীয় অনুভূতি এবং বেদনার তীব্রতা কাব্যোচিত মাধুর্যের সঙ্গে এই সব কবিতায় পরিবেশিত। এই পর্যায়ের অধিকাংশ রচনা বিভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে গান হিসেবে আশ্চর্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। কিন্তু এই সাফল্যের মূলে সুরের আশ্চর্য যাদু যেমন কাজ করেছে তেমনি কবির রচনার মধ্যে যে রোম্যান্টিক মাদকতা ও প্রেমের বিচিত্র প্রযাস তথা শব্দের নৈপুণ্য এই গীতিকবিতায় বর্তমান এক্ষেত্রে তাও নিশ্চয়ই যথেষ্ট প্রভাব বিস্তাব করতে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ, এই কাব্যে বিরহের সুর ও কবির আর্তি কাব্যোচিত ঢঙে অধিকাংশ কবিতার ভেতর দিয়ে চিত্রিত হয়ে কবির রোম্যান্টিক ভাবনাকেই যেন এখানে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ করতে প্রয়াসী। কবির বিরহ আজ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা পড়েছে তাঁর চোখে। তাই "যারে হাত দিয়ে মালা দিতে পার নাই / কেন মনে রাখ তারে / ভুলে যাও তারে ভুলে যাও একেবারে" বলে কবি নিজেই অভিমানের সুর বদলে বললেন, "আমি চিরতরে দূরে চলে যাব, তবু আমারে দেব না ভুলিতে / (আমি) বাতাস হইয়া জড়াইব কেশ, বেণী যাবে যবে খুলিতে ॥" কবির এই অস্থিরতার কথা নিজেও বিস্মৃত হননি। কবির ভালবাসার ব্যর্থতা ও প্রেমের বিরহজাত শূন্যতাকে গোপন করার প্রয়াস তাঁব নিজের কাছেও শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। কবির কবিতা যেন তাঁর অন্ত্যজ ভাবনারই প্রকাশ। কবি লিখেছেন—

সবার কথা কইলে কবি, নিজের কথা কহ।
(কেন) নিখিল ভুবন অভিমানের আগুন দিয়ে দহ।
নিজের কথা কহ ॥

কে তোমারে হানল হেলা কবি ?
সুরে সুরে আঁকি কি গো সেই বেদনার ছবি
কার বিরহ রক্তধারায় বক্ষে অহরহ—
নিজের কথা কহ ॥

কোন ছন্দোময়ীর ছন্দ দোলে তোমার গানে গানে
তোমার সুরের স্রোত বয়ে যায় কাহার প্রেমের টানে গো
কাহার চরণ পানে ?
কাহার গলায় ঠাঁই পেল না বলে
(তব) কথার মালা ব্যথার মত প্রতি হিয়ায় দোলে ।
(তোমার) হাসিতে যে বাঁশী বাজে
সে ত তুমি নহ
নিজের কথা কহ ॥

কবির নিজেব কাছেই তাঁর বিচিত্র হাসি-গানের এই পর্বান্তর রহস্যের মতো ঠেকেছে। প্রকৃতপক্ষে, প্রেমিকের সুপ্ত বেদনা তাঁর মর্মে যে বিরহবোধের দাহ সৃষ্টি করেছিল তারই তাড়নায় কবির এই বিচিত্র পথের অভিসার। বিশ্বের সমস্ত রোম্যান্টিকের মতোই তাঁর হৃদয়স্থিত দ্বন্দ্ব ভাবের জগতে পরস্পর-বিরোধী সেন্টিমেন্টের মুখোমুখী হয়েছে। তাই কবির প্রেমিক হৃদয় একদিকে দ্বিধাহীন-ভাবে আত্মসমর্পণ করে যখন বলে, "ভুল করে যদি ভালোবেসে থাকি / ক্ষমিও সে অপরাধ। / অসহায় মনে কেন জেগেছিল ভালবাসিবার সাধ ॥" তখন সে অসহায়তা কবিহৃদয়কে পীড়িত করে। কিন্তু কবির আশা, "তবু জানি প্রিয় একদা নিশীথে / মনে পড়ে যাবে আমার চকিতে"। এই সামান্য আকাঙ্ক্ষা বা সাধ কবিকে পুনরায় ফিরিয়ে আনে প্রত্যয়ের সুদৃঢ় আশ্বাসসমৃদ্ধ ভূমিতে। পুরোনো মধুর স্মৃতি চয়নের মধ্যে কবির কল্পনায় পদচারণা তাঁকে শান্তি দেয়, আনে ক্ষণিকের সান্ত্বনা। তাঁর কাছে পূর্বস্মৃতি বা 'নষ্ট্যালজিয়া'র প্রভাব সেই সময় সুতীব্রভাবে ধরা দেয়। না পাওয়ার যে ব্যথা বা বিরহের শূন্যতা তা নতুন আশ্বাসে তখন সিঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখন কাব্যের সুস্নিগ্ধ প্রেক্ষাপটে কোনো বেদনাই চরম হয়ে ওঠে না। মুখ্যত: এরই জন্যে রোম্যান্টিক কবিরা যৌবনের প্রাচুর্যকে ধরে রাখতে সক্ষম হন তাঁদের সৃষ্টিতে। তাঁদের কাব্যকলায় এই মান-অভিমান, বিরহ-মিলন বাস্তবের তিক্ততা থেকে মুক্তি পায়। অফুরান হয়ে ওঠে কবির সৃষ্টিপ্রবাহ।

'গানের মালা' কাব্যগ্রন্থে যে সব ভিন্‌দেশী গানের সুর কবি মিশ্রিত করেছেন তার মধ্যে যথেষ্ট বৈচিত্র্যের পরিচয় মেলে। প্রসঙ্গতঃ, নজরুলের বিদেশী সুরের জ্ঞানের কথাও এখানে উল্লেখ্য। বিদেশী সুর-সম্পদকে তিনি দেশীয় সঙ্গীতরসে নিষিক্ত করে যে প্রাণমাতানো গীতিগুচ্ছ রচনা করেন তার তুলনা আমাদের সঙ্গীতে মেলা ভার। যেমন, 'রুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ রুম্ ঝুম্ ঝুম্' রচনাটি আরবী সঙ্গীতের সুরকে অবলম্বন করে রচিত। বেদুইন 'আরবী' মেয়েদের মনোরঞ্জনী গানের সুরের প্রভাব এই রচনাটির বৈশিষ্ট্য। একই নিয়মে 'বুলবুলি নীরব নার্গিস বনে' গানটিতে 'নৌরোচকা' জাতীয় গানের সুরকে অনুসরণ করা হয়েছে।

পারস্য সঙ্গীতের 'মোকাম' ও 'গুম্বা' আমাদের দেশে প্রথম দক্ষতার সঙ্গে কবি তাঁর কাব্যে প্রয়োগ করেছিলেন। পারস্য ভাষায় রাগিণীর নাম 'শোভা'। আমীর খসরু প্রবর্তিত কয়েকটি পারস্য দেশীয় সঙ্গীত 'মোকাম'-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নজরুলই তাঁর রচনার মাধ্যমে সম্পন্ন করেছিলেন। 'মোকাম' বলতে আমাদের দেশের সঙ্গীতের প্রচলিত 'ঠাট'-এর প্রতিরূপকেই বোঝায়। তাঁর গানে এই সব ঠাটের ব্যবহার ও তার সাহায্যে নবরাগের রূপায়ণ নজরুলের গানে সবিশেষ সার্থকতা লাভ করেছিল। তাঁর গানে অনুরূপ 'মোকাম'-এর মধ্যে রিহাবি, হোসেনী, বাষ্টহিজাজ, বুজুগু, কো[illegible], ইরাখ, ইস্‌ফাহান, লুবা, ওস্বাখ্, জংগুলা, বসুলিখ উল্লেখযোগ্য। রাগসঙ্গীতে উৎসাহী নজরুল আরবী সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সুগভীর অধ্যয়ন লাভ করেছিলেন।

এছাড়া নজরুলের রচনায় সর্বপ্রথম মার্চের গান (Marching Song) বা যুদ্ধযাত্রার গান স্থানলাভ করে। তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় 'মার্চ-সঙ' রচনা করেছিলেন। সৈনিক জীবনের অভিজ্ঞতা এর সব রচনায় যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে বলা চলে। ইতিপূর্বে কোনো বাঙালী কবির সৈনিক জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল না। ফলে অভিজ্ঞতার বিনিময়ে তিনি সার্থক মার্চ-সঙ সৃষ্টি করেছিলেন। কবির শ্রেষ্ঠতম বন্ধু মুজফ্‌ফর আহ্‌মদের মতে, নজরুলের সর্বাপেক্ষা বড়ো কৃতিত্ব হোলো বাংলা ভাষায় তাঁর কাব্যের মাধ্যমে তেজোদ্দীপক ভাব বা Militarism-এর সংযোজন।

সামরিক ভাষায় বা Military Codeএ যাকে Tempo-divalse বলে তার সার্থক রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যাবে নজরুলের মার্চ-সঙে, যেমন এই ছন্দে লেখা—

চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণীতল

অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল্‌রে চল্‌রে চল।

আবার Tempo-di-Marcia অনুসরণে লেখা—

টলমল টলমল পদভরে
বীর দল চলে সমরে

এটি Slow March-এর ছন্দের অনুসরণে রচিত।

গানের সুর ও রচনার উৎস বিষয়ক কয়েকটি মতদ্বৈধতা এখনও প্রচলিত আছে। যেমন সুরকার জগৎ ঘটকের মতে, মুর্শিদাবাদের ওস্তাদ মঞ্জু সাহেবের হাল্‌কা সুরের গানের অনুসরণে কবি কয়েকখানি গান রচনা করেছিলেন। এবং আরবী জাতীয় সুরের সন্ধান পেয়েছিলেন ওস্তাদ আবদুস সালামের কাছ থেকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

(১) চমকে চমকে ধীরু ভীরু পায় / পল্লীবালিকা বনপথে যায়।
(২) শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণিবায়
(৩) মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়

অন্যদিকে অনেকের মতে, গ্রামোফোন কোম্পানীতে 'ট্রেনার' হিসেবে যোগদান করায় গ্রামোফোন কোম্পানী নজরুলকে একখানি গ্রামোফোন উপহার দেন এবং সেই সঙ্গে বিদেশী গানের বিশেষ করে উর্দু-আরবীপ্রধান দেশের ১০০ রেকর্ড এনে নজরুলকে তাঁর কাজে সাহায্যের জন্য কোম্পানী দান করেন।*

'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি' রচনাটি সম্পর্কে মতানৈক্য লক্ষ্য করা যায়। উপরোক্ত গানটি একটি মিশরীয় গানের সুরানুসরণে রচিত বলে প্রচলিত আছে। কেউ কেউ এতে কিউবার আঞ্চলিক সুরের অনুপ্রবেশ ঘটেছে বলে মনে করেন। কিন্তু প্রখ্যাত শিল্পী সঙ্গীতসম্রাজ্ঞী ইন্দুবালার ভাষ্যানুযায়ী** প্রায় চল্লিশ বছর আগে ইন্দুবালা এইচ. এম. ভি কোম্পানী থেকে হিন্দী গানের একটি রেকর্ড বাণীবদ্ধ করেছিলেন। গানটির প্রথম দিকের কলিগুলি ছিল নিম্নরূপ—

"শ্যাম গিরিধারী তো সে ক্যাযসে মিলু
তেরি ফুরকত মে তড়প রহি হুঁ
ফুকত হায় তন-মন॥"

(রেকর্ড নং এন. ৬৩৯৫)।

* সাক্ষাৎকার : মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ
** সাক্ষাৎকার : ইন্দুবালা দেবী।

গানখানির সুর ছিল অত্যন্ত মনোহরণকারী এবং তাতে মিশরীয় সুরের প্রাধান্য সহজেই নজরে পড়ে। উপরন্তু এর মিউজিকের উৎকর্ষ ও জনপ্রিয়তা লক্ষ্য করে কিছুকাল পরে 'আহ্ মজলুমান্' ছায়াচিত্রের জন্যে উর্দুতে একই সুরে ইন্দুবালা দ্বিতীয়বার ঐ গানটি বাণীবদ্ধ করেন। হিন্দী গানটির জনপ্রিয়তার ফলেই 'আহ্ মজলুমান্' চিত্রের প্রযোজক গানটিকে উর্দু ভাষায় রূপান্তরিত করতে উৎসাহী হয়েছিলেন। উর্দু গানটি ছিল নিম্নরূপ—

গমকী কাহানী মওলা কিস্‌সে ম্যায় কহুঁ।
দুখকে ভমরমে আন ফসিহুঁ লাগেনা মেরা মন॥
তেরা দামন থাম কে মওলা কহুঁ ম্যায় দুঃখ সুখ কা সে আপনা,
গমকি সারি করত হুঁজারি, দেখত হুঁ সায়ে রাহ তুমহারী,
তুমহারে বিনা ম্যায় তলফ রহি হুঁ উঠা দো চিলমন॥*

যথারীতি সুরের আকর্ষণে উর্দু গানটিও অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। নজরুল স্বয়ং গানটির সুর শুনে আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। তিনি গানটির সুর ও পর্দাকে অপরিবর্তিত রেখে বাংলায় (দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি) এই গানটি লিখেছিলেন। এবং পরবর্তীকালে অনিমা বাদল নামে জনৈক শিল্পীকে দিয়ে প্রথম গানটির রেকর্ড করান। বাংলা গানটি কম্পোজ করার সময় সুরের কোনো মৌলিক পরিবর্তন ঘটেনি।

অন্যদিকে কবির অন্যতম সহযোগী সুরকার-শিল্পী নিতাই ঘটক 'নজরুলগীতির উৎস ও তার পরিণতি' নামক প্রবন্ধে এ সম্পর্কে লিখেছেন—

"একদিন সে যুগের একখানা বিখ্যাত ইংরাজী চলচ্চিত্র 'পেগান লাভ সং' দেখতে গেলাম কবির সঙ্গে। ছবির নায়ক 'র‍্যামন নোভারো'র কণ্ঠে 'কাম টু মি হোয়ার দি মুন বিমস্' গানটি শুনে তিনি পাগল হয়ে গেলেন। গানটি শোনার পর থেকেই প্রথম লাইনের সুরটি সেখানে বসেই গুন গুন করে গাইতে লাগলেন, বাকী ছবিটা আর কবির মন দিয়ে দেখাই হল না। তারপর বাড়ি ফেরার পথে মুখে মুখেই রচনা করলেন, 'দূর দ্বীপবাসিনী চিনি তোমারে চিনি'। কিন্তু এ গানখানি সে সময় শেষ করা হয়নি। কিছুদিন পরে একখানি 'টার্কিশ' রেকর্ড কিনে আনলেন—শিল্পীর নাম যতদূর মনে হচ্ছে 'ইবমপিশা'। 'কাম টু মি' গানখানির সঙ্গে এই গানটির খুব মিল ছিল। এই গানের মিউজিক ও সুরের ছায়ায় 'দূর দ্বীপবাসিনী' এতদিনে শেষ হল। রঞ্জিত রায় মহাশয় আদি রেকর্ড

* ইন্দুবালার সৌজন্যে প্রাপ্ত।

থেকে মিউজিক তুলে নিলেন—,তারপর হিজ মাষ্টারস্ ভয়েসে গানখানি রেকর্ড করানো হল ১৯৩৪ সালে। পরবর্তীকালে ১৯৪৯ সালে পুনরায় আমি ঐ গানখানির আসল সুর ও মিউজিক বজায় রেখে পূরবী দেবীকে দিয়ে কলম্বিয়া রেকর্ডে গাওয়াই। বর্তমানে ফিরোজা বেগম এইচ. এম. ভি-তে আবার ঐ গানখানি গেয়েছেন কিন্তু দেখলাম এঁর মিউজিক এবং সুরের রেণ্ডারিং ভিন্ন প্রকার।"—

(সাপ্তাহিক বসুমতী : দীপাবলী সংখ্যা ১৩৭৭)

'কাম টু মি হোয়ার দি মুন বিমস্' ছবিটি অথবা উল্লিখিত 'টার্কিশ' রেকর্ডটি পেলে এ সম্পর্কে আরও জানার সুযোগ পাওয়া যেত। অপরদিকে ইন্দুবালার কথিত দুটি রেকর্ড এখনও শিল্পীর ব্যক্তিগত সংগ্রহে রক্ষিত আছে। প্রসঙ্গতঃ, 'মোমের পুতুল মমীর দেশের মেয়ে নেচে যায়' গানটির সুরের উৎস সম্পর্কে শ্রীঘটকের মতামত উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, নজরুল মুর্শিদাবাদের আবদুস সালামের কাছ থেকে গৃহীত সুরের অনুসরণে এটি রচনা করেছিলেন। আবদুস সালাম সম্পর্কে এখনও বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি। কিন্তু ইন্দুবালার মতে, নজরুল তাঁর গাওয়া একটি হিন্দী গীত 'বাঁকই রসিলি নঈ পণহারি পনঘট পর—জল ভর নে কো জাউঁ' রেকর্ডটি শুনে উৎসাহিত হয়ে বাংলায় এটি (মোমের পুতুল) রচনা করেন। পূর্বোক্ত উর্দু গান এবং হিন্দী গীত রেকর্ডটি শুনে এই সুরের সাদৃশ্য ও অনুসরণ সম্পর্কে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। হিন্দী গানের রেকর্ডটিও বর্তমানে ইন্দুবালার কাছে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কবির ঘনিষ্ঠ অন্যান্য সহযোগীদের আরো বিস্তৃত আলোকপাত করা উচিত।

যাই হোক, কাব্যিক বিচারে রচনা দুটির স্নিগ্ধতাও সবিশেষ অনুধাবনযোগ্য। কবির রোম্যান্টিক মানসের যে অভিব্যক্তি তাঁকে প্রায়শ:ই দোলা দিত তাঁর স্ফুরণ এই রচনা দুটির ছন্দ-সুষমার মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু সামগ্রিকভাবে এই দুটি গানের 'সিম্ফোনি'র মেজাজটুকু দ্রষ্টব্য। নজরুলের খুব কম রচনাতেই সুরের এমন অর্কেষ্ট্রীয় প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কথা ও সুরে কৌলীন্যে মিলন ঘটার ফলে এমনটি ঘটেছে।

সঙ্গীত রচনার ক্ষেত্রে নজরুলের রচনার মাধ্যমেই বাংলা গান বহু বিচিত্র ভাবের আস্বাদন পেয়েছে। ব্যাখ্যার সুবিধার্থে এই বৈচিত্র্যকে নিম্নলিখিত ভাগে সংজ্ঞায়িত করা যায়। যেমন—.

(১) উজ্জীবনী গান (২) রাগভিত্তিক গান (৩) আঞ্চলিক গান (৪) ইসলামিক গান (৫) শ্যামাসঙ্গীত (৬) হাসির গান (৭) প্রেমসঙ্গীত।

ইসলামী গান বাংলা গানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ অভিনব সংকলন। বলতে গেলে ঐতিহ্যবিহীন এই কাব্যে নজরুলের আশ্চর্য সংযম ও পারদর্শিতার পরিচয় সুপরিস্ফুট। এই গানের মধ্যে ইসলামের ঐতিহ্যের প্রশস্তি কাব্য ও সুরের তন্ময়তায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সামগ্রিকভাবে নজরুলের ইসলামী গানকে দুভাগে ভাগ করা যেতে পারে: (ক) মুসলিম জগতের পুনর্জাগরণ এবং (খ) ধর্মীয় ভক্তিমূলক। মূলতঃ, মুসলিম সমাজের অনগ্রসর অবস্থার প্রতি কবির সহানুভূতি ও ধর্মীয় গোঁড়ামী বা কুসংস্কার-বিরোধী মানসিকতারই ফলে তিনি এ কাজে অগ্রণী হতে পেরেছিলেন। এ কার্যে তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা মুয়াজ্জিনের মতোই যিনি গান বেলালের আজান, যার প্রভাবে জেগে উঠবে সমগ্র মুসলিম গণমানস।

ইসলামী গানের অধিকাংশ রচনাই ভক্তিগীতির অন্তর্ভুক্ত। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হামদ, মর্সিয়া (নাত মর্সিয়া)। হজরত মুহম্মদের আবির্ভাব ও তিরোধান বিষয়ক রচনা। হজ জাকাতের গান এবং নামাজ-ঈদের কথাও অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। বলতে গেলে বাংলা ভাষায় ইসলামী ধর্মের গানে অসাম্প্রদায়িক ভাবধারার প্রচলন নজরুলের রচনার মধ্যেই সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। অধিকাংশ গানে মুসলিম গণমানসের প্রগতি-ভাবনার স্ফুরণ ঘটানোই কবি উদ্দেশ্য ছিল। যে শূন্য। যুক্তিবাদী মননের অনুপস্থিতির সুযোগে সমগ্র সমাজে পরিব্যাপ্ত হয়েছিল তা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্যেই যে এই ধরণের রচনার প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল তা বোঝা যায়। যদিও এই মানসিকতার মূল সুরটি অনেকেই ধরতে পারেননি। তাঁর এই নব-নিরীক্ষার মধ্যে ধর্মীয় সংস্কারপূর্ণ কোনো প্রবণতা প্রাধান্য পায়নি। অথচ ইসলামী গানকে একসময় সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ায় মিলিয়ে নেবার প্রবণতা যথেষ্ট সক্রিয় ছিল। পরবর্তীকালে সেই অবস্থার অনেকখানি পরিবর্তন ঘটে। অবশ্য একথা অনস্বীকার্য যে, মুসলিম জীবনের পারিবারিক ঘটনা, লোকায়ত মানস সঞ্জাত প্রবণতা, ও তাহ্‌জীব-তামুদ্দুনের কথার পাশাপাশি ধর্মীয় রীতিনীতির উল্লেখ থাকায় সাধারণ মুসলমানের কাছে তা ধর্মীয় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। তা ছাড়া স্বল্প সময়ের মধ্যে নজরুলের ইসলামী গান নবজাগরণের প্রত্যাশা জাগাতে পেরেছিল বলেই সে সময় নজরুল অত্যন্ত জনপ্রিয় হতে পেরেছিলেন। সমসাময়িক সামাজিক চেতনার পটভূমিকায় সুর ও বাণীর এই অবদানকে সেদিক থেকে ঐতিহাসিক বলা চলে।

ধর্মীয় কাব্যগীতির মধ্যে 'জুলফিকার' (১৯৩২)-এর চব্বিশটি গান মূলতঃ

অতীতের ঐতিহ্য প্রশস্তিতে পরিপূর্ণ। সেই প্রশস্তি কবির সৃষ্ট মার্চের সুরের মধ্যে যেমন 'ভুলি গ্লানি লাজ জেগেছে হেজাজ'-এর আহ্বান-মুখরিত তেমনি 'পিলু'র স্নিগ্ধতা একাত্ম হয়ে উঠেছে নিম্নলিখিত চরণে :

আজ ভুলে গিয়ে দোস্ত-দুশমন হাত মিলাও হাতে,
তোর প্রেম দিয়ে কর বিশ্ব নিখিল ইসলামে মুরীদ।

'জুলফিকার' কাব্যেও সাম্যের প্রশস্তি এবং প্রার্থনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। ধর্মীয় নির্দেশের মূলে যে মানবতার আহ্বান আকাঙ্ক্ষিত তারই প্রকাশ এই কাব্যগীতির বিভিন্ন রচনায়।

পাঠাও বেহেশ্ ত হতে, হজরত্ পুনঃ সাম্যের বাণী,
(আর) দেখিতে পারি না মানুষে মানুষে এই হীন হানাহানি ॥

নজরুলের ইসলাম বিষয়ক প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জিঞ্জীর' এর প্রকাশকাল ১৩৩৫, ইং ১৯২৮। এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১৬টি কবিতায় ইসলামধর্মের বিভিন্ন উৎসব ও অনুষ্ঠান বিষয়ক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। কবিতার নামকরণ থেকেই এর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। যথা, ঈদ মোবারব, সুব্ হ্-উম্মেদ (পূর্বাশা), উমর ফারুক প্রভৃতি। ঢাকায় অনুষ্ঠিত (১৯২৭) মুসলিম সাহিত্য সমাজের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আমন্ত্রিত কবি 'খোশ-আম্‌দেদ' (অর্থাৎ স্বাগত) নামে কবিতাটি (পদ্মার বুকে স্টীমারে বসে লেখা, ফেব্রুয়ারী ১৯২৭) সংগীত হিসেবে পরিবেশন করেছিলেন। 'জিঞ্জীর'-এর অধিকাংশ কবিতা (একমাত্র 'খোশ-আম্‌দেদ' বাদে) প্রধানতঃ কৃষ্ণনগর, কলকাতা ও হুগলীতে থাকাকালীন রচিত। লক্ষণীয় যে, এই গ্রন্থের কবিতাবলীর মধ্যে ধর্মীয় সেবকদের গৌরবপূর্ণ আত্মত্যাগের মহানুভবতার পাশাপাশি প্রেমের রূপ বর্ণনাব প্রতি উৎসাহ কবির মনে প্রাধান্যলাভ করেছে।

বর্ণনাগত :

লালা-ফুল সম দাগ-খাওয়া দিল্, নার্গিস-ফুলী আঁখ,
ইস্পাহানীর হেনা-মাখা হাত, পাত্‌লি পাত্‌লি কাঁখ।
নৈশাপুরের গুল্‌বদনীর চিবুক গালের টোল,
রাঙা লেড়কির ভাঙা ভাঙা হাসি, শিরীন্ শিরীন্ বোল।

(বার্ষিক সওগাত)

উজ্জীবনী :

জাগে দুর্বল, জাগে ক্ষুধা-ক্ষীণ,
জাগিছে কৃষাণ ধুলায়-মলিন,

জাগে গৃহহীন, জাগে পরাধীন,
জাগে মজলুম বদ্-নসীব।
(নকীব)

রোম্যাণ্টিক :

আঁখির নিক্তি করিছে ওজন প্রেম দেদার
ভার কাহার অশ্রু-হার।
চোখে চোখে আজ চেনাচেনি,
বিনি মূলে আজ কেনাকেনি,
নিকাশ করিয়া লেনালেনি
'ফাজিল' কিছুতে কমে না আর।
(নওরোজ)

কবির আকাঙ্ক্ষিত আন্তর্জাতিকতার ভাবনা এই কাব্যগ্রন্থেও যথেষ্ট পরিমাণে সোচ্চারিত। সমগ্র বিশ্বের মুক্তিপাগল মানুষের সঙ্গে কবির আত্মিক বন্ধনের পরিচয় এই কাব্যগ্রন্থের বিশেষ করে 'অগ্রপথিক' নামক কবিতায় সুপরিস্ফুট। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে নজরুলের পূর্বে আন্তর্জাতিক ভাবনার বিচারে বাংলা কবিতার সীমানা এত অধিক পরিমাণে অন্য কারো রচনায় বিস্তৃত হয়নি। মূলতঃ, তাঁরই রচনায় দেশ-কালের সীমাকে অতিক্রম করে কবি আবিষ্কার করেছিলেন বিশ্বমানবতা তথা আন্তর্জাতিকতার ভাববাহী প্রচ্ছন্ন এক স্বদেশ। কবি নির্দ্বিধায় তাই লিখেছেন,

আয়র্ল্যাণ্ড, আরব, মিসর, কোরিয়া, চীন,
নরওয়ে, স্পেন, রাশিয়া—সবার ধারি গো ঋণ।
সবার রক্তে মোদের লোহুর আভাস পাই,
এক বেদনার 'কমরেড' ভাই মোরা সবাই।
(অগ্রপথিক)

বস্তুতঃ, ইসলামধর্মের প্রচলিত বীরত্বগাথাকে অবলম্বন করে নজরুলের 'জিঞ্জীর' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতা রচিত হলেও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমভাবনার প্রভাব এড়িয়ে যাওয়া কবির পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাই এই কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত শেষদিকের কবিতাগুলির মধ্যে কবির রোম্যাণ্টিক চেতনা অত্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেছে। দীর্ঘতম কবিতা 'উমর ফারুক' নামক কবিতার শেষ চরণে বলা হয়েছে—

মৃত্যুর হাতে মরিতে চাহিনা, মানুষের প্রিয় করে
আঘাত খাইয়া যেন গো আমার শেষ নিঃশ্বাস পড়ে।

পাশাপাশি 'এ মোর অহঙ্কার' কবিতার মধ্যে তাঁর প্রেম-ভাবনার যথাযথ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কবির হতাশা এই কবিতায় তাঁর আত্মসন্তুষ্টির কাছে হার মেনেছে। রোম্যান্টিক মানসের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের টানে কবি তাঁর ভাবনায় বিজয়ীর প্রয়াস ব্যক্ত করেছেন। তাই কবির মতে,

নাই বা পেলাম কণ্ঠে আমার তোমার কণ্ঠহার,
তোমায় আমি করব সৃজন এ মোর অহঙ্কার !
এই ত আমার চোখের জলে,
আমার গানে সুরের ছলে,
কাব্যে আমার, আমার ভাষায়, আমার বেদনায়,
নিত্যকালের প্রিয়া আমার ডাকছ ইসারায়।...
বলিয়া পাঠাও, হে হজরত,
যাহারা তোমার প্রিয় উম্মত্,
সকল মানুষে বাসে তারা ভালো খোদার সৃষ্টি জানি'।
সবারে খোদারই সৃষ্টি জানি' ॥
আধেক পৃথিবী জানিল ইমান যে উদারতা-গুণে
(তোমার) যে উদারতা-গুণে,
শিখিনি আমরা সে উদারতা, কেবলি গেলাম শুনে
কোরানে হাদিসে কেবলি গেলাম শুনে।
তোমার আদেশ অমান্য করে
লাঞ্ছিত মোরা ত্রিভুবন ভরে,
আতুর মানুষে হেলা করে বলি, আমরা খোদারে মানি' ॥

ধর্মীয় উদারতার স্বীকৃতি কবির রচনায় যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনি কেবলমাত্র পুঁথিগত ধর্মীয় শিক্ষাকেও তিনি আদর্শ বলে মেনে নিতে গররাজী ছিলেন। অবশ্য কোনো কোনো রচনায় কবির ভক্তিরসের চরম প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়। কবির সাধক সত্তার সার্থক চিত্রায়ণ এই জাতীয় রচনায় অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

মোহাম্মদ নাম যতই জপি, ততই মধুর লাগে।
নামে এত মধু থাকে, কে জানিত আগে ॥

(৭নং)

মোহাম্মদ মোর নয়ন-মণি
মোহাম্মদ মোর জপমালা।
ঐ নামে মিটাই পিপাসা
... ...
আমার হৃদয়-মদিনাতে
শুনি ও নাম দিনে রাতে

ও নাম আমার অশ্রু চোখের
ব্যথার সাথী শান্তি শোকের,
চাই না বেহেশ্‌ত, যদি ও নাম
বল্‌তে সদাই পাই নিরালা॥

(৯নং)

বনগীতি (২য়)-র উপরোক্ত অংশের অনুরূপ অজস্র উদাহরণ মেলে নজরুল গীতিকাব্যের অন্যান্য রচনায়। এছাড়া 'ইসলামী ডুয়েট' নামে নতুন একটি রীতি নিয়ে কবির প্রয়াস তাঁর কাব্যগ্রন্থে সক্রিয়। প্রয়াসটিতে অভিনবত্ব আছে। কিয়ৎ পরিমাণে গীতিনাট্যের ভঙ্গী-সম্বলিত এই জাতীয় রচনা কবির উদ্দেশ্যের সহায়কই হয়ে উঠেছে। যেমন—

পু॥ (আমি) মুসলিম যুবা, মোর হাতে বাঁধা আলির জুল্‌ফিকার।
স্ত্রী॥ (আমি) মুসলিম নারী জ্বালিয়া চেরাগ ঘুচাই অন্ধকার॥

('বনগীতি' ২য় সংস্করণ দ্রষ্টব্য)

অবশ্য 'জুলফিকার'-এর কোনো কোনো রচনায় কবির ইসলাম-নির্ভরতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। তার ফলে বিষয়বস্তুর আকর্ষণ সেক্ষেত্রে তেমন বর্ধিত হয়নি। যেমন—

আল্লাহ্ আমার প্রভু, আমার নাহি নাহি ভয়।
আমার নবী মোহাম্মদ, যাঁহার তারিফ জগৎময়॥
আমার কিসের শঙ্কা,
কোরআন আমার ডঙ্কা,
ইসলাম আমার ধর্ম, মুসলিম আমার পরিচয়॥ (১১নং)

বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় 'জুলফিকার' গ্রন্থের শেষ দিকের রচনাগুলির মধ্যে। বিশেষ করে 'কে এলে মোর ব্যথার গানে' (ঝিঁঝিঁট—খাম্বাজ) ও ঠুংরী চালে গাওয়া 'বুকে না এ বৈকালী ঝড় সন্ধ্যায়' (চিত্রা—

গৌরী) গান দুটিতে কাব্যিক স্নিগ্ধতা অপূর্ব ভাষার লাবণ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে। ধর্মীয রচনার সংকলনে এই রচনা দুটির ভাবগত ঐক্য এক না হলেও কেবলমাত্র কাব্যিক সুষমা ও সুরের মাদকতার গুণেই পাঠকদের অন্তরকে তা রসাপ্লুত করে তোলে।

নজরুলের অধিকাংশ সঙ্গীতধর্মী রচনায প্রধানতঃ দুটি ধাবার সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। একদিকে প্রেম-বিষয়ক বচনায় কবির সচল স্পর্শেন্দ্রিযেব অনুভূতির তীব্রতা, অপবদিকে সুরের অপ্রতিদ্বন্দ্বী পরীক্ষা-নিরীক্ষার সচেতন মানসিকতা। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে কবির ইসলামী গানের বৈশিষ্ট্যটুকু সচেতন পাঠকের নজরে পডতে বাধ্য। এই জাতীয় গানে কবি পূর্বে উল্লিখিত মুসলিম গণ-মানসেব ঐতিহ্য বা গৌরব পুনর্নবীকবণেব পাশাপাশি অতিরিক্ত একটি সম্পদ যুক্ত করেছেন। সুরের ক্ষেত্রে লৌকিক প্রাধান্যই হোলো সেই অতিবিক্ত সম্পদ। এই সম্পদেব গুণেই সাধারণ দেশপ্রেমিক ও ধর্মীয় (ইসলাম প্রিয) যুবমানস ও মুসলিম সমাজকে নতুন ভাবনার পথে কবি টেনে আনতে সক্ষম হযেছিলেন। এরই ফলে অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেকালে নজরুলের ইসলামী গান অভূতপূর্ব জনপ্রিযতা লাভ করেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীব মাঝামাঝি হালিসহর কুমারহট্ট পল্লীব সাধক রামপ্রসাদ সেন সর্বপ্রথম শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। তিনি তাঁব রচিত গানগুলি নিরাসক্ত চিত্তে মূলতঃ সহজ-সরল ভাব ও অনুভূতির বিনিময়ে তাঁর আরাধ্য দেবীকে পরিবেশন করতেন। এই গানের মূল কথা হোলো, বাৎসল্য ও স্নেহার্দ্র ভাব যা কবিহৃদযকে মানবিক রসে সহজেই সিক্ত কবে তোলে। এর মধ্যে পবোক্ষভাবে লুকিয়ে থাকে বেদনা মিশ্রিত মর্মস্পর্শী এক ব্যাকুলতাবোধ। সর্বোপরি রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত বাংলাদেশের পল্লীজীবনের স্নেহ-প্রেম-মমতাপূর্ণ গার্হস্থ্য জীবনের জীবন্ত আলেখ্য হিসেবে বিবেচ্য। সমকালীন ভারতচন্দ্রের বাক্‌চাতুর্যমণ্ডিত নাগরিকসুলভ রচনার পাশাপাশি এই শান্ত-স্নিগ্ধ-রসসমৃদ্ধ 'রামপ্রসাদী গান' সাধারণ মানুষের কাছে এই সারল্যের গুণেই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

রামপ্রসাদের পরবর্তীকালে যাঁরা শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, ঈশ্বর গুপ্ত, গিরিশ ঘোষ, নবীন সেন, দাশরথি রায়, শ্রীধর কথক, রাম বসু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।* অবশ্য এঁদের রচনায় উমার প্রভাবই

* হাজার বছরের বাংলা গান—সম্পাদনা, প্রভাতকুমার গোস্বামী, পৃঃ ২১।

অধিক। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রধানতঃ নজরুলের রচনাতেই শ্যামাসঙ্গীতের সার্থক রূপায়ণ লক্ষ্য করা যায়।

বিভিন্ন কারণে নজরুল রচিত শ্যামাসঙ্গীতকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন বলা চলে। প্রথমতঃ, ইতিপূর্বে কোনো মুসলিম কবির রচনায় এমন সার্থক শ্যামাসঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত হয়নি। দ্বিতীয়তঃ, কবির সমসাময়িক কবিদের মধ্যে একমাত্র নজরুলই এত অধিক সংখ্যক সার্থক শ্যামাসঙ্গীত রচনা করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

সম্প্রতি হেমচন্দ্র সোমের সহায়তায় আবদুল আজীজ্ আল্-আমান নজরুলের ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা শ্যামাসঙ্গীতগুলিকে সংকলিত করে 'রাঙাজবা' (১৯৬৮) নামে সেগুলোকে 'নজরুল রচনাসম্ভার'-এর অন্তর্ভুক্ত করে প্রকাশ করেছেন।* এতে মোট ১০১টি রচনা সংকলিত হয়েছে। 'রাঙাজবা' কাব্য-গ্রন্থের অধিকাংশ রচনায় নজরুলের ভক্তহৃদয়ের আর্তি মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফলে সারল্যের প্রসাদগুণে সেগুলি আজ বাংলা গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। প্রসংগত একটি কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। তা হোলো, কবিকে গ্রামোফোন কোম্পানীতে থাকাকালীন অবস্থায় বিভিন্ন কারণে বিচিত্র চাহিদানুযায়ী গান লিখতে হয়েছে। তা সংখ্যার দিক থেকে যেমন বিরাট তেমনি বৈচিত্র্যপূর্ণ। ফলে একই সময়ে তিনি যুগপৎ ইসলামী গান ও শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ, কবির অসাম্প্রদায়িক মানসিকতার পরিচয় এই ধরণের রচনায় সুপরিস্ফুট। কেউ কেউ এই রচনাগুলির পশ্চাতে কেবলমাত্র কবির ব্যক্তিগত জীবনের অভাবপ্রসূত কারণ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হয়েছেন।** অপরদিকে কোনো কোনো সমালোচক‡ এই কবিতাগুলির মাধ্যমে একমাত্র কবির সাধক সত্তাটির গুণকীর্তন করতেই উৎসাহী। বস্তুতঃ, নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যায় যে, নজরুলের বিচিত্র প্রয়াসী মনই এই ধরণের বিচিত্রধর্মী রচনায় কবিকে উৎসাহী করে তুলেছিল। ব্যক্তিগত জীবনে একদা কবি যেমন তীব্র অভাবের মুখোমুখী হয়েছিলেন তেমনি ধর্মের প্রতি কৈশোরের

* নজরুল রচনা সম্ভার—সম্পাদনা, আবদুল আজীজ্ আল্-আমান।

** 'সত্যই কি নজরুল শ্যামাসাধক' : (যুগান্তর, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭০)—কামাল হোসেন।

‡ শ্যামাসাধক নজরুল : (যুগান্তর, ২৯শে অক্টোবর, ১৯৭০)—বিভূতিভূষণ রায়।

স্বভাবজাত আসক্তিই পরবর্তীকালে কবিকে অকস্মাৎ প্রভাবিত করেছিল। কবির ব্যক্তিগত জীবনে সাধক বরদাচরণ মজুমদারের প্রভাব কোনোমতেই অস্বীকার করা যায় না। লালগোলা হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বরদাচরণ মজুমদারের সঙ্গে তাঁর পত্র-বিনিময় ও বরদাচরণের লেখা গ্রন্থে* নজরুল লিখিত ভূমিকাটি দেখলেও এর প্রমাণ পাওয়া যাবে। যাই হোক, কবির শ্যামাসঙ্গীত রচনার পেছনে কেবলমাত্র চাহিদা ছাড়াও তাঁর সেই সাধক সত্তার আংশিক প্রভাবও অনস্বীকার্য। অন্যদিকে কবির ইসলামী গান রচনার মূলে কাজ করেছে মূলতঃ কবির মুসলিম গণমানসের প্রতি প্রীতি ও আকর্ষণ। কেবলমাত্র কোনো বিশেষ গায়কের জন্যে অথবা একমাত্র ধর্মীয় উন্মাদনার বশে তিনি কখনোই ইসলামী গান লেখেননি।

শান্ত সুফী ও বাউলপ্রধান গ্রাম চুরুলিয়ায় কবির জন্ম। কৈশোরের প্রারম্ভে উদার সুফী ও বাউল মতবাদের সঙ্গে কবির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। পরবর্তী-কালে খুল্লতাত কবি বজলে করীমের সাহায্যে নজরুল দুই কবি-মহাজনের সংস্পর্শে আসেন। ভাবপ্রবণ কবি নজরুল কৈশোরকালে পলাতক অবস্থায় চণ্ডীদাসের জন্মভূমি নান্নুর ও কেন্দুবিল্বে গমন করেছিলেন এবং জনৈক অঘোরপন্থী সাধকের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর উৎসাহে তারাপীঠ ও বক্রেশ্বর ভ্রমণ সমাপ্ত করেছিলেন। গ্রাম্য লেটোর দলে থাকাকালীন অবস্থায় মাত্র দশ বছর বয়সে রচিত তাঁর একটি অপ্রকাশিত গানে কবির ভক্তিরসের পরিচয় পাওয়া যায়। গানটি নিম্নরূপ :

নিষ্প্রভ এই শশী ॥
তব বদন শশী ॥
বেরোল না হাসি ॥ শশী মুখে ॥
পূরব আকাশ রবি প্রায় সমাগত ॥
কোকিলা ঝঙ্কারে কুহু অবিরত ॥
তব মুখের আভা
যেন বিদ্যুৎ প্রভা ॥
পরিণত লোভা ॥ ক্ষীণালোকে ॥
গুণ গুণ সুরে অলি বসিছে
কমলে ॥

পথ-হারার পথ—বরদাচরণ মজুমদার। (ভূমিকা : নজরুল ইসলাম)*

বিভু গানে মত্ত বিহঙ্গম দলে ॥
তাহে আজ রবে ॥
জীবন সংশয় হবে ॥
বুঝি রইতে হবে ॥ জন্ম দুখে ॥
নজরুল এসলাম বলে ॥
প্রিয়ার চরণ ধরে ॥
দিবা যামিনী মান ভাঙ্গাও পাঁচ
বার করে ॥
মালা তিরিশ ফুলে
পরাও হে তার গলে ॥

কবির ভক্তিরসের কথা স্মরণে রেখেই তাঁর ক্ষেত্রে 'তারাক্ষ্যাপা' ও 'নজরুল ইসলাম' (নজর-আল-ইসলাম অর্থাৎ, আল্লার প্রতি অর্ঘ্য) এবং 'নজর আলী' ইত্যাদি নামকরণ করা হয়েছিল। কবির বিচিত্রধর্মী রচনায় তাই ভক্তিরসের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০ সালের পরে যে সব ভক্তিরসাশ্রিত গান কবি রচনা করেছিলেন তার মধ্যে শ্যামাসঙ্গীতের পরিমাণই উল্লেখযোগ্য। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র বুলবুলের মৃত্যুর আঘাত কবিকে অশান্ত ও বিভ্রান্ত করে তুলেছিল। ফলে সাধক বরদাচরণের উৎসাহে মৃত বুলবুলকে পুনরায় দেখার চেষ্টা ও শ্যামাসঙ্গীত রচনার অত্যধিক আগ্রহ সেই সময়েই যথেষ্ট সক্রিয় হয়ে ওঠে। কবির অধিকাংশ শ্যামাসঙ্গীতের মধ্যে কবির সেই উৎকণ্ঠা, মুক্তিপ্রয়াস ও ভক্তিরসাশ্রিত প্রাবল্যের পরিচয় পাওয়া যায়। একদা কবি লিখেছিলেন—

ধ্যান করি কিসে হে গুরু,
তুমি যোগ শিখাইতে এলে—
কানন পথে শ্যাম যে প্রেম বাণী
মধুকর করে,
(হে গুরু) কি যোগ আমি শিখিব তা ফেলে
তুমি যোগ শিখাইতে এলে।

এই জাতীয় আর্তি কবির রচিত শ্যামাসঙ্গীতে প্রায়শঃই মেলে। কবির এই ব্যাকুলতার বশেই রচনা করেছিলেন—

আর লুকাবি কোথা মা-কালী
(আমার) বিশ্বভুবন আঁধার করে
তোর রূপে মা সব ভোলালি ॥

কবির কোনো কোনো রচনা কালী সাধনার সময়ে রচিত। যেমন—'শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে দেখব আমি' অথবা '(আমার) কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' ইত্যাদি। একদা নজরুল কালী সাধনা ও শ্যামাসঙ্গীত রচনায় কি গভীরভাবে মেতে উঠেছিলেন তার প্রমাণ—

"…আমার সেই আনন্দময় শক্তি যদি আবার সমাধিস্থা না হন, আমায় পরম শূন্যে নিয়ে গিয়ে চিরকালের জন্য লয় না করেন—তাহলে এই পৃথিবীতে যে প্রেমের—যে সাম্যের—যে আনন্দের গান গেয়ে যাব—সে গান পৃথিবী বহুকাল শোনেনি। আমার বাঁশী বিরহ যমুনার তীরে ফেলে চলে যাব। শুষ্ক যমুনার বালুচর থেকে সেই বেণু কুড়িয়ে যদি অন্য কেউ বাজাতে পারেন, আমার ফেলে যাওয়া বাঁশী ধন্য হবে।…যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্যমধুর রূপদর্শন করেছি—তিনি যদি আমার সর্ব অস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন, সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা বয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃত-রসধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তাঁর চরণে রাসনৃত্যের ছন্দ জাগে—তাহলে আমি এই বিদ্বেষজর্জরিত কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা ভেদজ্ঞান কলুষিত, অসুন্দর অসুর নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব, এই তৃষিত পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, যে অমৃত, যে আনন্দ, রসধারা থেকে বঞ্চিত—সেই আনন্দ, সেই প্রেম সে আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ্য মাত্র। সেই সাম্য, অভেদ শান্তি, আনন্দ আসবে আমার নিত্য পরম সুন্দর পরম প্রেমময়ের কাছ থেকে।'—নজরুল ইসলাম। (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির সভায় প্রদত্ত ভাষণের অংশ, ১৯৪১।)

সুতরাং এ থেকে কবির সাধক সত্তার রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি তাঁর অন্তরের অন্তিম প্রার্থনা ব্যক্ত করতে গিয়ে লিখেছিলেন—

"মাগো আবার যদি তোমার মায়ায়,
রূপ নিতে হয় নূতন কায়ায়
তোমার প্রকাশ রুদ্ধ যেথায়।
সেথায় যেন না হয় গতি।"

এ থেকেই কবির শাক্ত পূজা সম্পর্কীয় একটা ধারণা পাঠকের মনে জন্মায়। অবশ্য এই প্রসঙ্গে শক্তিসাধনা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা প্রয়োজন।

লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, ভারতীয় তান্ত্রিকতার ইতিহাসে কালীতন্ত্রের একটা বিশিষ্ট স্থান রয়েছে। কালীতন্ত্রের আকারও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পূজার

ইংগিত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও গূঢ়ার্থব্যঞ্জক। মহাকালীর তত্ত্ব ও উপাসনা প্রণালী বর্ণনাই এই তন্ত্রের মূল লক্ষ্য। এই তন্ত্রেই বহুবিখ্যাত দক্ষিণাকালীর 'কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালা বিভূষিতাম' ধ্যানটির বর্ণনা করা হয়েছে। কালীর এই ধ্যানমগ্না মূর্তিই বাংলাদেশের বহুখ্যাত ও সর্বজনপ্রিয় কালীমূর্তি। এই দেবী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা। নজরুল শাক্তভাবের যে গান রচনা করেছিলেন তাও এই ভাবকে কেন্দ্র করেই কল্পিত।

শাক্ত সাধনা সম্পর্কে কিছু ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। অনেকের ধারণা কালীসাধনা হোলো ভোগারতি বা ব্যভিচারের সাধনা। কিন্তু শাক্ত সাধনা হোলো জৈবিক সত্তাকে উন্মীলিত করার সাধনা। সংসার ত্যাগ করার প্রবণতাকে এতে নির্দেশ বলে গ্রহণ করার কোনো কারণ নেই। বরং সংসারে থেকে ভোগ-পঙ্কে পঙ্কজ প্রস্ফুটিত করার কথা এই সাধনায় বলা হয়েছে। বস্তুতঃ, এই তত্ত্বানুযায়ী যে কোনো মানুষ শক্তির সাধনায় অগ্রসর হতে পারে এবং পরম-কৌলের মর্যাদালাভ করতে পারে। এতে জাতবিচারের কোনো বালাই নেই। প্রকৃতপক্ষে এ হোলো সমন্বয়সাধনের সাধনা। সকল আচারের মিলনস্থল বলে এতে কোনো ভেদবুদ্ধি বা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন অনুপস্থিত। সংকীর্ণতারও কোনো স্থান এই তত্ত্বে নেই। নজরুল এই ত[illegible] থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন।

শাক্ত গানের প্রধান বিশেষত্ব হোলো দিব্যভাব। এই ভাব শক্তি উপাসনার চরম ভাব ও সকল দিক থেকেই পরিণতিতে তা শ্রেষ্ঠ। শাক্ত সঙ্গীতের প্রধান ভাগ দুটি : লীলাসঙ্গীত (আগমনী ও বিজয়া) এবং সাধন-সঙ্গীত (মনোদীক্ষা-ভক্তের আকুতি)। এই দুই ভাগকে অবলম্বন করে তার শাখাপ্রশাখা প্রসারিত।

নজরুলের রচনায় এই ভাবগুলির সংমিশ্রণ ঘটেছে। এছাড়া নজরুলের শ্যামাসঙ্গীত রচনার মূলে ছিল তাঁর অন্তঃস্থিত সমন্বয় সাধনের প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির বশেই একই সঙ্গে তিনি শাক্ত সঙ্গীত ও ইসলামী সঙ্গীত রচনায় উৎসাহী হয়েছিলেন। একদিকে শাক্ত সঙ্গীতের অন্তঃস্থিত আবেগ, অপরদিকে ইসলামী সঙ্গীতের প্রেরণা—এই দুইয়ের আকর্ষণ তিনি অস্বীকার করতে পারেননি। বস্তুতঃ, নজরুলের এই জাতীয় রচনায় পরমেশ্বরীর উপাসনাও যোগ্যরূপ সম্পর্কে অর্থাৎ স্থূল. সূক্ষ্ম ও পর এই তিনটির যথাযথ ভাব-রসাশ্রিত বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে।

নজরুলের শ্যামাবিষয়ক রচনার মধ্যে মোটামুটি চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—(১) জগজ্জননীর রূপ পর্যায়ে বর্ণনাপ্রধান রচনা, (২) মায়ের লীলা

মাহাত্ম্যপ্রধান রচনা, (৩) ভক্তের আকুতি ও সমর্পণ বাসনা, (৪) দেবীর ধর্মীয় দর্শন এবং আধ্যাত্মিক কল্পনা বা আরাধনা।

রূপবিষয়ক : (তোর) কালো রূপে মাগো অখিল বিশ্ব নিমগন॥
আঁধার নিশীথ সে যেন তোর কালো রূপের ধ্যান
(তোর) গহন কালোয় গাহন করে পুড়ায় ধরার প্রাণ॥

লীলামাহাত্ম্য :

মাগো আজো বেঁচে আছি তোরি প্রসাদ পেয়ে।
তোর দয়ায় মা অন্নপূর্ণা তোরই অন্ন খেয়ে॥
কবে কখন খেলার ছলে
ডেকে ছিলাম শ্যামা বলে
সেই পুণ্যে ধন্য আমি
আজ তোর নাম গেয়ে॥

আকুতি : আমার হৃদয় অধিক রাঙা মাগো
রাঙা জবার চেয়ে।
আমি সেই জবাতে ভবানী তোর
চরণ দিলাম ছেয়ে॥
মোর বেদনার বেদীর পরে
বিগ্রহ তোর রাখব ধরে
পাষাণ-দেউলে সাজে না তোর
আদরিণী মেয়ে॥

আধ্যাত্মিকতা : সপ্তস্বর্গ সপ্ত পাতাল স্তব্ধ হয়ে উঠল নেয়ে
সাত্বিকী মোর জগন্মাতার জ্যোতির্স্বধার প্রসাদ পেয়ে
নৃত্যময়ী শব্দময়ী কালী
এল শান্ত কল্যাণ-দীপ জ্বালি
দেখ্‌রে পরমাত্মার সব
জননী সে জ্যোতির্ম্মতী॥

এইভাবে এই ধরণের রচনায় কবির সমর্পিত হৃদয়ের ব্যাকুলতাটি চমৎকার-ভাবে ফুটে উঠেছে। বস্তুতঃ, পরবর্তীকালে কবির আধ্যাত্মিকতার প্রতি আকর্ষণজাত কল্পনার রূপায়ণ ঘটেছে এই জাতীয় কবিতার মধ্যে। সাধক শিল্পীর আর্তিই এই কবিতাগুলির প্রাণস্বরূপ।

প্রসঙ্গতঃ, নজরুল গীতি সম্পর্কে প্রচলিত কয়েকটি বিভ্রান্তির কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। কবির সৃষ্টিশীল মননস্থলভতার ফলে রচনার প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। সে সব রচনা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের অনুরোধে রচিত। কিন্তু তাঁর নির্দিষ্ট কোন সহকারী ছিল না। ফলে কবির রচনা হাতছাড়া হয়ে গেলে তার আর কোনো হিসেব থাকত না। এ সম্পর্কে তাই সম্প্রতি বিভিন্ন প্রকারের বিভ্রান্তি ঘটছে। অন্যান্য গীতিকারের রচনা নজরুল গীতি হিসেবে বিশিষ্ট শিল্পীরা বেতারে পরিবেশন করছেন। এ নিয়ে কিছু কিছু প্রতিবাদ বিভিন্ন মহল থেকে উঠেছে। নিতাই ঘটক 'নজরুল গীতির উৎস ও তাঁর পরিণতি' শীর্ষক নিবন্ধে এ প্রসঙ্গে একটি মনোজ্ঞ আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।* তাঁর মতে, 'চৈতী রাতের উদাস হাওয়ায় পরাণ আমার কাঁদে গো' গানটি জগৎ ঘটকের স্বরলিপিকৃত এবং রমেন্দু দত্তের লেখা। অথচ এটি নজরুল গীতি হিসেবে গাওয়া হয়। এছাড়া, 'ফিরিয়া ডেকো না মহুয়া বনের পাখী' গানটি, যা নজরুল গীতি বলে প্রচলিত সেটি আসলে রচনা করেছিলেন কবি প্রণব রায়; সুরকার কমল দাশগুপ্ত, যদিও শিল্পীরা এখনও অজ্ঞানতাবশতঃ এটিকে নজরুল গীতি বলে পরিবেশন করেন। উপরন্তু কোনো কোনো শিল্পী জ্ঞান গোস্বামীর বিখ্যাত গান 'আজি নিঝুম রাতে কে বাঁশী বাজায়'কেও নজরুল গীতি ভেবেই পরিবেশন করেন।

নজরুলের রচিত গানে যাঁরা সুর দিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানতঃ সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, উমাপদ ভট্টাচার্য, ধীরেন দাস, কমল দাশগুপ্ত, ও নিতাই ঘটক এবং জগৎ ঘটক অন্যতম।

বর্তমানে নজরুল রচিত অথচ তাঁদের সুরারোপিত গানকে 'নজরুল গীতি' বলে মেনে নিতে অনেকেরই আপত্তি দেখা যায়। অবশ্য কেবলমাত্র নজরুলের রচিত ও সুরারোপিত গানকে নজরুল গীতি বলতে গেলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধাও দেখা দিতে পারে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ও অতুলপ্রসাদের রচিত গানেও অনেকে সুর দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলি যথাক্রমে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' ও 'অতুলপ্রসাদের গান' হিসেবেই স্বীকৃত ও প্রচলিত। সুতরাং নজরুলের ক্ষেত্রেও কেবলমাত্র রচনার দৃষ্টিকোণ থেকেই এই প্রচলিত প্রথাকে মেনে নেওয়া ভিন্ন উপায় নেই। অবশ্য তাই বলে সুরকারের নামোল্লেখ করার গুরুত্বও অস্বীকার করা

* নজরুল গীতির উৎস ও তার পরিণতি—নিতাই ঘটক। (সাপ্তাহিক বসুমতী, দেওয়ালী সংখ্যা, ১৩৭৭)।

যায় না। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরাদেবী, শান্তিদেব ঘোষ, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অনেক গানে সুরারোপ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র রচয়িতার নামানুযায়ী সেগুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যাই হোক, রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়েও যেমন বাণীবদ্ধ করার সময় (recording) সুরকারের নাম থাকে এক্ষেত্রে নজরুলের বেলায়ও সেটি করলে সম্ভবতঃ সমস্যাটির অনেকাংশে মোকাবিলা করা সহজ হবে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হাস্যরস ঃ কৌতুক ও ছড়াগান

হাস্যরসাশ্রিত কাব্যগ্রন্থ 'চন্দ্রবিন্দু'র প্রথম প্রকাশ ১৯৩০ খৃঃ (১৩৩৭)। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটিকে সে সময় নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং সমস্ত কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। পরে ১৯৪৫ খৃঃ ১৩ই ডিসেম্বর সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়। পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমদ্দাঠাকুর—শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র পণ্ডিত মহাশয়ের শ্রীচরণকমলে 'নিবেদিত' কাব্যগ্রন্থটি উৎসর্গ করতে গিয়ে নজরুল লিখেছিলেন—

হে হাসির অবতার।
লহ গো চরণে ভক্তি-প্রণত কবির নমস্কার।

'হাসির অবতার' শরচ্চন্দ্র পণ্ডিতকে নিবেদিত 'চন্দ্রবিন্দু' গ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই 'জয়তী' পত্রিকায় প্রকাশিত। মন্মথ রায় রচিত মঞ্চাভিনীত 'কারাগার' নাটকে দুটি রচনা গান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া 'জাগো হে রুদ্র জাগো রুদ্রাণী' গানটিও 'প্রলয়শিখা' কাব্যে ইতিপূর্বে গান হিসেবে প্রকাশিত। 'চন্দ্রবিন্দু' থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হবার পর এর দ্বিতীয় মুদ্রণের (১৯৪৫) প্রথম পর্বে ৪৩টি রচনা এবং দ্বিতীয় পর্বে 'কমিক গান' শীর্ষক সূচীতে ১৭টি রচনা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে হাস্যরসাশ্রিত রচনার অভাব সত্ত্বেও বিংশ শতাব্দীতে দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলই এইদিকে দৃষ্টিদান করেছিলেন। তুলনামূলকভাবে গদ্যে হাস্যরসের প্রভাব অনেক বেশী। স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে অবশ্য এই শতাব্দীতে বিভিন্ন সময়ে অজ্ঞাত ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত কবির রচনায় ব্যঙ্গবিদ্রূপ মিশ্রিত রচনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু হাসির গান বা রচনার ক্ষেত্রে দ্বিজেন্দ্রলাল ও নজরুলই ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়।

নজরুলের হাস্যরসাশ্রিত কাব্য সম্পর্কীয় আলোচনার পূর্বে হাস্যরসের প্রকৃতি কিঞ্চিৎ অনুধাবন করা প্রয়োজন। বিদগ্ধ সমালোচক ডঃ অজিতকুমার ঘোষের মতে—

"পাশ্চাত্য সাহিত্যে হাস্যরসের চুলচেরা বিশ্লেষণ হইয়াছে এবং নানাপ্রকার হাস্যরস ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে হাস্যরস অদ্বিতীয় এবং অনন্যনামা। সুতরাং আমাদিগকে অনেক সময়েই পাশ্চাত্য নাম ব্যবহার

করিতে হইবে।" ফলে তিনি হাস্যরসের প্রকৃতিকে যথাক্রমে humour (করুণ হাস্যরস), wit (বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরস) ও satire (ব্যঙ্গরস)-এ ভাগ করে নিয়েছেন। নজরুলের রচনায় এই তিনটি রসের প্রভাব বর্তমান আলোচনার বিষয়বস্তু।

Humour বা করুণ হাস্যরসকে প্রধানতঃ বিশুদ্ধ হাস্যরস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এতে রচয়িতার সজাগ অনুভূতি এবং সক্রিয়তার ফলে পাঠকমনে তার প্রভাব স্থায়ী ও সুদূরপ্রসারী হয়ে থাকে। উপরন্তু humour-এর সুগভীর বেদনা পাঠকের অন্তরকে সুতীব্রভাবে বিদ্ধ করে। অর্থাৎ সমাজের বিভিন্ন দিকের দোষত্রুটি কবির রচনাগুণে স্নিগ্ধ এবং অনুকম্পা্য হয়ে ওঠে। নজরুলের হাস্যরসের মধ্যে humour-এর মৌলিক লক্ষণগুলি বর্তমান। কবি তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার আলোতে জীবনকে অনুভব করতে চেয়েছিলেন বলেই সামাজিক স্তরের বিকৃতি, ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে পেরেছিলেন। আর এরই ফলে তাঁর হাস্যরসাশ্রিত রচনার মধ্যে কবিতার রসাভাব বর্তমান। অবশ্য হাস্যরস স্রষ্টাকে সর্বপ্রকার মত ও দলের ঊর্ধ্বে অবস্থান করা যে প্রয়োজন কবির প্রথম পর্বের রচনাকালে তার সমর্থন মেলে না। বরং, বিপরীতপক্ষে, এই পর্বের রচনায় তিনি সরাসরি শোষিত মানব সমাজের পক্ষকেই সমর্থন করেছিলেন। কোনো বিশিষ্ট মতবাদ তাঁর রচনায় তেমন উগ্রভাবে প্রকাশিত না "হলেও বিপ্লবের প্রচ্ছন্ন ঘোষণা তাতে কখনোই অনুপস্থিত ছিল না।

কিন্তু wit-এর তীব্র চকিত স্পর্শ তাঁর রচনায় মেলে। সেখানে কবি সচেতন ও মননশীল। ফলে এর মাধ্যমে নজরুল জীবনের গভীর ও মৌলিক সমস্যাগুলির সামগ্রিকতাকে কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। বস্তুতঃ, এরই জন্যে নজরুলকে এই জাতীয় রচনায় তীব্র, তীক্ষ্ণ ও বিরুদ্ধধর্মী বাক্যের সংমিশ্রণ ঘটাতে হয়েছে। এর আবেদন বুদ্ধির ক্ষুরধার প্রত্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ডঃ ঘোষের মতে, "দৃশ্যমান বস্তুর সহিত অদৃশ্য বস্তুর বৈষম্য লইয়া উইট-এর কারবার। আপাতদৃষ্টিতে বিরুদ্ধ অথচ প্রকৃতপক্ষে বিরুদ্ধ নয়, আবার আপাত-দৃষ্টিতে বিরোধপূর্ণ অথচ বাস্তবিকপক্ষে ঐক্যমূলক—বাহিরের আকৃতির সহিত ভিতরের প্রকৃতির এই যে বৈষম্য, ইহাই উইট-এর জগৎ।"* নজরুলের

* "Humour is the laughter of the accentric directed against himself."...A. Nicoll (The Theory of Drama), P. 99.

Humour is sympathy with the seamy side of things.—Carlyle. (বঙ্গসাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, পৃঃ ৩৯।)

কবিতায় উপরোক্ত সংজ্ঞার চিহ্নগুলি কমবেশী বর্তমান। Wit বা বৈদগ্ধ্যপূর্ণ হাস্যরসেব সজ্ঞায়িত অর্থের বৈপরীত্য নজরুলের কবিতায় তেমন সুস্পষ্ট নয়। সামগ্রিকভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা কবিতায় হাস্যরসের স্রোতটি কখনোই জোয়ারের তীব্রতায় চঞ্চল হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নজরুলের সমসাময়িক কবিদের রচনায় যে সামান্য হাস্যরসের সাক্ষাৎ মেলে তার মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদের প্রাধান্য যেমন অনুপস্থিত তেমনি সামাজিক বোধ তথা wit-এর বিশ্লেষণধর্মী মননপ্রিয়তার অভাবও সকলের নজরে পড়ে। 'কল্লোল' যুগের নব নিরীক্ষার মধ্যে হাস্যরসের স্রোতটি একান্তভাবেই ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। পাশ্চাত্যের নবতর ভাবনা এবং বাস্তবধর্মী চিন্তার প্রভাবে সমসাময়িক কাব্যে যে ভাঙাগড়ার পর্ব চলেছিল। তাতে হাস্যরসের ধারাটি যথার্থ গুরুত্ব লাভ করেনি। ফলে নজরুলের কাব্য পূর্বসূরীর প্রসাদ লাভে বঞ্চিত ছিল। স্বভাবতঃই wit-এর বুদ্ধিদীপ্ত সচেতনতাব অভাব এই পর্বে হাস্যরসের ট্রাজেডিকেই সূচিত করে।

হাস্যরসের তৃতীয এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রচলিত ও জনপ্রিয় বিভাগ satire বা ব্যঙ্গবসের প্রভাব নজরুলের কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। ব্যঙ্গের হাসি নিষ্ঠুর বলেই সাধারণতঃ ব্যঙ্গকারকে একাধারে কঠোর এবং অন্যদিকে অভীষ্টপথে নির্মমভাবে এগিযে যেতে হয়। কিন্তু satire-এর মাধ্যমে নজরুলের কাব্যে চিত্রিত সমাজের সমস্ত দোষ, ত্রুটি এবং অসঙ্গতি অনাবৃত হলেও তিনি প্রকৃতিগত অবিভিন্নতার গুণেই কখনোই তেমন নির্মম হতে পারেননি। বরং তাঁর ব্যঙ্গরসের মধ্যে কৌতুকের মেজাজটি নিরন্তর প্রচ্ছন্ন ছিল। ব্যঙ্গকারের যে মৌলিক উদ্দেশ্য অর্থাৎ সমাজকে শোধন করা বা ত্রুটিমুক্ত করা তা থেকে কবি পিছিয়ে থাকেননি। তবু এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে, নজরুলের হাস্যরস প্রধানতঃ সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে নিয়োজিত কবিতাগুলির মধ্যেই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। সমসাময়িক রাজনৈতিক ঘটনাসমূহকে তিনি কবিতার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করে হাস্যরসের চর্চা করেছিলেন। ফলে একদিকে রাজরোষকে বেপরোয়াভাবে অগ্রাহ্য করার প্রবণতা কবির ব্যঙ্গরসাত্মক কবিতাকে যেমন দীপ্ত করে তুলতে সাহায্য করেছে অপরদিকে তেমনি হাস্য-রসাশ্রিত বিষয়বস্তুর প্রসাদগুণে তা পাঠকের কাছেও আকর্ষনীয় হয়ে উঠেছে।

বলতে গেলে নজরুল সর্বাপেক্ষা সাফল্যলাভ করেছেন তাঁর হাস্যরসাশ্রিত কবিতায় কৌতুক রসের প্রবর্তনে। Fun বা কৌতুকরসের মাধ্যমেই কবি পাঠকের সঙ্গে সর্বাপেক্ষা অধিক একাত্মতা লাভের সুযোগ পান। কৌতুকের মধ্যে আনন্দই একমাত্র লক্ষ্য। ভাবনার নিগূঢ় ব্যঞ্জনা সে ক্ষেত্রে অনুপস্থিত

থাকে। অবশ্য নজরুলের হাস্যরসাশ্রিত কবিতা মূলতঃ কৌতুকরসেরই প্রতিনিধি। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, fun বলতে আমরা নিরবচ্ছিন্ন হাসির যে প্রসন্ন প্রবাহকে বুঝি কবির কাব্যের ক্ষেত্রে তার যথাযথ অনুকরণ ঘটেনি। বরং, নজরুলের কবিতায় একটি উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে সক্রিয় ছিল। ফলে তাঁর রচনা পরিপূর্ণভাবে বিশেষ কোনো একটি সংজ্ঞায় রূপলাভ করতে পারেনি। হাস্যরস তাঁর ক্ষেত্রে বরং একটি মাধ্যমের মতই ব্যবহৃত হয়েছে। লক্ষণীয় যে হাস্যরসের ক্ষেত্রেও নজরুল প্রাত্যহিক জীবনের অতি পরিচিত শব্দ যা কাব্যে কখনো তেমন ব্যবহৃত হয়নি তার ব্যবহার করেছেন। সম্ভবতঃ হাস্যরসের মাধ্যমে পরিচিত অনুভূতির সংমিশ্রণ ঘটিয়ে কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় উৎসাহী হয়েছিলেন। এই কাব্যগ্রন্থে প্রথম পর্যায়ের অধিকাংশ রচনায় ভক্তিভাবের আধিক্য ঘটেছে। ফলে তাঁর অধিকাংশ কবিতায় গীতিধর্মী ঋজুতার প্রাধান্য, এবং তা বাউল ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়েছে বলা যায়। অর্থাৎ, এইগুলি তাঁর কাব্যগ্রন্থের বৈশিষ্ট্যকেই সূচিত করেছে। পাশাপাশি দেবতার উদ্দেশে কবির ব্যাকুল আহ্বানের মধ্যে কবির মৌলিক সত্তার সন্ধান মেলে। কবিকণ্ঠের সেই ব্যাকুলতা তাঁর রচনায় প্রকাশিত :

শৃঙ্খলে বাজে তব সম্বোধনী,
কারায় কারায় জাগে তব শরণি,
বিশ্ব মূক ভীত, কহো গো কথা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥
নিশিদিন শোনে নিপীড়িতা ধরণী
অশ্রুতে অশ্রুত শঙ্খধ্বনি।
পঙ্গু রুগ্ন নর অত্যাচারে
ধর্ষিতা নারী কাঁদে দৈত্যাগারে,
জাগো পাষাণ, ভাঙো নীরবতা।
জাগো দেবতা, জাগো দেবতা॥

(হাম্বীর কাওয়ালী, ১১নং 'চন্দ্রবিন্দু')

'চন্দ্রবিন্দু'র কবিতার মধ্যে বিচিত্র ভাবনার বৈচিত্র্যটুকু পাঠকের নজর এড়ায় না। পরপর তিনটি কবিতার মাধ্যমে এর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমনি—

(ক) হত্যায় আসে হত্যা-নাশন
শৃঙ্খলে তাঁর মুক্তি-ভাষণ,

অন্ধ কারায় তমো-বিদারণ
জাগিছে জ্যোতির্ময় (১৫ নং)

(খ) কহে বায়, রজনী-ভোরে
বাসি ফুল পড়িবে ঝরে'
কহে ফুল, "এমনি কয়ে আমি ফুল-চোরেরে দলি
এমনি কুসুম-চোরেরে দলি ।। (২০ নং)

(গ) চন্দন-গন্ধিতে মন্দ দখিনা-বায়
নন্দন-বাণী ফুলে ফুলে কয়ে যায়,
তনু-মন জাগে রাঙা অনুরাগে,
মনে জাগে আজ বাসর জাগরণ।
আজি মাধবী-বাসর জাগরণ ॥ (২৭নং)

লক্ষণীয় যে এই তিনটি কবিতার ভাববস্তু বিষয়গত দিক থেকে পরস্পর পৃথক। কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির রচনায় মাধুর্যশৈলী তিনটি অংশেই বর্তমান।

অন্যদিকে, দ্বিতীয় পর্যায়ের 'কমিক গান' অংশে সম্পূর্ণ পৃথক ভাবনা বা চিন্তার রূপায়ণ ঘটেছে। সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক ঘটনা সমৃদ্ধ বিষয়বস্তুকে হাস্যকৌতুকের ঢঙে কবি কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। বিশেষ করে, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি বিষয়ক সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের প্ররোচিত চুক্তি, লীগ অব নেশনস্, ডোমিনিয়ন স্টেটাস, সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও প্রাথমিক শিক্ষা বিল বিষয়ক ঘটনা অবলম্বনে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে নজরুল প্রধানতঃ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক চক্রের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন বলেই কাব্যগ্রন্থটি তখন বাজেয়াপ্ত করা হয়।

হাস্যরসিক শরচ্চন্দ্রও (দাদাঠাকুর) তাঁর রচনায় কৌতুকের তীক্ষ্ণ শব্দরাশির মাধ্যমে সে সময় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে সুনাম অর্জন করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে শরচ্চন্দ্রের হাস্যরস ও কৌতুকধর্মী মন্তব্য আজও বিস্ময়ের সঞ্চার করে। নজরুলও এই অগ্রজের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' কাব্যগ্রন্থটিকে তাঁর চরণে উৎসর্গ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন।

কৌতুকধর্মী রচনার প্রতি পক্ষপাত কবির বিচিত্রমুখী প্রবণতাকেই সূচিত করে।* অবশ্য বিষয়বস্তুতে অতি পরিচিত ঘটনাবলীর প্রাধান্যে এই

* নজরুলের কণ্ঠে পরিবেশিত স্বরচিত কৌতুক নক্সার রেকর্ড—"প্রীতি উপহার"—His Masters Voice, Record no :—

কবিতাগুলি সে সময় অত্যধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ফলে এই রচনা কবির উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হয়েছে বলা যায়।

'চন্দ্রবিন্দু'র দ্বিতীয় অংশে 'কমিক গান' এর প্রায় সব কবিতাই হাস্যরসে পরিপূর্ণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনীতির প্রভাব পরোক্ষভাবে উঁকি দিয়েছে। যেমন, 'শ্রীচরণ ভরসা' কবিতায় অলসধর্মী মানসিকতার এবং ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদকে ব্যঙ্গরসের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন।

সার্জেন্ট যবে আর্জেন্ট মার হাতে করে আসে তাড়ায়ে,
না হয়ে ক্রুদ্ধ পদ প্রবুদ্ধ সম্মুখে দিই বাড়ায়ে ॥
থাকিতে চরণ মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা।
মরণ-হরণ নিখিল-শরণ জয়, শ্রীচরণ ভরসা ॥
বপু কোলা ব্যাং, রবারের ঠ্যাং, প্রয়োজন মত বাড়ে গো,
সমানে আঁদাড়ে বনে ও বাদাড়ে পগারে পুকুর-পাড়ে গো।

আবার মুসলমান সমাজের মধ্যে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক মোল্লাদের ধর্মীয় ব্যাখ্যার সাম্প্রদায়িক লক্ষণকে 'তৌবা' কবিতায় কৌতুকরসের সাহায্যে ব্যক্ত করেছেন।

আরে আমাদের মত দাড়ি কৈ ওদের ? লাগিলে যুদ্ধ নাড়িবে কি ?
আর উহাদের মত কাছা কোঁচা নাই, ধরিলে মোদের ফাড়িবে কি ?
ছার অস্ত্র লইয়া কি হবে, আমরা বস্ত্র যা পরি থান থানিক,
তাতে তৌবা তৌবা করি যদি, যাবে কামানের গোলা আটকে ঠিক ॥

... ...

মোরা মসজিদে বসি নামাজ পড়ি যে, রক্ষা কি আছে বিধর্মীর ?
ওরা কাফুরের মত যাইবে ফুরায়ে অভিশাপ যদি হানেন পীর।
দ্যাখো পায়জামা চেপে রেখেছি আজিও আমাদের এই পায়ের জোর,
আরে অকাই যদি পেতে হয়—দিব মক্কার পানে সরল দৌড় ॥

হিন্দু-মুসলিম প্যাক্টের পরিণতি এবং তার হোতা সুচতুর ইংরেজ শোষকদের কথা মনে রেখে লেখা 'প্যাক্ট' কবিতাটির বহিরঙ্গ প্রকৃতির দিক থেকে হাস্যরসাশ্রিত হলেও ট্রাজিক রসের মধ্যেই এর সমাপ্তি ঘটেছে। সুচতুর

(1) N 7326 (১ম ও ২য় খণ্ড)
(2) N 7327 (৩য় ও ৪র্থ খণ্ড)
(3) N 7328 (৫ম ও ৬ষ্ঠ খণ্ড)

ইংরেজ শক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির কথা স্মরণে রেখে এই প্যাক্টের সূচনা করেছিলেন। এবং বলা বাহুল্য-এর উদ্দেশ্য কখনোই সাফল্য লাভ করেনি। তাই অকস্মাৎ—

সারা রারা রারা সহসা অদূরে উঠিল হোরির হররা।
শম্ভু ছুটিল বদ্‌না তুলিয়া, ছকু মিঞা নিল ছোররা।

... ...

বদনা-গাড়ুতে পুনঃ ঠোকাঠুকি রোল উঠিল 'হা হন্ত'।
ঊর্ধ্বে থাকিয়া সিঙ্গী মাতুল হাসে ছিরকুটি দন্ত।
মসজিদ পানে ছুটিলেন মিঞা, মন্দির পানে হিন্দু;
আকাশে উঠিল চির-জিজ্ঞাসা,—করুণ চন্দ্রবিন্দু।

শেষ দুটি চরণে এসে কবিতাটির মধ্যে বিষাদের সুরটি ফুটে উঠেছে। ইংরেজ শাসকের 'সিঙ্গী মাতুল' রূপটিও এখানে সুপরিস্ফুট।

'লীগ অব নেশান' কবিতায় বিশ্ব রাজনীতির সামগ্রিক চিত্রটি কবি হাস্যরসের সাহায্যে চিত্রিত করেছেন। কবিতাটি রূপকের সাহায্য নিয়ে রচিত হলেও কবিতার সূচনায় কবি চরিত্রগুলির নাম অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করায় কবির উদ্দেশ্যের প্রতি ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বলতে গেলে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এত সুস্পষ্টভাবে কোনো রাজনৈতিক কবিতা সে সময়ে লেখা হয়নি।

হাঙর কহিল, 'ভালুক মামা যে ক্রমেই আসিছে রুষিয়া'
প্রভু কন, 'আর কটা দিন ব্যাটা বাঁচিবে আমড়া চুষিয়া?'
লড়ালড়ি করে হায়েনা ভালুক দুটোরি ধরিবে হাঁপানি,
ছিনেজোঁক রবে লাগিযা পিছনে, পাশে চিতে বাঘ জাপানি।

বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির অবস্থা ও ভূমিকা সম্পর্কে কবি হাস্যরসের সাহায্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুতঃ, নজরুলের এই জাতীয় কবিতায় ব্যঙ্গরসের প্রাধান্য কবির মৌলিক রসবোধেরই পরিচায়ক।

'ডোমিনিয়ন স্টেটাস' কবিতার মধ্যেও পরাধীন জাতির অসহায় অবস্থাটি ফুটে উঠেছে। কবির মতে,

'মাভৈঃ! এবার স্বাধীন হয়!
যাই বলেছি, পৃষ্ঠে ঠাস।
পড়ল মনে, পীঠস্থান এ,
ডোমিনিয়ন স্টেটাস্!

ডোমিনিয়ন স্টেটাস নিয়ে তৎকালীন নেতৃত্বের মধ্যে মনান্তর একদা তীব্র হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিগতভাবে নজরুল পূর্ণ স্বরাজের পক্ষপাতী ছিলেন।

'দে গরুর গা ধুইয়ে' কবিতার মধ্যে রাজনীতিতে মেয়েদের উজ্জ্বল ভূমিকার পাশাপাশি পুরুষদের কাপুরুষতার প্রতি কবির বিদ্রূপাঘাত প্রকাশ পেয়েছে। স্বরাজ সম্পর্কে তাঁর বিদ্রূপ এইভাবে প্রকাশিত—

সস্তাদরে দস্তা-মোড়া
আসে স্বরাজ বস্তা-পচা,
কেউ বলে না, 'এই যে লেহি'
আসলে 'যুদ্ধ দেহি'র খোঁচা।

তৎকালীন গোলটেবিল বৈঠক নিয়ে দেশে যথেষ্ট উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল। ঐ বৈঠকে ইংরেজ শক্তির অহমিকাপূর্ণ ভূমিকাকে এদেশে অনেকেই মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেননি। নজরুলও এর বিরুদ্ধ মতবাদ পোষণ করতেন। তিনি একে বিদ্রূপ করে লিখেছিলেন,

ব্যাণ্ড বাজে, ইংল্যাণ্ডে ঐ
চলল লিডার্স এণ্ড কোং,
শকুন মাতুল কাল্‌নেমী,—
কণ্ঠে লাউড্-স্পিকার চোং।
(রাউণ্ড-টেবিল-কন্‌ফারেন্স)

নজরুলের বিশ্বাস,

ডিম্-গোলাকার গোল-টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তায় ধাড়ির দল,
তা নয় দিলে ততঃ কিম্?
আন্‌বে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ণ,
অষ্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে॥ (ঐ)

সমসাময়িক সমাজ জীবনে সে সময় একদল মোসাহেব সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। রাজনীতিতেও এই সব মোসাহেবদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ঘৃণ্য। ইংরেজদের পদলেহী একদল মোসাহেবকে উদ্দেশ্য করে 'সাহেব ও মোসাহেব' কবিতাটি রচনা করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ, সুদীর্ঘ কবিতা 'সাইমন-কমিশন'-এর রিপোর্ট-এর কথা উল্লেখ করা যায়। দুটি ভাগে বিভক্ত এই কবিতায় নজরুল

কমিশনের স্বরূপটি হাস্যরসের সাহায্যে তুলে ধরেছেন। অলস যুবসমাজের সম্পর্কে কবির মন্তব্য :

ইস্‌কুলে, প্রেমে, জ্বরে পড়ে পড়ে
জীবন কাটায় ছেলেরা,
মাঝে মাঝে করে ভ্রান্ত শিষ্ট
শান্তে লেনিন ভেলেরা।

'প্রাথমিক শিক্ষা বিল' কবিতায় ভারতবাসীদের কাছে যে মিথ্যে আশ্বাস ইংরেজ কর্তৃপক্ষ বয়ে এনেছিলেন তার অসারতা কবি এই কবিতায় কৌতুকের সুরে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কবির হাস্যরস একাধারে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ মিশ্রিত ভাবের সংমিশ্রণ হলেও কবির কৌতুকবোধটি কখনোই চাপা পড়েনি। সামগ্রিকভাবে হিউমার বা উইট (wit)-এর চেয়ে তাঁর কবিতায় যেন satire বা ব্যঙ্গরস ও কৌতুকেরই (fun) প্রাধান্য।

তবে যেহেতু কবির হাস্যরসাশ্রিত অধিকাংশ রচনাই সাঙ্গীতিক (musical) গুণে সমৃদ্ধ সেই হেতু তাতে humour বা wit-এর প্রত্যয়মিশ্রিত রসবোধের পরিপূর্ণ প্রকাশ না ঘটলেও পাঠকের কাছে তার আবেদন পৌঁছাতে অসুবিধে হয়নি। বলতে গেলে, কবির বহুধা কীর্তির এ এক অনস্বীকার্য দান। মুখ্যতঃ ঈশ্বর গুপ্তের মানস এবং লিখনরীতি বা ব্যঙ্গের মেজাজকে গ্রহণ না করেও নজরুলের হাস্যরস সম্পূর্ণ একক সাফল্যবোধের সূচক হিসেবে চিহ্নিত। মানসিকতার বিচারে কোনো মিল না থাকলেও দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে নজরুলের হাস্যরসের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সংস্কারসুলভ অভিন্নতা পাঠকের নজর এড়ায়নি। এদিক থেকে নজরুল মাইকেল বা রবীন্দ্রনাথ অপেক্ষা ঈশ্বর গুপ্তেরই অধিক আত্মীয় বলে মেনে নেওয়া যায়। সমালোচকের দৃষ্টিতে হাস্যরসের যথাযথ নির্দেশাদি তাঁর কবিতায় প্রতিপালিত না হলেও একদা সময়ের বিচারে তিনি সসম্মানে উত্তীর্ণ। মনেপ্রাণে সম্ভবতঃ কবি হাস্যরসের ক্ষেত্রেও আধুনিক হতে চেয়েছিলেন। এমন কি তাঁর স্বভাবজাত দুর্দমনীয় আবেগ এ ক্ষেত্রে বিশেষ করে তাঁর রাজনৈতিক প্রবণতার সামাজিক প্রতিফলনের অন্বেষণে শেষ পর্যন্ত বাধা হয়ে ওঠেনি। প্রকৃতপক্ষে হাস্যরসের মৌলিক বোধ বা অনুভূতিকে সম্বল করেই হাস্যরসাত্মক কাব্যের জগতে নজরুলের সাফল্য মিশ্রিত জয়যাত্রা।

পাঠকের কাছে এরই দৌলতে তিনি পৌঁছিয়ে দিতে পেরেছিলেন হাস্যরস বা কৌতুকের প্রয়োজনীয় বোধশক্তি।*

অপরদিকে, ছড়াগানের ক্ষেত্রে নজরুল আশ্চর্য সরল এক ভঙ্গীর প্রচলন করেছিলেন। শিশুদের কাছে তাঁর দুটি কাব্যগ্রন্থ 'ঝিঙে ফুল' ও 'সাত ভাই চম্পা' অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অপেক্ষাকৃত স্নিগ্ধ, পেলব ও সহজ গ্রাহ্য শব্দের সাহায্যে কবি সাফল্যের আশ্চর্য প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন এই দুটি কাব্যে। একদা কবি ছোটদের কবিতা লিখেছিলেন নেহাৎ মুহূর্তের আগ্রহাতিশয্যে।** কিন্তু দুঃখের বিষয় বিভিন্ন দিকে কবির ব্যস্ততার ফলে এইদিকের প্রতি সময় দিতে পারেননি কবি। তাই ছড়া গানের ক্ষেত্রে বাংলা কাব্যেরই ক্ষতি বেশী হয়েছে। কেন না, সমসাময়িক রবীন্দ্রনাথ, উপেন্দ্রকিশোর, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ও সুকুমার রায়-এর মতো অল্প কয়েকজনই এদিকে ফিরে তাকিয়েছিলেন। কাজেই শিশুদের ছড়া গানের জগৎ আজও কমবেশী অবহেলিত রয়ে গেছে। অবশ্য পরবর্তীকালে শিশুদের জন্যে নজরুল 'পুতুলের বিয়ে' নামে একটি নাটক লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর অনতিক্রম্য প্রতিভার তুলনায় তা ছিল অতি সামান্য।

বস্তুতঃ, নজরুলের 'শিশু সাহিত্য' সার্বিক বিচারে শিশুদেরই সাহিত্য। বিশেষ করে শিশুদের জন্যে কবি যে সব ছড়াগান রচনা করেছিলেন তার মূল্য অনস্বীকার্য। এদেশে মুসলমান রাজত্বেরও অনেক আগে বাংলা সাহিত্যে যে

* Karl Marx বলেছিলেন, "as music awakens only man's musical sense, and as the finest music has no meaning for an unmusical ear." (সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—বিষ্ণু দে, পৃঃ ৮৯।)

** কুমিল্লার আলী আকবর খান ছোটদের পাঠ্য যে সকল পুস্তক রচনা করেছিলেন সেগুলি ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। বাধ্য হয়ে নজরুল আলী আকবরকে এই ব্যর্থ প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতে অনুরোধ জানালে আলী আকবর পাল্টা নজরুলকে নিজের ক্ষমতার পরিচয় দান করতে চ্যালেঞ্জ জানান। নজরুল সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি শিশুদের উপযোগী ছড়া গান লিখে দেন। বিস্মিত আলী আকবর নজরুলের এই আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে কৌশলে নজরুলকে কুমিল্লায় নিয়ে গিয়েছিলেন। সে সময় কবির সঙ্গে নার্গিস বেগমের পরিচয় হয়। আলী আকবর ছিলেন নার্গিসের ছোট মাতুল।

(সাক্ষাৎকার : মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ)

ছড়া গানের প্রচলন ছিল তার প্রমাণ বর্তমান। দীনেশচন্দ্র সেন সেগুলির কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন, কাঞ্চনমালা, শঙ্খমালা, শীত-বসন্ত ইত্যাদি। সেই সব ছড়ায় প্রাচীন ছড়া ও রূপকথারই প্রাধান্য। পরবর্তীকালে 'ঠাকুরমার ঝুলি' বা 'ঠাকুরদাদার ঝুলি' অনুরূপ ভাবনারই সাহিত্য-প্রকাশ মাত্র। কিন্তু লক্ষণীয় যে, উপেন্দ্রকিশোর ও সুকুমার রায়ের ছড়ায় রূপকথার বক্তব্য সর্বপ্রথম নতুন ভাবনায় উদ্দীপিত হয়েছে। পরবর্তীকালে নজরুলের ছড়ার রূপকথা বাস্তবের স্পর্শে ভিন্ন অর্থবাহী হিসেবেই বিবেচ্য। তাঁর কাব্যে বাস্তবতা শিশু-মানসের পরিণতিকে কল্পনার অস্পষ্ট জগৎ থেকে বাস্তবের দৃঢ় ভূমিতে স্থাপিত করেছে। ফলে বাস্তবতা যেমন ছড়া রচনার ক্ষেত্রে কবির কাছে পরিত্যাজ্য হয়নি তা তেমনি আবার পাশাপাশি কল্পনার স্নিগ্ধ স্পর্শের অভাব কোথাও তীব্র হয়ে ওঠেনি। বরং শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে রূপকথা কাব্য-চিত্রণের মাধ্যমে রূপকে পরিণত হয়েছে। সম্ভাবনাকে এখানে কবি সাফল্যের প্রস্তাবনায় মূর্ত করে তুলেছেন। প্রকৃতপক্ষে, শিশুমনের বিকাশের মূলে যে কল্পনাবোধ প্রধানতঃ সক্রিয় থাকে তাকেই তিনি গ্রহণ করেছেন অক্লেশে। অর্থাৎ তাঁর বর্ণনায় শিশুমনের বিচিত্র ভাবনার জগৎটি অতি সহজেই এসে ধরা দিয়েছে। 'সাত ভাই চম্পা' কবিতাটি প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য। শিশুমনের অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে বর্ণনার মনোহারিত্বটুকু এই কবিতার সম্পদ। অনেক সময় কবিতার আবেদন অপেক্ষা কবিতার ছন্দ এবং ধ্বনি শিশুমনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই রচনায় তারও সার্থক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ কবিতাটি আরও দীর্ঘ করার পরিকল্পনা কবির ছিল। কেন না, বেগম সামসুন নাহার মাহমুদ লিখেছেন,

> "নজরুল 'সাত ভাই চম্পা'র কবিতা তাঁর ত্রিশ বছর আগেকার চট্টগ্রাম সফরের সময় আমাদের বাড়িতে বসে লেখেন। চট্টগ্রামে নানা কবিতা রচনা করতে করতে আমাদের অনুরোধে ছোটদের কবিতা রচনায়ও হাত দিয়েছিলেন তিনি। সেখানে এত হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে তাঁর দিনগুলো কেটেছিল যে, চম্পা ভাইদের সকলের কথা বলে শেষ করা আর হয়ে ওঠেনি তাঁর...*

'প্রভাবতী' কবিতার মধ্যে শিশুমনের শুচিশুভ্র কল্পনা কবির স্নিগ্ধ বর্ণনার প্রসাদগুণে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। সেই শিশুমনের চাপল্য প্রবণতার নিরিখে কর্মচাঞ্চল্যের প্রেরণা উদ্দীপিত হয়ে ওঠে এই কবিতায়। 'খুকী ও কাঠবেড়ালী'

* নজরুল সমীক্ষণ—সম্পাদনা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, পৃঃ ৩১৩।

কবিতার মধ্যেও এই প্রবণতা ভিন্ন অর্থে প্রকাশিত। আপন মনে শিশুর বাক্যালাপ সকল ক্ষেত্রে মধুর। এখানেও কাঠবেড়ালীর সঙ্গে শিশুর কথোপ-কথনের মধ্যে শিশুমনের বিচিত্র ভাব যেমন, আড়ি-ভাব, করুণা-হিংসা, অনুনয়-প্রলোভন ইত্যাদি পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়। উপরন্তু শিশুমনের উপযোগী ভাষার মনোহারিত্বের গুণে কবিতাটি বাংলা শিশুসাহিত্যের ক্ষেত্রে অক্ষয় সম্পদ হয়ে থাকবে।

(হাস্যপ্রিয়তা নজরুল রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপাদান।—নির্মল হাস্যকৌতুকই এই জাতীয় রচনার উদ্দেশ্য। কিন্তু শিশুদের জন্যে রচিত হাস্যরসমিশ্রিত কবিতাগুলি ছোটবড নির্বিশেষে উপভোগ্য। বিশেষ করে 'খাঁদু দাদু' বা 'লিচু চোর' কবিতার মধ্যে এব পরিচয় সুস্পষ্ট। সম্ভব-অসম্ভবের জগৎ যেখানে কল্পনা ও হাস্যরসের নির্মল আনন্দে অভিভাষিত। অর্থোদ্ধারের মূল্য অপেক্ষা শিশুমনের উপভোগ্যতাই সেখানে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।'

কবির রচনায় ব্যঙ্গরসের যে প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় তার প্রভাব কবির জীবনে বাল্যকাল থেকেই বর্তমান। বলতে গেলে হাস্যরসাশ্রিত কাব্য প্রতিভার প্রত্যক্ষ স্ফুরণ সর্বপ্রথম ঘটেছে প্রধানতঃ লেটোর দলে থাকার সময়। কবির বন্ধু এস. এম. এহিয়ার মতে, "তখনকার সবাই তাঁকে চুরুলিযার 'গোদা কবি' বা 'ধ্যাঙাচি কবি' বলে ডাকতেন আর সেই এগারো-বারো বছর বয়সেই 'লেটো' দলে ভিড়ে তিনি খ্যাতনামা হযে ওঠেন। অনেক সময় দলের হয়ে আসরে নেমে তাঁকে হাসি, গান ও কৌতুকের আসর জমাতে হোতো। বস্তুতঃ নজরুল ছিলেন হাসির রাজা। ছেলেবেলা থেকেই তিনি রঙ্গপ্রিয়। নির্দোষ হাসি ও কৌতুকে তখনকার দিনে তাঁর জুড়ি ছিল না। সেই সময়ে তরজা গানে আরবী, ফারসী, উর্দু, ইংরাজী মিশ্রিত করাই ছিল পৌরুষের পরিচয়। আর 'ব্যাঙাচি' কবি নজরুল ছিলেন পাঁচমিশেলির যাদুকর। সেই ছোটবেলাতেই তিনি 'লেটো গানের আসর'কে মাতিয়ে তুলতেন—হাসি-হুল্লোড়ের তুফান উঠতো আসরে। আসর হয়ে উঠত জমজমাট।'

এহিয়ারের এই বক্তব্যের সমর্থন মেলে কবির বাল্যকালে রচিত কবিতাগুলির মধ্যে। যেমন—

রব না আর কৈলাসপুর
আই অ্যাম ক্যালকাটা গোইং
যত্তো সব ইংলিশ ফেসেন
আহা মরি কি লাইটনিং।

আসরে প্রতিদ্বন্দ্বীকে উদ্দেশ্য করে রচিত কবিতাতেও কবির কৌতুকপ্রীতির পরিচয় সুস্পষ্ট। যথা—

ওরে ছড়াদার that পাল্লাদার মস্ত বড়ো mad
চেহারাটাও monkey like দেখতে ভারি cad
Monkey লড়বে বাবর কা সাথ্
ইয়ে বড়া তাজ্জব বাত
জানে না ও ছোট্ট হলেও হামভি lion lad

ব্যঙ্গমিশ্রিত হাসির গান প্রধানতঃ নলিনীকান্ত সরকারই গেয়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। বর্তমানে জনপ্রিয় সুরকার সলিল চৌধুরী নজরুলের হাস্যধর্মী রচনা সম্পর্কে বলেছেন, "গান লেখা আর সুর তৈরী নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার অন্ত ছিল না তাঁর। নানা ধরনের গান তিনি রচনা করেছেন। এমন কি সংখ্যায় খুব কম হলেও উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাসির গানও তিনি রচনা করেছেন। তাঁর 'চন্দ্রবিন্দু' ও 'সুরসাকী' সঙ্গীত গ্রন্থের কিছু অংশ হাসির গানের দ্বারাই সমৃদ্ধ হয়েছে। স্বরচিত হাসির গানে নজরুল ফুটিয়ে তুলেছেন আমাদের সমাজ আর রাজনীতিগত ভুল-ত্রুটির প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ। শ্লেষপূর্ণ হাস্যরসের নির্মম কশাঘাত।"

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে রচিত ব্যঙ্গমিশ্রিত কবিতা প্রধানতঃ সমালোচনাধর্মী বলে প্রায়শঃই সেগুলি সরকারের নেকনজরে পড়েছে। আমাদের দেশে চারণ কবিরা যে ধরনের রচনা দেশপ্রেমের ভাব প্রচারের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করতেন সেই ধরনের কবিতাও ব্যঙ্গ মিশ্রিত ভাব সমৃদ্ধ হয়ে নজরুলের রচনায় আত্মপ্রকাশ করেছে। মুকুন্দ দাসের ন্যায় নজরুলও জাতিভেদ, কুসংস্কার এবং সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর মতামত কৌতুকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন। বিশেষ করে হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রীকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের চতুর প্রস্তাবকে নিয়ে রচিত তাঁর 'প্যাক্ট' কবিতাটি স্মর্তব্য। দেখা যাচ্ছে, 'চন্দ্রবিন্দু'র প্রতিটি রচনাই আশ্চর্য প্রতিবাদে মুখর। অবশ্য পাশাপাশি নির্মল হাস্যরসাশ্রয়ী কবিতা রচনায়ও কবির ছিল অন্তহীন উৎসাহ। যথা—

আমার হরিনামে রুচি কারণ পরিণামে লুচি
আমি ভোজের লাগি করি ভজন।
আমি মাল্‌পোর লাগি তল্পী বাঁধিয়া
এ কল্প-লোকে এসেছি মন॥

তাঁর বিশুদ্ধ হাস্যপ্রীতির পরিচয় মেলে প্রধানতঃ সেই সব রচনায় যেখানে কবি বিমল আনন্দের প্রেরণায় ভরপুর। কেবলমাত্র ভোজ্য দ্রব্যের নাম নিয়ে অনুরূপ কবিতা নজরুল রচনা করেছিলেন। যেমন—

'রাধা-বল্লভী লোভে পুজি রাধা-বল্লভে—
রস-গোল্লার লাগি আসি রাস-মোচ্ছবে।
আমার গোল্লায় গেছে মন রস-গোল্লায় গেছে মন!'

ভিন্ন কৌতুকপ্রীতি নজরে পড়ে যখন তিনি লেখেন,

কাফ্রি চেহেরা ইংরিজি দাঁত
টাই বাঁধে পিছে কাছাতে
ভীষণ বম্ব, চাষ করে ওরা
অস্ত্র আইন বাঁচাতে।
... ...

অথবা, পূর্বে উল্লেখিত

ডিম গোলাকার গোল টেবিল
করবে সার্ভ অশ্ব-ডিম,
তা দিবে তায় ধাড়ির দল
তা নয় দিলে, অন্তঃ কিম?
আন্‌বে স্বরাজ ব্রিটিশ-বর্ণ
অষ্ট্রেলিয়ার ভাইপোকে॥
... ...

বগল বাজা দুলিয়ে মাজা
বসে কেন অমনি রে।
ছেঁড়া ঢোলে লাগাও চাঁটি
মা হবেন আজ ডোমনীরে।

কবির প্রকৃতিতেই ছিল হাস্যপ্রিয় মানসিকতার প্রবণতা। প্রধানতঃ তাই দৈনন্দিন জীবনের উচ্ছ্বাস ও কৌতুকপ্রিয়তার দ্বারা কবি সরাসরি পরিচালিত হতেন। এমন কি তাঁর প্রাণোচ্ছল অভিব্যক্তির মূলে ছিল সেই হাস্যরস প্রবণতার সুগভীর আকর্ষণ যা তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রেও সহজেই সংক্রামিত হয়েছিল। ফলে প্রাত্যহিক জীবনের অসামঞ্জস্যকে তিনি সকৌতুকে কাব্যিক মেজাজেই গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এই কৌতুকপ্রিয়তা বা হাস্যরসের মধ্যে মলিনতা

সর্বত্রই অনুপস্থিত। বিদ্রূপের তীব্রতা বা শ্লেষের আক্রমণ এই জন্যেই কোথাও শালীনতার সীমারেখাকে অতিক্রম করেনি। গ্রাম্য বা শহুরে কিছু কিছু কথোপকথনে অতিশয়োক্তি বা হাল্কা রসিকতার প্রভাব থাকলেও সামগ্রিকভাবে তা কখনোই উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাহন হয়ে ওঠেনি। ব্যক্তিজীবনে যিনি নির্মল হাস্যরসের সন্ধানী পথিক কাব্যে তাঁর সেই মানসিকতারই সুষ্ঠু রূপান্তর, অর্থাৎ কোনো ক্ষেত্রে হাস্যরসের মৌলিক ধর্মটি নজরুলের কাব্যে লঙ্ঘিত হয়নি।

বস্তুতঃ, হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে একদিকে যেমন নির্মল হাস্যপ্রবণতার প্রভাব তাঁর কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে তেমনি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা পাশাপাশি তাঁর এ জাতীয় কবিতায় পরিপূর্ণ। আত্মবিস্মৃত জাতিকে হাস্যকৌতুকের মাধ্যমে প্রকৃত অবস্থাটি বিশ্লেষণ করানোই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে তাঁর উদ্দেশ্য সাফল্যলাভ করেছে বলা যায়। বাংলা কবিতায় হাস্যরসের ক্ষেত্রে যে দৈন্য তিরিশের দশকে দেখা দিয়েছিল নজরুল তা থেকে পাঠকদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। এবং আন্তরিকতার গুণে তাঁর সিদ্ধিতেও তাই বিলম্ব ঘটেনি।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গীতিকাব্যের ভাষা, সুর ও ভাববৈচিত্র্য : শব্দ ও ছন্দ বিষয়ক পরিক্রমা

প্রকৃতপক্ষে, আধুনিক গীতিকবিতার কোনো সাধারণ প্রচলিত পূর্বনির্ধারিত সর্ত বা আদর্শ নেই। আধুনিক গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কবি জানেন না যে তিনি কি লিখবেন অথবা তাঁকে কি লিখতে হবে। গীতিকবিতা সেদিক থেকে কবির সত্তাচেতনারই প্রকাশ। গীতিকবিতায় কবির এই চেতনার মেজাজ (mood), মর্জি (attitude) ও প্রকাশ-ব্যাকুলতা অহরহ স্পন্দিত হচ্ছে, তাঁর এক মুহূর্তের সঙ্গে আর এক মুহূর্তের মিল নেই।* অর্থাৎ সার্থক গীতি-কবির কাজ হচ্ছে প্রথাগত কাব্যভাষা বা ছন্দ প্রকৃতিকে যথাসাধ্য এড়িয়ে গিয়ে নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করে নেওয়া। বস্তুতঃ, কবির কাছে বিষয়টি একমাত্র প্রধান বিবেচ্য নয়, কবির সত্তাচেতনার যে বিশেষ মুহূর্তটি কবিতার মধ্যে প্রতিফলিত হবে সেটাই চূড়ান্ত কথা। অর্থাৎ গীতিকবিতায় কবির ক্ষেত্রে বিশেষ মুহূর্তটি মূল্যবান এবং সেই জন্যে তাঁর কোনো বাসনাকেই আকস্মিক বলা চলে না। বরং সমস্ত গীতিকবিতার মূলে রয়েছে এই ক্ষণিকানুভূতি। গীতিকবিতার অন্বিষ্ট হোলো... "to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moment's sake."** পেটার সংজ্ঞায়িত এই মুহূর্তের থিওরি কবিদের নিশ্চয়ই অনভিপ্রেত নয়, কিন্তু তাকে চিরন্তন করে তুলতেই কবির আগ্রহ বর্তমান। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, গীতিকবিতার বাণীরূপ একটি সজীব, অর্গানিক সত্তা তথা কবির একটি অভিজ্ঞতারই প্রতিফলন। এর প্রতিটি অংশেই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটি অখণ্ড ঐক্যের সংহতি। এছাড়াও অহরহ পরিবর্তনশীল কবির সত্তাচেতনা মূলতঃ বিশিষ্ট হয়ে ওঠে কবির নিজস্ব প্রিয় রহস্যময়তায়। এই রহস্য দিয়ে কবি মুহূর্তগুলিকে মূল্যবান শব্দের বিনিময়ে অনির্বচনীয় করে তোলেন। ব্রাড্‌লের ভাষায়, "The poet speaks to us of one thing, but in this one thing there seems to lurk the

* রবীন্দ্রকাব্যরূপের বিবর্তন-রেখা—গুণময় মান্না, পৃঃ ২২

** W. Pater—(সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, বিষ্ণু দে)।

secret of all." আসলে, গীতিকবিতার ক্ষেত্রে lurk the secret-ই হোলো অন্যতম বিষয় ; *

অপরদিকে, বহুমুখী চেতনার ঐক্যমুখিতা, ভাষা-ছন্দ-অনুভূতি-চিত্রকল্প প্রভৃতি অনুষঙ্গ গীতিকবিতার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। ফলে, কবিকে এইদিকেও দৃষ্টি দিতে হয়, যেমন দিতে হয় সঙ্গীতময়তাকে। এই সঙ্গীতধর্মিতা গীতিকাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সহজভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন অধ্যাপক বোল্টন তাঁর 'Anatomy of Poetry' গ্রন্থে। উপরন্তু, Marjorie Boulton-এর মতে, "A lyric is, however, to be thought of as being fairly simple and musical in diction. Most short poems may be classed as lyrics. The sonnet is lyrical in subject though perhaps not in form....A subdivision of lyric is the ELEGY, a poem, long or short, of mourning or on some sorrowful theme."** গীতিকাব্য বিষযে পশ্চিমী সমালোচকদের এই অভিধা একান্তই সাম্প্রতিক। নজরুলেব ভাবনাপ্রসূত কাব্যসংজ্ঞাও-এর থেকে পৃথক নয়। বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে গীতিকাব্যের যে সংজ্ঞা নির্ধারিত তাতেও গীতিকাব্যের ভাষাগত আন্তরিকতাকেই প্রধান সম্বল বলে মেনে নে ‍া হয়েছে। অতএব "আধুনিক লিরিকে ভাবের আবেগ ও ভাষার প্রসাধন এবং এতদুভয়েব সুপরিণয় ও সর্বোপরি কবিচিত্তের প্রক্ষেপণ একান্ত আবশ্যক। এখানেই তাহার আধুনিকতা।"† এই উপলব্ধি থেকে কবি বঞ্চিত ছিলেন না। প্রকৃতপক্ষে, গীতিকাব্যের ভাষা,

* A. C. Bradley—Oxford lectures on poetry.

** The Anatomy of Poetry : by Marjorie Boulton. (First edition 1953, Page 101.)

† উনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (১ম সংস্করণের ভূমিকা) ।

"Seme poetry is meant to be sung ; most poetry, in modern times, is meant to be spoken—and there are many other things to be spoken of besides the murmur of innumerable bees, or the moan of doves in immemorial elms."—The Muse of Poetry by T. S. Eliot. P. 56. (Selected Prose.)

সুর ও ভাববৈচিত্র্যগত দিক থেকে বিচার করলে নজরুলের রচনার তাৎপর্য উপরোক্ত সংজ্ঞার আলোকেই বিচার্য।

আধুনিক গীতিকাব্যের অন্যতম লক্ষণ যে হাহাকার ও বিষাদ নজরুল কাব্যেও পুরোপুরি তা উপস্থিত। সেই সঙ্গে Boulton-এর সংজ্ঞানুযায়ী সাংগীতিক সারল্যবোধও কবির কাব্যকে গীতিকাব্যোচিত উৎকর্ষ দান করেছে। এবং তাঁর মতে শোকগাথা গীতিকাব্যের অন্তর্ভুক্ত একটি অংশও বটে। বিচার করলে দেখা যায় যে, প্রধানতঃ ব্যক্তিগত ভাব, বেদনা বা উচ্ছ্বাসের কাব্যিক প্রকাশই হোলো গীতিকাব্যের প্রাণ। সুতরাং ব্যক্তিগত অনুভূতির তীব্রতাকে প্রকাশ করতে গেলে পরিচিত শব্দ, কথা ও লৌকিক বাক্যবিন্যাসের অবশ্যই প্রয়োজন। অবশ্য নজরুলের গীতিকবিতায় যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে তার মূলে রয়েছে পরিচিত আটপৌরে শব্দ ও ভাষার সুনিপুণ ব্যবহার যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পাঠকমনে অতি সহজেই কাব্যিক ঝংকার তুলেছে। তাঁর এই সাফল্য সামগ্রিকভাবে বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথের সাফল্যের কথা বাদ দিলে, বিংশ শতাব্দীর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে প্রধানতঃ গীতিকবিতায় তাঁর সাফল্য সমসাময়িকদের ঈর্ষার বস্তু। তাঁর সাফল্যের স্বীকৃতি মেলে সমসাময়িক পত্র-পত্রিকায়।* বিশ্লেষণের দিক থেকে তাঁর কাব্যের ভাষাকে মূলতঃ তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) বৈপ্লবিক শব্দ সমন্বিত ভাষা, (২) স্নিগ্ধ সুষমাশৈলী মিশ্রিত ভাষা, (৩) গ্রাম্য, সরল ও লৌকিক শব্দমিশ্রিত ভাষা।

'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'সর্বহারা', 'সাম্যবাদী', 'প্রলয়-শিখা' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে নজরুল যে ভাষা ব্যবহার করেছেন তা প্রধানতঃ বক্তব্যপ্রধান। উজ্জীবনী ভাবধারা থেকেই এর জন্ম। কবিকে এই কাব্যগুলির শব্দচয়নের ক্ষেত্রে অধিকাংশ স্থলেই প্রয়োজনীয় শব্দের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। বলা বাহুল্য, কেবলমাত্র বাংলা ভাষার প্রচলিত তীক্ষ্ণতাহীন শব্দরাজির প্রয়োগ করে কবি সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি। আপন প্রাণের উৎসাহপূর্ণ তীব্রতার প্রভাবে কবি বিভিন্ন ভারতীয় অথবা কাব্যের স্বার্থে বিদেশী শব্দ-

* "His success was immense. Tagore was not surpassed but for sometime at least was over-shadowed by one who sang of the ardours and agonies of youth with a vigour."...The Statesman, 13th October 1951, Calcutta. (Calcutta Personalities : Kazi Nazrul Islam.)

ভাণ্ডারের সাহায্য অকাতরে গ্রহণ করেছেন। ফলে শব্দরাজির যথার্থ প্রয়োগের বিনিময়ে নজরুলের ভাষা লাভ করতে পেরেছে সম্পূর্ণ একক একটি বৈপ্লবিক স্বাতন্ত্র্যবোধ। ভাষার মধ্যে একান্ত পেলব শব্দের পরিবর্তে তিনি অনুসন্ধান করেছেন খরতর, দীপ্র, আবেগকম্পিত বৈপ্লবিক ভাষার পৌরুষ। বলা বাহুল্য, কবির সেই প্রয়াস ব্যর্থ হয়নি। এবং গীতিকাব্যের স্বভাবস্নিগ্ধ মাধুরীও এর ফলে এই জাতীয় কবিতায় একেবারে অনুপস্থিত নয়। বাংলা কাব্যে ভাষার ক্ষেত্রে নজরুলের এই অবদান এক কথায় বৈপ্লবিক। ইতিপূর্বে কাব্যে প্রধানতঃ মধুসূদনের ক্ষেত্রেই একমাত্র সার্থক ভাষার পৌরুষ লক্ষ্য করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, কাব্যিক শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে কবির রোমান্টিক সত্তার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেছে তাঁর শ্রেষ্ঠতম লিরিক কবিতাবলীর মধ্যে। কাব্যিক পেলবতাসমৃদ্ধ কবির ভাবনা যথার্থ মূর্ত হয়ে উঠেছে এই সব কবিতায়। এই মাধুর্যই নজরুলের কাব্যে ভাষার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করেছে অকল্পনীয় এক ব্যঞ্জনা এবং কবির ভাবনার সৌকুমার্য থেকে ভাষার সাংগীতিক যাদুমিশ্রিত শব্দাবলী বিচ্ছিন্ন নয়। ফলে এই দুইয়ের সংমিশ্রণে নজরুলের কাব্য অতি সহজেই ভাষার ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্যলাভ করতে সমর্থ হয়েছে। অধিকাংশ ছোট আকৃতির কবিতায় কবির শব্দচয়নে বিস্ময়কর এক সতর্কতা অনুভব করা যায়। 'দোলন-চাঁপা', 'ছায়ানট', 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু হিন্দোল' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের ভাষায় যে সক্রিয় চেতনা কার্যকরী ছিল, পরবর্তীকালে 'চোখের চাতক', 'চক্রবাক', 'নতুন চাঁদ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রে এসে তারই পরিণত ও সার্থক রূপ দেখতে পাওয়া গেছে। ভাষার সুচারুপনার গুণেই প্রধানতঃ 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থটি নজরুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ বলে অনেক সমালোচকের কাছে স্বীকৃত।*

তৃতীয়তঃ, নজরুল তাঁর কাব্যে সাধ্যমতো সুযোগ বুঝে বহু লৌকিক শব্দ যোগ করে ভাষাকে সাবলীল করতে চেয়েছিলেন। গদ্য রচনার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট বক্তব্য ও ভাষায় গ্রাম্য সারল্য মিশ্রিত শব্দাবলীই ছিল তাঁর ভাষার শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বিভিন্ন আঞ্চলিক শব্দকে কবিতার ভাষার অন্তর্ভুক্ত করে কবি বিচিত্রতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ চালিয়ে যেতে উৎসাহী ছিলেন। বুলবুলের দুই খণ্ড, নজরুল গীতিকা, বনগীতি, গুলবাগিচা ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ রচনায় তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। গ্রাম্য কথা, ভাষা ও চিত্রায়ণের মধ্যে

* সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে, 'চক্রবাক' কাব্যগ্রন্থে নজরুলের কাব্য বিষয়ক উৎকর্ষ সার্থকতার সীমাকে স্পর্শ করতে পেরেছে।

কবি নতুন এক অনুভূতি লাভ করেছিলেন। ফলে কাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে কবি গ্রহণ করেছিলেন পরিচিত লৌকিক ও দেশজ নৈকট্যকে। এই লোকায়ত দর্শনের প্রতি আসক্তির মাধ্যমে কবি আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন পরিচিত পৃথিবীর ভিন্ন এক দ্রাঘিমা। ইয়োরোপে যাকে বলা হয় fidelity to life তাকেই কবি তাঁর কবিতার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ কবি জীবনবোধের গভীরে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন পরিচিত দেশজ অনুষঙ্গের বিনিময়ে। আর এরই ফলে নজরুল আয়ত্ত করেছিলেন অজস্র শব্দের তীক্ষ্ণতম আয়ুধ বিষয়ক অভিজ্ঞতা। সেগুলো তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত হয়ে নতুন ভাষার মতই পাঠকের অনুভূতিতে একাত্মতা লাভ করেছে। স্বভাবসিদ্ধ আবেগের প্রভাবে তাঁর ভাষা পুনরুক্তির ফাঁদে পড়লেও প্রকরণগত দিক থেকে তাঁর সাফল্যে কখনো টান পড়েনি। গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে পুনরুক্তির সম্ভাবনা প্রত্যেক কবির ক্ষেত্রেই কমবেশী পরিমাণে ঘটে থাকে। অবশ্য বুদ্ধির চর্চা নজরুলের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তাঁর গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে, অপেক্ষাকৃত কম। আর এরই জন্যে অনেকের মতে, তাঁর রচনায় কয়েকটি শিল্পগত ত্রুটি সুস্পষ্ট। এজন্যে নজরুলের আবেগই অনেকাংশে দায়ী। প্রকৃতপক্ষে, বুদ্ধির চর্চাতে কবির আগ্রহ ছিল কম। তাঁর আস্থা ছিল স্বভাবজাত তারুণ্যের প্রতি যার মধ্যে উচ্ছ্বাসই হোলো মূল কথা। কিন্তু গদ্য রচনার ক্ষেত্রে এই উচ্ছ্বাস বা আবেগ কখনোই বক্তব্যকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বিশেষ করে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সূক্ষ্ম রাজনৈতিক দর্শন তাঁর রচনায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসজাত প্রবণতা সত্ত্বেও অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও বোধগম্য হয়ে ধরা পড়েছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের ভাবনা প্রসংগতঃ বিচার্য। রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, মানবীয় প্রেমের রূপকথাকে প্রকাশ করতে গিয়ে কবি স্বীয় চেতনালব্ধ মননের নিরিখে গানের বিষয়বস্তুকে শেষ পর্যন্ত স্বর্গীয় চেতনার আলোকে উদ্ভাসিত করেছেন। অর্থাৎ তাঁর কবিতায় reality থেকে spiritualityতে উত্তরণ ঘটেছে। নজরুলের ক্ষেত্রে ঠিক বিপরীত ভাবনার প্রবর্তনা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর গীতিকাব্যে spirituality থেকে materialism বা realityতে ফিরে আসার চেষ্টা সক্রিয়। বস্তুতঃ, এর মূলে কাজ করেছে কবির আস্থাজ্ঞাপক socialistic reality. অর্থাৎ তিরিশের কালে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক তথা রাজনৈতিক অস্থিরতাপ্রসূত প্রবণতার দ্বারা কবি প্রভাবান্বিত। শ্রেণীচেতনার ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের ভাবকল্পরূপ প্রকাশ সমসাময়িক প্রগতিবাদী কাব্যমানসে

যে পরিবর্তনের আভাষ সূচিত হয়েছিল নজরুল ছিলেন তারই পথিকৃৎ। লক্ষণীয় 'একাদশীর চাঁদ রে ওই রাঙা মেঘের পাশে / যেন কাহার ভাঙা কলস আকাশ গাঙে ভাসে'র মধ্যে কবি বাস্তবতাবোধের (ভাঙা কলস) প্রতি আসক্ত। রোম্যান্টিক নজরুলের মর্ত্যের বাস্তবানুগ ভাবনা তাঁর অবচেতন মনের সচেতন অভিব্যক্তির পরিচায়ক।

তাঁর মতে কবিতার ক্ষেত্রে জীবনের উচ্ছলতাই হোলো বড়ো কথা। নীতিবোধ বা সুকঠিন তত্ত্বকথার স্থান অন্য যেখানেই হোক কবিতার ক্ষেত্রে তেমন জরুরী নয়। এরই জন্যে প্রচলিত নীতির চেয়ে জীবনের উচ্ছলতাকেই তিনি বড়ো বলে মেনেছিলেন। অবশ্য তাই বলে আবু সয়ীদ আইয়ুবের কথাও মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেছিলেন, "সাহিত্যের দুটো কাজ—Expression of life জীবনের প্রকাশ, আর Criticism of life জীবনের সমালোচনা —নজরুলের রচনায় প্রথমটির সদ্‌ভাব থাকলেও, দ্বিতীয়টির অসদ্‌ভাব।"* কিন্তু নজরুলের রচনায় শুধুই কি Expression of life? তাঁর রচনায় Criticism of life কি সত্যিই পরিপূর্ণভাবে অনুপস্থিত? আসলে প্রথম জীবনের অধিকাংশ রচনার মধ্যে দ্বিতীয় বোধটিই অত্যন্ত বেশী পরিমাণে সক্রিয়। বিশেষ করে ১৯১৯ খৃ: থেকে ১৯২৩ খৃ: পর্যন্ত তাঁর রচনার মধ্যে Criticism of life-এর প্রাধান্য। কাব্যিক রীতিবিন্যস্ত স্টাইল বা সমতলিক ঐক্যের অভাব কোনোমতেই জীবনের মৌলিক দৃষ্টিকে নজরুলের ক্ষেত্রে আচ্ছন্ন করেনি। সুতরাং, জীবনমুখী আলোচনা থেকে দূরে সরে থাকার প্রশ্নই তাঁর ক্ষেত্রে আসে না। আর, জীবনমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো কিছুকে বিচার করতে গেলে Criticism of life-কে এড়িয়ে যাওয়া রীতিমতো অসম্ভব। বরং নজরুল অনুভব করেছিলেন বিশ শতকের রাজনৈতিক তথা সামাজিক অস্থিরতা ও অসাম্যজনিত বিচ্ছিন্নতা। স্থায়িত্বের রোমাঞ্চের চেয়ে বর্তমানের চঞ্চল মায়াই তাঁকে গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে তাই আকর্ষণ করেছে। ফলে আবেগ তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে মুক্তির চেয়েও ক্ষিপ্র। উচ্ছ্বাসের সমগ্র চিত্রায়ণই যেন তাঁর কাব্যের সীমানা। বস্তুতঃ, অতৃপ্ত শৈল্পিক অন্বেষাই তাঁকে ঠেলে দিয়েছে এই পথে। এই ভাবেই তাঁর কবিমানস পরিণতিতে লাভ করতে চেয়েছে বক্তব্যের শুদ্ধ সমগ্রতা।

* সংস্কৃতি কথা—মোতাহের হোসেন চৌধুরী (কাজী নজরুল ইসলাম, পৃঃ ১৭৫)।

নজরুলের সামগ্রিক সত্তার প্রকাশ ঘটেছে মূলতঃ তাঁর গীতিকাব্যের স্নিগ্ধ অনুভূতির মধ্যে। অথচ সমালোচকেরা অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিসত্তাকে অতিক্রম করে ভিন্ন দিকে পাঠকের দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চেয়েছেন।* কিন্তু নজরুল মানবতাবোধে বিশ্বাসী হলেও সৃষ্টির ক্ষেত্রে যে পর্বান্তর তাঁর ক্ষেত্রে ঘটেছে অবশেষে তাই তাঁকে গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা দান করেছে। আর এরই ফলে নজরুল হয়ে উঠেছিলেন সার্থক কাব্যগীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা।

গীতিকাব্যের ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নজরুল ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। আনন্দবর্ধন বলেছিলেন, "ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।" অর্থাৎ কবির কাব্যে কবির সমস্ত ব্যবহারই হবে স্বাধীন। কারণ সেখানে তিনি স্বতন্ত্র, বাইরের জন্য কোনো কিছুর পারতন্ত্র্য তাঁর নেই। নজরুলও এই সংজ্ঞায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনিও মনে করতেন, বস্তুজগতের মতো কাব্যের জগৎও সীমাহীন, এবং এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হচ্ছেন কবি। সৃষ্টির কাজে নিজের প্রতিভার নিয়ম ছাড়া আর কোনো নিয়ম তাঁর উপর চলে না।** বস্তুতঃ, কাব্যের সমস্ত সাফল্য কাব্যরসেব সার্থক পরিবেশনে। সুতরাং ভাষাকে স্বাভাবিক অর্থেই ফিরে পেতে হয় প্রার্থিত কাব্যরসের সেই অলংকার।

গীতিকাব্যে সুরের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন ভিন্ন বিন্যাসরীতির পরিপোষক। তাঁর রচনায় সংগীতধর্মী প্রবণতা অধিকতর লক্ষণীয়। যার ফলে তাঁর অধিকাংশ কবিতাই সংগীতময়তার গুণে গান হিসেবে চিহ্নিত। "অবশ্য গান ও গীতি-কবিতার মধ্যে পার্থক্য হইতেছে এই যে, গানে কবি তাঁহার ভাবকে যথাসম্ভব লঘু তুলির টানে, কল্পনা প্রয়োগকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া ও সুরের অন্তরঙ্গ সহযোগিতার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া প্রকাশ করেন। গীতিকবিতায় কল্পনার ঐশ্বর্য, বহুচারিতা ও অনুভূতির নিবিড়তা ধ্বনিসমৃদ্ধ ছন্দোপ্রবাহের মাধ্যমে রূপলাভ করে। দেশপ্রেমের কবিতা সংকলনে সর্বত্র এই স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায় নাই। বহু দেশপ্রেমের গান উৎকৃষ্ট গীতিকবিতা রূপে পাঠকমনের স্বীকৃতি লাভ

* "অনুভূতির গোপন আয়োজন তাঁর জগতে কখনো কখনো ঘটায় বাণীর অপূর্ব বিদ্যুৎ-দীপ্তি— কিন্তু কবি যত বড় তার চাইতে অনেক বড় তিনি যুগমানব" —আবদুল ওদুদ।

** কাব্য জিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত, পৃঃ ৫৩।

করিয়াছে।"* 'সুতরাং গীতিকাব্যের সুর বিষয়ক তাৎপর্য এই আলোকেই বিচার্য। এছাড়া, নজরুলের গীতিকাব্যের কাব্যিক বিচারে মূল সুর হোলো প্রেম। প্রেমকে ঘিরে তাঁর গীতিকাব্য বিচিত্র পথের সন্ধানে ফিরেছে। 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে প্রেমের যে সুরটি আভাষিত পরবর্তীকালে 'পূবের হাওয়া', 'সিন্ধু হিন্দোল', 'চক্রবাক' ও 'সুরসাকী' কাব্যপ্রসঙ্গে তার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া, প্রেমের সুরের সঙ্গে অধিকাংশ ক্ষেত্রে মানবতার মৌল সুরটুকু যুক্ত হয়ে কবির অধিকাংশ রচনাই অবশেষে ফিরে পেয়েছে সাফল্যের চাবিকাঠি। তাঁর সামগ্রিক কাব্য রচনার দিকে তাকালে ধরা পড়ে সৃষ্টির মধ্যে আশ্চর্য অজ্ঞাত এক অভিন্নতার সুর। চারদিকের দৃশ্যমান সব কিছু থেকে কবি মুগ্ধ হয়ে সংগ্রহ করেছেন প্রকৃতির বিচিত্র রঙের বর্ণালী বা দীপ্তি। ফলে সমগ্র কাব্যগীতির মধ্যে কবির ভাবনার নতুন একটি সুর ধরা পড়েছে। কবির মরমী হৃদয়েই তাঁর কাব্যের অন্যতম সুরটি নিহিত ছিল।

ভাববৈচিত্র্যের দিক থেকে বিশ্লেষণ করতে গেলে নজরুলের গীতিকবিতাকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(১) আত্মগত ভাব বিষয়ক ও (২) আঙ্গিক ভাবপ্রধান। আত্মগত ভাব বিষয়ক রচনার ক্ষেত্রে নজরুল অবশ্য একান্তই রোম্যাণ্টিক। প্রেমের আত্মগত উপলব্ধির ক্ষেত্রে কবি যেন নিজের অজান্তেই সলজ্জ অনুভূতির কাছে আত্মসমর্পণ করে ফেলেছেন। সেখানে তিনি ঐতিহ্যের আত্মীয়। অবশ্য এই মিতালীকে ঘিরে রয়েছে কবির প্রেম ভাবনার নীরব অনুসন্ধান। এই আত্মগত ভাবটি তাই একান্তভাবে মিশে রয়েছে তাঁর কবিসত্তার মৌলিক ভাবনার মধ্যে যা কখনোই কাব্যিক রীতির বিন্যাসে ধরা দেয়নি। এইখানেই শাস্ত্রীয় প্রকরণের সঙ্গে কবির দ্বন্দ্বময় আততি ঘটেছে। হয়তো নজরুলের বিস্তৃত মানস প্রকৃতিগত দিক থেকে পেতে চেয়েছিল আত্মগত ভাবের একক শান্ত কাব্যাশ্রয়ী বিশ্রাম। আর তারই জন্যে কবির অন্তরে চলে নীরব গভীর অন্তর্দৃষ্টির এক ব্যাপক অভিযান যা থেকে কবি কখনোই মুক্তি পাননি। তাঁর সমগ্র গীতিকাব্যের মধ্যে প্রতিনিয়ত সেই প্রস্তুতিই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবি গীতিকাব্যের এত গভীরে যে ডুব দিয়েছিলেন তাতে কোন্ প্রত্যাশা কাজ করেছিল? পর্বান্তরের পালাবদলের কালে কেন কবি বারবার ভাবের রাজ্যে ফেরারী? কেবল চাহিদা অথবা

* ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ও শ্রীঅরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় (ভূমিকা)।

জনপ্রিয়তাই তো সৃষ্টির একমাত্র সূত্র হতে পারে না। চাহিদাজনিত উৎসাহ বিপরীতভাবে নজরুলের ক্ষেত্রে একান্তই প্রাথমিক উচ্ছ্বাসের ফল। সুতরাং, নজরুলের ক্ষেত্রে উৎসাহের সূত্রটি আরো গভীরে নিহিত। হার্বার্ট রীড* একেই বলেছেন কবির প্রাণসত্তা যা নজরুলের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আবেগেব কেন্দ্র-ভূমিতেই এই আত্মগত ভাবের প্রস্তাবনা। ফলে তাঁর কবিতার ক্ষেত্রে তিনি অনবরত ফিরে তাকিয়েছেন অন্তঃস্থ অনুভূতির গতিবিধির দিকে। হয়তো এইভাবেই ফিরে পেয়েছেন কবি অজস্র ভাবনার সংহতি যা পরিণতিতে এনে দিয়েছে সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রাণসত্তার স্পর্শ।

মহৎ কবিদের ভাবনা যথার্থ হয়ে ওঠে তাঁর ব্যবহৃত ভাষার সুচারু অথচ তীক্ষ্ণ সতর্কতা মিশ্রিত প্রবণতার ভেতর দিয়ে। তাই কাব্যপ্রকৃতির সম্বন্ধে জন্ প্রেস্ মনে করেন যে, কবির শিল্পগত কৃতিত্ব তাঁর ভাষার পরিচযেই প্রধানতঃ বিবেচ্য।** কারো কারো মতে ভাষার নিজেরই আছে অন্তহীন সৌন্দর্য স্নিগ্ধ লাবণ্য।†

অপরদিকে নজরুলের গীতিকাব্যে যে ভিন্নতর ভাব প্রাধান্য লাভ করেছে তাতে আঙ্গিকগত বিকাশই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত। আঙ্গিকের শিল্পগত পার্থক্যের কথা ভেবেই কবির রচনায় ভাবের এই তারতম্য দেখা দিয়েছে। রোম্যান্টিক ভাবের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে এই আঙ্গিকের প্রাধান্যই সুস্পষ্ট। এছাড়া প্রযোজন অনুযায়ী আঙ্গিক প্রকরণের ক্ষেত্রে তিনি ঈশ্বর বিষয়ক ভাব ও প্রকৃতিভাবের সীমাকে বিস্তৃত করতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। এরই ফলে তাঁর কাব্যগীতির ক্ষেত্রে সহজেই ভাবের এত বৈচিত্র্য ঘটেছে। বিশেষ করে তাঁর ভক্তিরসাত্মক ভাবমিশ্রিত কবিতার পাশাপাশি

* Modern Poetry—Herbert Read, P. 65.

** Most good poets, recognizing that spectacular tricks of this kind can have only a limited and transient appeal, have known that the proper exercise of their art lies in the mastery of language.—The Chequer'd Shade by John Press. P-192.

† "There the language itself has a surpassing beauty,"—The Problem of Style by F. Middleton Murry. P-116.

সুসংবদ্ধ লৌকিক ভাব মিশ্রিত কবিতাগুলির বৈচিত্র্য পাঠকের কাছে বিস্ময়কর ঠেকে।

বাংলা কবিতার শব্দভাণ্ডারে সংগ্রহের তালিকা যাঁদের দ্বারা মূলতঃ বর্ধিত হয়েছে নজরুলের নাম তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা চলে। ইতিপূর্বে মাইকেলের রচনায় ও রবীন্দ্রনাথের কাব্য রচনায় যে সমস্ত শব্দ গ্রথিত হয়েছে সেগুলোকে বাদ দিলে একমাত্র নজরুলই সর্বাপেক্ষা বেশী ভিন্‌দেশী শব্দকে বাংলা কবিতার আদল অনুযায়ী তাঁর কাব্যগীতির ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন। এই সমস্ত শব্দরাজির অধিকাংশই তাঁর কবিতায় পৌরুষধর্মী প্রবণতাকে প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছে। বলা বাহুল্য, বাংলা কাব্য নজরুলের রচনার মাধ্যমেই ফিরে পেল তার স্বাস্থ্য এবং দীপ্তি। পরবর্তীকালে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে যে সরব পৌরুষ কণ্ঠের সাক্ষাৎ পাই তা মূলতঃ নজরুলেরই অবদান। শব্দের ক্ষেত্রে তিনি প্রধানতঃ আরবী ও ফারসী শব্দের যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথও কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফারসী শব্দরাজিকে যথেষ্ট নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছিলেন। এবং রবীন্দ্রনাথের পর সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও মোহিতলালের কাব্যেও অনেক আরবী ও ফারসী শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। তুলনামূলকভাবে সত্যেন্দ্রনাথই প্রথম বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার শুরু করেন। যদিও ভাবগত গভীরতার দিক থেকে মোহিতলালের কবিতাগুলি সত্যেন্দ্রনাথের চেয়ে অনেক বেশী সার্থক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেবলমাত্র ব্যবহারের গুণেই নজরুলের কবিতা বিদেশী ভাষা অথবা আরবী-ফারসী শব্দের সংযোজনের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করেছে। বস্তুতঃ, ফারসী ভাষায় নজরুলের যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং পারসী ভাষা তিনি সযত্নে শিক্ষালাভও করেছিলেন। শিক্ষাজাত এই অভিজ্ঞতার বিনিময়েই তিনি স্বচ্ছন্দে ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াৎ ই-হাফিজ'-এর সাবলীল অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলা যায়। আর এরই ফলে নজরুল বৈদেশিক শব্দের সংমিশ্রণে নিজের কাব্যগীতির জন্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি শব্দভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্য রেখে কবি সেই শব্দগুলোকে শাণিত করে তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। মাইকেল ও রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ সংস্কৃত শব্দ-ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দকেও বাংলায় রূপান্তরিত করে নিয়েছিলেন বলে তাঁর শব্দাবলীতে মাইকেলের মত যুক্তাক্ষরের অজস্র বন্ধন অনুপস্থিত। বিপরীতপক্ষে, নজরুলের কাব্যগীতিতে আরবী ও ফারসী শব্দের ব্যবহার রীতিমতো বৈপ্লবিক। শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে

প্রধানতঃ সাংগীতিক ধ্বনির প্রাধান্য তাঁর রচনায় লক্ষ্য করা যায়। লক্ষণীয় যে কবি আরবী এবং ফারসী শব্দের পাশাপাশি তদ্ভব, তৎসম এবং পুরোপুরি দেশীয় শব্দগুলি ব্যবহার করার কাজে মেতে উঠেছিলেন। প্রধানতঃ ঘরোয়া শব্দের ব্যবহারে কবির নৈপুণ্য পাঠককে রীতিমতো বিস্মিত করে।

বস্তুতঃ, সাংগীতিক ধ্বনির প্রাধান্যই ছিল তাঁর শব্দ চয়নের বৈশিষ্ট্য। সম্ভবতঃ তিনি বিশ্বাস করতেন কাব্যের অনির্বচনীয় সংগীত তরঙ্গকে, যার জন্যে তাঁকে শব্দের বহুমুখী ক্ষেত্রে বিচরণ করতে হয়েছিল। 'বড়োর-পিরিতি বালির বাঁধ' রচনার 'খুন' শব্দটি নিয়ে একদা রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এই ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে। নজরুলের ভাষাগত জ্ঞানেব অভিজ্ঞতায় শব্দগুলির অর্থ তার কাছে ভিন্ন মেজাজে ধরা পড়েছিল।

সংগৃহীত শাস্ত্রীয় শব্দ, যেমন—বেদ, কোরাণ ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে কবি যে অজস্র শব্দ অকাতরে গ্রহণ করে বাংলা কবিতায় অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন সেকথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে এর মূলে কাজ করেছে তাঁর অসাম্প্রদায়িক ভাবনার উৎসাহ এবং প্রেরণা।* অনেক ক্ষেত্রে এই লক্ষ্যে পৌঁছোবার জন্যে কাব্যের স্বার্থকে কিছু পরিমাণে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। কবি স্বয়ং এ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। হয়তো কবির কাব্যিক স্বার্থের চেয়ে সামাজিক স্বার্থকে উচ্চে স্থান

* "বাংলা-সাহিত্য সংস্কৃতের দুহিতা না হলেও পালিতা কন্যা। কাজেই তাতে হিন্দুর ভাবধারা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে, ও বাদ দিয়ে বাঙলা ভাষার অর্ধেক ফোর্স নষ্ট হয়ে যাবে। ইংরাজী সাহিত্য হতে গ্রীক পুরাণের ভাষা বাদ দেওয়ার কথা কেউ ভাবতে পারে না। বাঙলা-সাহিত্য হিন্দু-মুসলমানের উভয়েরই সাহিত্য। এতে হিন্দু দেব-দেবীর নাম দেখলে মুসলমানের রাগ করা যেমন অন্যায়, হিন্দুরও তেমনি মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের মধ্যে নিত্য-প্রচলিত মুসলমানী শব্দ তাদের লিখিত সাহিত্যে দেখে ভুরু কোঁচকানো অন্যায়। আমি হিন্দু-মুসলমানের মিলনে পরিপূর্ণ বিশ্বাসী; তাই তাদের এ-সংসারে আঘাত হানার জন্যই মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করি, বা হিন্দু দেব-দেবীর নাম নিই"—নজরুল। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁকে লেখা চিঠি। (নজরুল জীবনে প্রেমের এক অধ্যায়। সম্পাদনা সৈয়দ আলী আশরাফ, পৃঃ ৭।)

দিতে চেয়েছিলেন বলেই এমনটি ঘটেছে। উপমানির্ভর যুক্তির সাহায্যে তার উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

নজরুল যে সব শব্দকে তাঁর কাব্যের অন্তর্গত করেছিলেন তা মোটামুটি নিম্নরূপ :
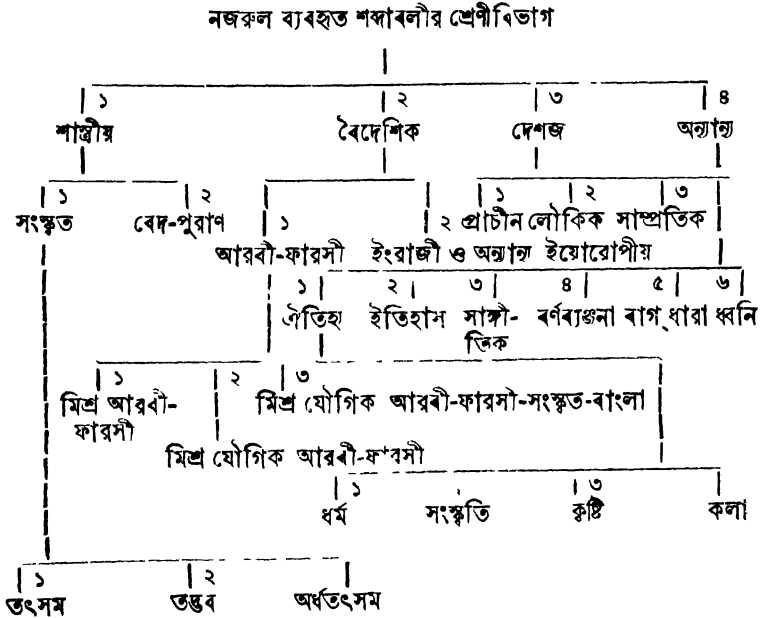
উপরের তালিকায় প্রথম যে চারটি ভাগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে মোটামুটি বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও সামগ্রিকভাবে অনুরূপ শব্দের ব্যবহারই ঘটে থাকে। নজরুলের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য এই কারণে যে, তিনি কাব্যগীতির ক্ষেত্রেও প্রায় ঐ সমস্ত বিভাগীয় শব্দাবলীর ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছিলেন এবং এ কার্যে তাঁর সাফল্য আরও বিস্ময়কর। একদিকে শাস্ত্রীয় শব্দসমূহের সুচারু ব্যবহার এবং অপরদিকে প্রচলিত কথ্য শব্দের কাব্যজনোচিত বিকাশ সমসাময়িকতার বিচারে একান্ত দুঃসাহসিক।

শাস্ত্রীয় শব্দের ব্যবহার ইতিপূর্বে বাংলা কবিতায় যথেষ্ট পরিমাণে ঘটেছে। আবার কাব্যরচনার ক্ষেত্রে বহুকাল পর্যন্ত শাস্ত্রীয় শব্দাবলীর অতিরিক্ত ব্যবহার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রীতিমতো পীড়াদায়ক হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নজরুল সংস্কৃত তৎসম শব্দের যথাযথ ব্যবহার না করে পরিবর্তিত সংস্কৃত (তদ্ভব) বা ভাঙা বা বিকৃত সংস্কৃত শব্দের (অর্ধতৎসম) ব্যবহার করেছিলেন। ফলে

নজরুলের কাব্যে কোনোক্ষেত্রেই সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার পীড়াদায়ক হয়ে ওঠেনি। বেদ-পুরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ থেকে বহু শব্দ চয়ন করে তিনি তাঁর কবিতার অলঙ্কার বর্ধিত করেছিলেন, এবং ভাষাকে সংকীর্ণতার দায় থেকে উদ্ধার করেছিলেন। ধর্মীয় বাধা এক্ষেত্রে তাঁর কাব্যরচনায় কখনো অন্তরায় বলে বিবেচিত হয়নি। বিপরীতপক্ষে, পৌরাণিক শব্দের সচরাচর ব্যবহার কবিকে স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছিল যা কবিকে সামগ্রিকতার দিকেই এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। এসব ক্ষেত্রে কবির মুক্ত মানসে বৃহত্তর চিন্তা প্রভাব বিস্তার করেছিল বলা চলে। নিশ্চয়ই তিনি অনুভব করেছিলেন বাংলা কাব্যের স্বরাঘাত ও স্বরমানের সীমায়িত সামর্থ্য। ফলে পৌরাণিক ঋজু শব্দাবলীর ভাণ্ডারে বাধ্য হয়ে তিনি হাত বাড়িয়েছিলেন।

কবির ব্যবহৃত বেদ-পুরাণের শব্দাবলীর মূলে কাজ করেছে অজস্র প্রতীকির ভাবনা; প্রসঙ্গতঃ লক্ষণীয় যে, বেদ-পুরাণের শব্দগুলি তাঁর হাতে পড়ে কাব্যের নতুন তাৎপর্য খুঁজে পেয়েছে। শব্দগুলিও অতি সহজেই বিশেষ অর্থবাহী হয়ে তাঁর কবিতায় ধরা পড়েছে। এক কথায়, এ সবের ব্যবহার তাঁর রচনায় একান্ত স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে বলা যায়। যেমন—শম্ভু, কম্বু, স্বয়ম্ভু, অম্বু, নিরম্বু, ইত্যাদি শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত কম ব্যবহৃত শব্দ হয়েও ব্যবহারের স্বাভাবিকত্বে সাফল্যলাভ করেছে। অপরদিকে, বেদ-পুরাণের যে সকল শব্দ তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে তার ক্ষেত্রেও নজরুল যথেষ্ট সাফল্যের পরিচয় দান করেছেন। অবশ্য ইয়োরোপীয় কবিদের ক্ষেত্রে শাস্ত্র-পুরাণের শব্দ, ঘটনা বা প্রতীকের ব্যবহার নতুন নয়। বিশেষতঃ রোম্যান্টিক কবিদের রচনায় শাস্ত্র-পুরাণের ব্যবহার খুবই প্রাচীন। নজরুলের ক্ষেত্রেও পূর্বসূরীদের প্রভাবে কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি। নজরুলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, বেদ-পুরাণ থেকে নেওয়া শব্দাবলী ছাড়াও তিনি তাঁর কাব্যে একই সঙ্গে মুসলিম ধর্মীয় শব্দ, মুসলমান লিখিত কাব্যকাহিনী এবং বেদ-উপনিষদ থেকে আহরিত শব্দ স্বচ্ছন্দে কাব্যে ব্যবহার করেছিলেন। 'রোম্যান্টিক রিভাইভালিজম্'-এর প্রবণতাকে অনুসরণ করে তিনি আত্মস্থ করেছেন প্রাচীন পুরাণের দেব-দেবীর নাম বিষয়ক শব্দের সুচারু বর্ণমালা। যেমন—মুসা, ঈসা, ইসমাইল, ফেরাউন, নমরুদ, উজ, হাতেমতাই, শাদ্দাদ, রুস্তম্, ইব্রাহীম, কারুন, কায়কাউস, ইয়াকুব, আজরাইল, কোকাফমুলুক প্রভৃতি। পাশাপাশি ইতিহাসে বিখ্যাত বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ করে নজরুল অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানের যোগসূত্র রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। যেমন—আরব, ইরাক, ইরান, আরবস্তান, আঙ্গোরা, ইস্তাম্বুল,

ইরাক ওহদ, ওয়েসিস, ওমান, কারবালা, আরফাত, কাবুল, কান্দাহার, গজনী, তুরস্ক, তুরান, জেরুজালেম, জালালাবাদ, কুফাকেনান, নওশেরোয়াঁ, পামীর, বোগদাদ, মরক্কো, মক্কা, মদিনা, সুদান, হেজাজ, সমরকন্দ, ফারেত, ফারান, বোস্তান ইত্যাদি। অনুরূপ শব্দাবলীর ব্যবহার ইতিপূর্বে বাংলা কাব্যে দেখা গেলেও মূলতঃ নজরুলের রচনায়ই এর সার্বিক এবং ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে মুসলিম ইতিহাসের প্রসিদ্ধ দেব-দেবী এবং নরনারীর চরিত্রগুলির সাথে একমাত্র তিনিই ঘনিষ্ঠ পরিচয় দান করার কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। ইতিহাস প্রসিদ্ধ নরনারীদের উল্লেখ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর কাব্যেই ঘটেছে। এই সব শব্দের মধ্যে প্রধানতঃ মুসলিম শব্দের যেমন অন্তর্ভুক্তি হয়েছে তেমনি হিন্দু দেবদেবীদের উল্লেখ এবং অসংখ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ নরনারীদের নামের ব্যবহারও লক্ষণীয়। যেমন—

দেবী : গৌরী, উমা, লক্ষ্মী, ভবানী, চণ্ডী, হৈমবতী, ইন্দ্রানী, বীণাপাণি, রাধিকা, সতী, ইন্দিরা, ললিতা, দময়ন্তী, যশোদা, শচী, রোহিণী, সীতা, সরস্বতী, জানকী, তিলোত্তমা, উর্বশী, জ্বালা, মন্দোদরী, অহল্যা, শারদা, অরুন্ধতী, মহাশ্বেতা, শিবানী, অন্নদা, ফাল্গুনী ইত্যাদি।

দেবতা : বিষ্ণু, ধূর্জটি, মহেশ্বর, পিনাকপাণি, দিগম্বর, নটরাজ, কার্তিক, নারায়ণ, ঈশান, ব্রহ্মা, প্রহ্লাদ, গণেশ, ইন্দ্র, কৃষ্ণ, দুর্বাসা, বলরাম, শঙ্কর, শ্যাম, হর, বিশ্বামিত্র, ভোলানাথ, যুধিষ্ঠির, সব্যসাচী, রাম, দাতাকর্ণ, দুর্যোধন, নারদ, দুঃশাসন, দুষ্মন্ত, অভিমন্যু, অর্জুন, ধর্মরাজ, নীলকণ্ঠ, মহেন্দ্র, নচিকেতা, ঋত্বিক, বরুণ ইত্যাদি।

এছাড়া নজরুল বহু মুনি-ঋষির নাম তাঁর কাব্যে ব্যবহার করেছেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—দধীচি, মনু ঋষি, ব্যাস প্রভৃতি। পুরাণ বা প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অনেক মহৎ চরিত্র নজরুল কাব্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েচে। যেমন—দাতাকর্ণ, হরিশ্চন্দ্র, বিরাট, পুণ্ডরীক, প্রমথ ইত্যাদি। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে এই সমস্ত শাস্ত্র বিষয়ক শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে প্রধানতঃ দুটি কারণে। প্রথমতঃ, হিন্দু দেবদেবী বা শাস্ত্র-পুরাণের উল্লেখের মাধ্যমে এর সঙ্গে পরিচিত এবং বিচিত্র অলৌকিক কর্মকাণ্ড এবং বীরত্ব গাথা স্মরণ করা। দ্বিতীয়তঃ, ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে অসাম্প্রদায়িক মুক্ত মানসিকতার স্বাস্থ্যকর অনুশীলনকে কাব্যের মাধ্যমে পরিব্যাপ্ত করা। তাই সম্ভবতঃ একমাত্র নজরুলের কাব্যেই সাম, ঋক, যজু প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার নজরে পড়ে। শাস্ত্র সম্পর্কীয় সুগভীর পরিচয়ের প্রমাণ মেলে কবির পৌরাণিক বহুবিধ ঘটনাসমৃদ্ধ শব্দের প্রবর্তনার মধ্যে।

তাই ওম, কুরুবক, চক্রনেমি, ইন্দ্রচাপ, বজ্রপাণক, ঋক্ষ, অজদেবের মতো অপরিচিত শব্দও কবির নজর এড়ায়নি। অবশ্য শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে আপতিক অর্থ ছাড়াও অনেক সময় কবির রচনায় তা কবি-কল্পনার উপমা এবং প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। পরিণতিতে সমগ্র শব্দটিই হয়তো বিশেষ ভাব বা চেতনার মাধুর্যে হয়ে উঠেছে একান্ত মর্মস্পর্শী। হয়তো হিন্দুশাস্ত্রের দেবদেবী সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞানের জন্যই ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন মৌলভীর দল নজরুলকে 'কাফের' আখ্যা দিয়েছিলেন। হিন্দু সনাতনপন্থীরাও একই নিয়মে কবিকে বিধর্মী আখ্যা দিতে দ্বিধা করেননি। অথচ মুসলিম ধর্মে শাস্ত্রীয় ঐতিহ্য ও প্রবণতা নজরুলের কাব্যে যতখানি আদৃত হয়েছে সমসাময়িক অন্য কোন কবির কাব্যে তা অনুপস্থিত। অতীতের ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর আন্তরিকতা এবং স্বচ্ছ দৃষ্টির ফলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে। আসলে শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে নজরুল ছিলেন স্বাধীনতার সন্তান। ফলে তাঁর স্বকীয়তা যথাযথ শব্দের স্বর্ণমারীচ সন্ধানেই নিরন্তর নিয়োজিত। হয়তো সেটাও সম্ভবপর হয়েছে কবির বিস্ময়কর প্রতিভার অন্তহীন পরিশ্রম ও সাধনার বিনিময়ে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে কোনো বিরাগ বা বিতৃষ্ণা শব্দের ক্ষেত্রে প্রত্যাখ্যানের পথে কখনোই তাঁকে পরিচালিত করেনি। সুতরাং, ঐ একই নিয়মে তাঁর কবিতায় অসংখ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধ নরনারীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। কোনো কোনো রচনায় অকস্মাৎ অতিরিক্ত নামের ব্যবহার কাব্যিক সুষমার ক্ষেত্রে প্রতিকূল বলে মনে হতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে কবি ধ্বনির তরঙ্গের মধ্যে আবেগের স্রোতকে উজাড় করে ঢেলে দিয়েছেন বলেই এমনটি ঘটতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রায়শঃই ছিলেন একান্ত শিশুর মতই অবাধ্য। কৌতূহলের নেশায় কবি এমনি বহুবিধ শব্দের তরঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন।

সংস্কৃত শব্দাবলীর মধ্যে তৎসম শব্দের ব্যবহারের পাশাপাশি নজরুল তদ্ভব এবং অর্ধতৎসম শব্দের অবাধ ব্যবহার করেছেন। ইতিপূর্বে কাব্যের ক্ষেত্রে তদ্ভব শব্দের আধিক্য থাকলেও নজরুলের ক্ষেত্রে তদ্ভব শব্দের ব্যবহার বেশী পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়েছে।

বৈদেশিক শব্দের মধ্যে নজরুল সর্বাপেক্ষা অধিক ব্যবহার করেছেন আরবী ও ফারসী। আরবী-ফারসী ব্যবহারের ক্ষেত্রে আবার তিনটি ভাগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন—মিশ্র আরবী-ফারসী, মিশ্র যৌগিক আরবী-ফারসী, মিশ্র যৌগিক আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-বাংলা। যেমন—

আতর+দানী—আতরদানী (আরবী-ফারসী) মিশ্র আরবী-ফারসী

খুন+খারাব=খুনখারাব (ফারসী-আরবী) মিশ্র যৌগিক ফারসী-আরবী

ফুল+বাহার=ফুল-বাহার, শ্বেত+শয়তান=শ্বেত-শয়তান, সবুজ+সুর=সবুজ-সুর, আজাদ+মুক্ত=আজাদ-মুক্ত, প্রাণ+আঙ্গুর=প্রাণ-আঙ্গুর, (মিশ্র যৌগিক আরবী-ফারসী-সংস্কৃত-বাংলা।)

সমসাময়িক বাংলা কবিতায় অনুরূপ আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, গোলাম মোস্তাফার প্রভৃতির কাব্যেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একমাত্র মোহিতলাল ও নজরুল ছাড়া অন্য কাব্যে কবিতায় শব্দের তেমন সচেতন প্রয়োগ দেখা যায় না। ইংরেজী ও অন্যান্য ইয়োরোপীয় শব্দাবলীর ব্যবহার প্রধানতঃ তাঁর হাস্যরসাত্মক এবং বিদ্রূপাত্মক কবিতাবলীর ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

দেশজ শব্দের ব্যবহার নজরুলের গীতি কবিতায় প্রায়শঃই সার্থক ভাব প্রকাশের সহায়ক হয়ে উঠেছে। আবার দেশজ শব্দের মধ্যে প্রধানতঃ প্রাচীন, লৌকিক ও সাম্প্রতিক শব্দাবলীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির কোনো চরিত উদ্দেশ্য বা চমক দেবার প্রবণতা কাজ করেনি। এলিয়ট, সিটওএল, লোরকা, এলুয়ার, নেরুদা, ব্রেখ্‌ট ও মন্তালের মত আধুনিক কবিদের ন্যায় নজরুলেরও দেশজ শব্দের প্রতি আকর্ষণ অত্যন্ত তীব্র ছিল। শব্দের ব্যবহারে কার্পণ্যহীন কবিমনের কাছে এই আসক্তি অস্বাভাবিক নয়।

এছাড়া অন্যান্য যে সব শব্দ নজরুল ব্যবহার করেছেন সেগুলো মোটামুটি নিম্নরূপ : ঐতিহ্য, ইতিহাস, সাংগীতিক, বর্ণব্যঞ্জনা, বাগ্‌ধারা ও ধ্বনি। এগুলোকে নির্ভর করে কবি তাঁর অতিরিক্ত শব্দের অলঙ্কার সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য যে কোনো সচেতন কবির ভাবনাতেই ঐতিহ্য বা ইতিহাস গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। নজরুলের কবিত্ব প্রতিভাও এই প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল না। কবির ব্যবহৃত এই জাতীয় অসংখ্য শব্দের মধ্যে দুন্দুভি, নাকাড়া, কাঁসর, ডম্বরু, ঘন্টা, দামামা, ঝাঁঝর, সরোদ, বীণা, বেহালা, সেতার, বেণু ও সারেঙ্গীর মত শব্দও লক্ষ্য করা যায়। অপরদিকে, বাগ্‌ধারা বলতে বোঝায় বিশেষ কোনো গুণ বা প্রকৃতি যা শব্দ বা শব্দাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিতব্য। এই জাতীয় শব্দের ব্যবহারের ফলে কবিতার বিষয়বস্তু অর্জন করে বিশেষ এক কাব্যধর্মী তীক্ষ্ণতা যা পরিণতিতে হয়ে ওঠে একান্তভাবেই শৈল্পিক। উপরন্তু প্রচলিত শব্দের আধিক্য এই বাগ্‌ধারার মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়ায় ফলে পাঠকের মধ্যেও এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়ে ওঠে। নজরুলের বাগ্‌ধারা মিশ্রিত কবিতা-

গুলির জনপ্রিয়তা এই প্রসঙ্গেই উল্লেখ করা চলে। 'বিষের বাঁশী', 'চন্দ্রবিন্দু', 'জিঞ্জীর' ও 'সাম্যবাদী'র অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির মধ্যে বাগ্ধারার যথাযথ প্রয়োগ ও সার্থকতা কবির ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর সারল্য প্রকাশের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। যেমন খোদার উপর খোদকারী, ধামা-ধরা, ঢাক্ ঢাক্ আর গুড় গুড়, চিনির বলদ ইত্যাদি শব্দগুলি অত্যন্ত প্রচলিত হবার ফলে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবির ভাব প্রকাশের বেলায় এগুলির সাফল্যও আশ্চর্যজনক। কবিতার বিষয়বস্তুর রূপায়ণেও এই সকল শব্দ যথেষ্ট পরিমাণে নজরুলকে সাহায্য করেছে। বস্তুতঃ, শব্দের বহু বিচিত্র প্রয়োগের মধ্যেই কবি আবিষ্কার করেছিলেন সাফল্যের ধ্রুপদী আভাস।

শব্দের মাধ্যমে বর্ণাভাস সৃষ্টি করার প্রবণতা তাঁর কবিতায় অনেকক্ষেত্রে প্রবল হয়ে ধরা পড়েছে। বর্ণের অজস্র রূপমিশ্রিত দীপ্তি বা প্রগাঢ়তাময় শব্দের দৌলতে বহু ক্ষেত্রেই কবিতা হয়ে উঠেছে বর্ণের স্নিগ্ধ পরিক্রমা। রোম্যান্টিকতার এটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবণতা বলা চলে। রোমান্টিক কবিদের এই বর্ণোচ্ছলতা কাব্যের ক্ষেত্রে রোম্যান্সের মেজাজকে আরও তীব্র করেছে। পাঠকের কাছে ধরা দিয়েছে অজস্র শব্দের মিশ্রিত তরঙ্গমালার বর্ণ-মধুর দ্যুতি। কবির প্রিয় বর্ণ লাল এবং নীলের ব্যবহার তাঁর কবিতায় অধিক। এছাড়া কবিমানসের আবেগ, সুখ, স্ফূর্তি, আনন্দ, ক্রোধ, বিষাদ, হতাশা ইত্যাদি বোধের প্রকাশ ঘটেছে অনুরূপ বর্ণের ব্যবহারের মধ্যে। দুই বর্ণ থেকে বেরিয়ে আসা বর্ণের ব্যবহার ভিন্ন ক্ষেত্রে কবিকে অত্যধিক সাফল্য এনে দিয়েছে। সেই সব আভাষিত রক্তাক্ত, গোলাপী, গৈরিক, রক্ত, মদিরা বা নীলাভা যুক্ত বর্ণের ব্যবহার বিশেষ বিশেষ অর্থকে প্রকাশ করে আবিষ্কার করেছে শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা। রক্তিম বর্ণের ভেতরে কবি খুঁজে পেয়েছেন যৌবন তথা বিজয়ীর প্রত্যাশা। নীল বর্ণ প্রতিনিধিত্ব করেছে নজরুলের বেদনা-বিরহ তথা দুঃখ বা মৃত্যুর ভাবনাকে। অপরদিকে সবুজ বর্ণে কবি তারুণ্যের উচ্ছ্বাস, আবেগ ও উদ্দামতাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন, যেমন একদা করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তাঁর রচনায় কালো রঙ অজ্ঞাত সুদূরের ভাবনা এবং অব্যক্ত অনুভূতির দ্যোতনা হিসেবে কাজ করেছে।

কবিতায় বর্ণের বহু বিচিত্র ব্যবহার বাংলা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও বিহারীলাল, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও যতীন্দ্রমোহনের কাব্যে যেমন ঘটেছে তেমনি সমসাময়িক জীবনানন্দের কাব্যে ঐ বর্ণই কবির শ্রেষ্ঠ মূলধন। ইয়েট্স, এলিয়ট বা হান্স করোসার মত নজরুলও অন্তঃস্থ আবেগ ও ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতম তূণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন শব্দকে। ইয়োরোপে বর্ণের এই

অনুভূতিজাত সম্পদকে কেউ কেউ বলেছেন, আত্মার নির্যাস। তাঁদের মতে, কাব্যের বর্ণব্যঞ্জনা ও সৌরভ কবির আত্মারই প্রতিফলনমাত্র। তরুণ কবি র‍্যাবোর মনেও শব্দের এই দৃষ্টিকোণটি ধরা পড়েছিল।

নজরুলের কাব্যেও প্রকৃতপক্ষে শব্দ যেন কবির আবেগেরই আশ্চর্যসুন্দর প্রতিবিম্ব। বস্তুতঃ শব্দের বর্ণনার মধ্যে কবির অভিজ্ঞতা ধরা পড়ার ফলে পাঠকের অন্তরে তা সহজেই সাড়া তুলতে সমর্থ হয়েছে। ফলে রঙ তাঁর অধিকাংশ কবিতায় প্রতীক হিসেবেই পরিচিত। আবার একই শব্দকে বিভিন্ন ভাবের প্রতীক হিসেবে একই কবিতায় যথাযথ নৈপুণ্যের সঙ্গে কবি ব্যবহার করেছেন। প্রসংগত 'খুন' শব্দটির কথা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা যায়। খুন শব্দটি সম্পর্কে একদা মোহিতলাল-এর প্রবন্ধে যে অস্বস্তিকর আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার জবাব নজরুলকে রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'বড়োর পিরীতি বালির বাঁধ' নামক আলোচনার মাধ্যমে দিতে হয়েছে। একই উদ্দেশ্য নিয়ে, কবি 'বুলবুল' শব্দটির বিচিত্র ব্যবহার করেছেন। অবশ্য পাখীর নামের প্রভাব নজরুল কাব্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বুলবুলি ছাড়াও কবির রচনায় পাপিয়া, কোকিল, কেয়া, চকোর ও চাতকের কথা প্রায়শঃই উল্লেখ করতে দেখা যায়। সেখানেও পাখীর গায়ের রঙ কবির অনুভূতি প্রকাশের সহায়ক হয়ে ধরা পড়েছে। ধ্বনির মর্মরিত আভাষ সংযুক্ত হয়ে নজরুলের কবিতায় দেখা দিয়েছে অজস্র মাধুর্যমিশ্রিত ইংগিত।

কবির কাব্য পর্যালোচনা করলে ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও কলার প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়। দেখা গেছে, এই চারটি ক্ষেত্র থেকেই কবি ইচ্ছেমতো শব্দ চয়ন করে কাব্যের মালা গেঁথেছেন। এলিয়ট একদা বলেছিলেন, "On the other hand, poetry as certainly has something to do with the morals, and with religion, and even with politics perhaps, though we cannot say what."*

শব্দের ক্ষেত্রে ঐতিহ্যপ্রসূত চেতনার প্রভাবে নজরুলও নীতিবোধ ও ধর্মীয় শব্দের ব্যবহারের আগে কাব্যিক ভাবনার কথাই স্মরণ করেছিলেন। ঐতিহ্য বিস্মৃতি কবির কখনোই অভিপ্রেত ছিল না। তিনি তাই ধর্ম, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও কলাকে কোথাও বিস্মৃত হননি। বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্যকে কবি অনুভব করতে চেয়েছিলেন ঐতিহ্যের মাধ্যমে। সুতরাং শব্দের স্থলে কবি বিভিন্ন

* The Sacred Wood—T.S. Eliot, (P-X.)

মানসিকতার মধ্যেও ঐতিহ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কবির অর্জিত সরলতার মধ্যে ঐতিহ্যের নবীকরণ তাঁর উদাত্ত মানবিকতারই পরিচায়ক মাত্র।

তাঁর কবিতায় শব্দের ব্যবহার প্রসঙ্গে একটি বৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ইতিপূর্বে সাহিত্যে যে সব শব্দ অনাদরে কোথাও স্থান পায়নি নজরুল সেগুলিকে প্রয়োগকৌশলের অনন্যতায় গ্রাহ্য করে তুলেছিলেন। অবহেলিত অন্ত্যজ শ্রেণীর শব্দাবলী কেবলমাত্র ব্যবহারের গুণেই কবিতার ক্ষেত্রে পাকাপাকিভাবে একালের কাব্যে এইভাবে ঠাঁই পেয়েছে।

আরবী-ফারসী ভাষা থেকে কবি যে সব শব্দ বীররসাত্মক বা উজ্জীবনী প্রবণতার সূত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন সেগুলির ব্যবহার বিস্ময়কর সাফল্যে চিহ্নিত। শব্দের সনাতনী বাঁধনকে ছিন্ন করে কবি বাংলা শব্দের সামনে এনে দিলেন ভবিষ্যতের স্বর্ণপ্রসূত এক সম্ভাবনাকে। পরবর্তীকালে তাই কল্লোল গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে এই প্রবণতা যথেষ্ট প্রভাববিস্তার করেছিল। শব্দের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবি যেমন অমিতব্যয়ী তেমনি অসতর্কতাও তাঁর রচনায় হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে দ্রষ্টব্য। কিন্তু কবি নিজেই বলেছেন—

"...আমি আর্টের সুনিশ্চিত সংজ্ঞা জানিনে, জানলেও মানিনে।...এই সৃষ্টি করলে আর্টের মহিমা অক্ষুণ্ন থাকে, এই সৃষ্টি করলে আর্ট ঠুঁটো হয়ে পড়ে—এমনিতর কতকগুলো বাঁধা নিয়মের বল্গা কষে কষে আর্টের উচ্চৈঃশ্রবার গতি পদে পদে ব্যাহত ও আহত করলেই আর্টের চরম সুন্দর নিয়ন্ত্রিত প্রকাশ হলো —একথা মানতে আর্টিস্টের হয়তো কষ্টই হয়, প্রাণ তাঁর হাঁপিয়ে ওঠে।"*

প্রসঙ্গত: টমসনের উক্তিটি স্মর্তব্য।** তাঁর মতে কবিতা সাধারণ মানুষের সম্পদ, মুখে মুখে তা ফিরবে। সুতরাং তার প্রকাশ হবে সহজ সরল, সাধারণ মানুষের উপযোগী। নজরুল তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া কবিতা হোলো অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্প। সুতরাং, শিল্পের প্রকাশ্য বিষয় যে কোনো বস্তু বা আবেগ নয়, বিষয় হচ্ছে সুষমাবোধ বা ছন্দোবোধ, এক কথায় সৌন্দর্য। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সৌন্দর্যই হোলো শিল্পের মূল কথা। আবার এই সৌন্দর্যবোধ অর্জিত হতে পারে স্বতন্ত্র ভাবার্জিত প্রেরণা থেকে। কবিদের নিজস্বতা ভিন্ন এ জাতীয় কোনো অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব নয়।

* অধ্যক্ষ ইব্রাহীম খাঁকে লিখিত পত্র।

** ...** Poetry has nothing to do with books at all. Most of them are illiterate. It lives on their lips. It is common property. (Marxism and Poetry—George Thomson, p.6.)**

এই জন্যই কবি কোনো আঙ্গিক প্রকরণকে অনুসরণ করেননি। বরং তাঁর বেপরোয়া আবেগেরই উদ্দামতার বিনিময়ে তিনি অর্জন করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন এক নিজস্বতা। তাঁর সাহসের, বীর্যের এবং মর্যাদার অনমনীয় ঋজুতারই প্রকাশ তাঁর সহজ সরল শব্দ চয়নে লক্ষ্য করা যায়।* পাশাপাশি 'ছায়ানট' এবং 'দোলন-চাঁপা' কাব্যগ্রন্থে কবি অপেক্ষাকৃত নরম শব্দের ব্যবহার করে প্রমাণ করেছেন তাঁর প্রতিভার ভিন্নমুখী সাফল্য। সমসাময়িক প্রবণতার জোয়ার সকলকেই অকস্মাৎ সে সময় আত্মস্বতন্ত্রতার পথে ঠেলে দিয়েছিল। হয়তো এর মূলে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংস্কৃতাশ্রয়ী শব্দের বিনিময়ে তিনি অজস্র বাংলা শব্দের ব্যবহার করেছিলেন এবং ফলে প্রচলিত শব্দের বিনিময়ে রবীন্দ্র প্রভাব এড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা ছিল প্রায় অকল্পনীয়। ফলে স্বাতন্ত্র্যবোধ সকলের পক্ষেই কম-বেশী পরিমাণে সে সময়ে বর্তমান ছিল। নজরুল এর ব্যতিক্রম হতে গিয়েই আরবী-ফারসীর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। এই সব শব্দের চয়নে যে মানসিক প্রবণতা এবং জ্ঞান থাকা প্রয়োজন নজরুলের তা যথেষ্ট পরিমাণে থাকার ফলে শ্রুতিসুন্দর প্রয়োগে তাঁর দক্ষতা প্রায় উপমার মতোই পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে, এই সব আমদানীকৃত শব্দ তাঁর রচনায় যুক্ত হয়ে কবির নিজস্ব ভাষায় মিশে গিয়েছিল। এবং নির্মিতির অপরূপতায় ঐ সকল শব্দ একের পর এক চিত্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর রচনার সম্পদে পরিণত হয়েছে। আর এ কাজে তাঁকে অনেক রচনার সময় হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতি থেকে পৌরাণিক কাব্য ও কাহিনী-আশ্রিত শব্দকে পাশাপাশি ব্যবহার করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়েছিল। এমন কি যুদ্ধের পটভূমিকার বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে বাংলা শব্দের সাবলীল মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। অবশ্য লক্ষণীয় যে তাঁর ব্যবহৃত বিদেশী শব্দগুলির মধ্যে বাংলা শব্দের মিল অত্যন্ত বেশী। ফলে সহজেই অনুভব করা যায় কবির এই ব্যবহারজনিত ধ্বনি-সঙ্গতি এবং কাব্যের দীপ্তিমান অনুপ্রাস। যেমন মুক্ত আজাদ, গঙ্গা-ফোরাত, গোলাপ মঞ্জরী প্রভৃতি। আবার অন্যত্র কবি পরিচিত শব্দাবলীর স্থলে নিজস্ব প্রিয় শব্দের ব্যবহার করেছেন অতি সহজেই। যেমন দুষমন, জাহান্নাম, জালিম ইত্যাদি। সর্বোপরি কবির শব্দ চয়নে সাংগীতিক প্রবণতা ভিন্নধর্মী শব্দ সুষমা সৃষ্টিতে তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে। এই মানসিকতার বিচারে নজরুল প্রকৃতপক্ষে কাব্যিক

* সঙ্গীতে সুন্দর—সাধনকুমার ভট্টাচার্য, পৃঃ ৪

সংজ্ঞার দিক থেকে এজরা পাউণ্ডের* প্রতিবেশী। শাহাবুদ্দীন আহ্মদের মতে—

"...অতিরিক্ত বৈদেশিক শব্দ ব্যবহার করাতে নজরুলের কবিতা কুৎসিত হতে পারত যদি ওই গান হারিয়ে যেত নজরুলের কবিতা থেকে। নজরুল ইসলাম তাঁর কবিতায়, কবিতার ছন্দে এবং শব্দে, মেলোডি এবং হারমোনির ব্যাপারে ধ্বনির অনুশাসনের অমর্যাদা করেননি। একদিকে যেমন তিনি ঘরোয়া ভাষার অর্থাৎ কমোন স্পিচের উপর নির্ভর করেছেন অন্যদিকে তেমনি মনোযোগ অর্পণ করেছেন শব্দের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী শব্দসমূহের ধ্বনির-প্রতিধ্বনির দিকে। একটি ধ্বনি-তরঙ্গ যে বিন্দুতে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে ঠিক সেই বিলীয়মান ধ্বনির অন্তরাল থেকে অন্য একটি ধ্বনি পূর্বাপর সংগতি বজায় রেখে বেরিয়ে আসছে মেঘান্তরালের চাঁদের মত বিপুল জ্যোৎস্না ছড়িয়ে। বস্তুত চতুষ্পার্শ্বের মনুষ্য কণ্ঠোচ্চারিত এবং প্রকৃতি ও বিহঙ্গের রব এবং গীতি-রবকে তিনি অবিশ্বাস্য ক্ষমতা বলে ধরতে সক্ষম হয়েছিলেন। ফলতঃ নজরুল মোটামুটি সেই সব বিদেশী শব্দই ব্যবহার করেছেন যা স্বদেশী ভাষায় সুপ্রতিষ্ঠিত এবং যা সে সময়কারই ভাষা, এবং তার স্বজাতির ও স্ব-গোষ্ঠির ভাষা,...।"**

এই দিক থেকে বিচার করলে নজরুল সংগীতময় শব্দের ব্যবহারে সহজেই উত্তীর্ণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদিও সেই সব শব্দকে লাভ করতে হয়েছে বাস্তবতার অভিজ্ঞতা এবং অর্জন করতে হয়েছে কাব্য বিষয়ক গভীরতার পরিপূর্ণতা। হয়তো এই উদ্দেশ্যে তাঁকে কখনো ব্যবহার করতে হয়েছে কাব্যের অনুষঙ্গময় শব্দাবলী, বিনিময়ে যা তাঁকে এনে দিয়েছে শব্দের যাদু মিশ্রিত সাফল্য।

রবীন্দ্রনাথের মত নজরুলও তাঁর কাব্যে বহু ক্ষেত্রে বৈষ্ণব পদাবলী থেকে আহরিত শব্দাবলী ব্যবহার করেছেন। ফলে বৈষ্ণব কবিতার স্নিগ্ধতা তিনি

* "Poetry withers and dries out when it leaves music.... Poets who are not interested in music are, or become, bad poets. I would almost say that poets should never be too long out of touch with musicians. Poets who will not study music are defective...."—Literary Essays of Ezra Pound.

** শব্দধানুকী নজরুল ইসলাম—শাহাবুদ্দীন আহ্মদ, পৃঃ ৫৩-৫৪।

"এক 'অগ্নিবীণা' কাব্যে তিনি সাতচল্লিশ বার খুনের ব্যবহার করেছেন। এক 'কোরবাণী' কবিতায় তেরো বার খুন শব্দের ব্যবহার করেছেন।" (ঐ, পৃঃ ৬৭)।

প্রেম বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে মিশ্রিত করে যে নিরীক্ষায় প্রয়াসী হয়েছিলেন, বলা বাহুল্য, তাতে সাফল্য ছিল অবধারিত। মূলতঃ 'বুলবুল' (১ম), 'ছায়ানট' ও 'সিন্ধু হিন্দোল'-এর কবিতায় এই সাফল্যের পরিচয় সুপরিস্ফুট। এই সব শব্দের মধ্যে বিসরি, নিচোর, দোঁহে, তুঁহু, অমিয়, বাদর, বিজুরী, বয়ান, দাদুরী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে একই শব্দের বহুবার ব্যবহার একই কবিতায় দেখা যায়। নজরুলের কিছু কিছু প্রিয় শব্দের মধ্যে 'খুন' শব্দটিই অন্যতম। মিশ্র যৌগিক বা যোগিক শব্দানুসরণে ব্যবহৃত এই শব্দটি বিচিত্ররূপে তাঁর কবিতার ভাষার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। যেমন—খুন-মাতাল, খুন-গৈরিক, খুন-খারাবী, মন-খুনী, খুনিয়ারা, খুনিয়া, খুনেরা, খুন-মাতন ইত্যাদি।

আরবী-ফারসী শব্দ ছাড়াও নজরুল অন্য ভাষার যে সব শব্দের ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে হিন্দী ও মারাঠী ছাড়াও তুর্কী, পর্তুগীজ এবং বর্মা ও চীনা ভাষা থেকে আহরিত শব্দ লক্ষ্য করা যায়। যথা লেড়কী, বেটা, পিয়ো, ডেরা (হিন্দী), পিণ্ডারী (মারাঠী), লাশ, চাকু (তুর্কী), বিস্কুট (পর্তুগীজ), লুঙ্গি (বর্মী), লুচি, চা (চীনা) ইত্যাদি। উর্দু শব্দের সংখ্যা নজরুলের কাব্যে অজস্র। যেমন তেরি, কিয়া, বরবাদ, আবে, কি : পরওয়া ইত্যাদি।

কবির শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পৌরাণিক চরিত্র বা ঘটনার উল্লেখ (myth) গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে বলা চলে। সেই সব শব্দের গভীরে ইতিহাস মিশ্রিত হয়ে নতুন প্রতীকে পরিণত হয়েছে। ফলে মিথ্ মিশ্রিত শব্দাবলী তাঁর কাব্যে হয়ে উঠেছে একান্তভাবেই নিজস্ব এবং কবির অনুভূতির আত্মীয়ের মতই সেগুলি সৃষ্টি করেছে নবতম কাব্যিক সৌন্দর্যের তরঙ্গমালা।

অপেক্ষাকৃত কাব্যে কম ব্যবহৃত পরিচিত শব্দকেও নজরুল ব্যবহার করেছেন। যেমন, লাথি, ঝাঁটা, গোঁফে, ঠুকি, হাতুড়ি, থুথু, কাতুকুতু প্রভৃতি। পাশাপাশি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে কবি অনেক পরিচিত গ্রাম্য শব্দকেও কবিতার অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। সাঁই সাঁই, পাঁই পাঁই, ডিমি ডিমি, ঝিনঝিন, টুল টুল, ইত্যাদির মত অজস্র শব্দকে এর উদাহরণ হিসেবে দেখানো যেতে পারে। অবশ্য এ সব শব্দ ব্যবহারের মূলে মিলের প্রতি অধিকতর নজর দেওয়া হয়েছে, যদিও এর ফলে কাব্যের মৌলিক স্বার্থের কোথাও কোনো হানি ঘটেনি।

সামগ্রিকভাবে নজরুলের কাব্যদর্শনের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টিদান করলে দেখা যাবে যে তাঁর বক্তব্যের অনিবার্যতার প্রভাবেই কাব্যের প্রয়োজনকে স্মরণে

রেখে শব্দের ক্ষেত্রে বহুবিচিত্র শব্দাবলীর আবির্ভাব ঘটেছে। এবং তাঁর ব্যবহৃত শব্দগুলিও পারস্পরিক সঙ্গতির মাধ্যমে যথারীতি পাঠকমনে, চেতনার ঐক্যস্রোত প্রবাহিত করতে সক্ষম হয়েছে। মূলতঃ কবির শিল্পচেতনাই এক্ষেত্রে অর্জন করেছে নবতর এক ভঙ্গিমা। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে শব্দের ক্রমাগত উচ্চারণের প্রভাবে পাঠককে উপহার দিতে পেরেছেন সুখের শিল্পজাত প্রগাঢ়তা। ফলে শব্দ ব্যবহারের পদ্ধতি তাঁর কাব্যে কখনোই বিশেষ প্যাটার্ণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ওঠেনি। বরং শব্দের স্বরগ্রামের তীব্র ব্যবধান সত্ত্বেও আবেগের আন্তরিকতার গুণে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠেছে। একথা ঠিক যে কবিতার নিজস্ব প্রয়োজনে আবেগকে নির্ভর করে তাঁকে যুগপৎ হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণ করে শব্দ সংগ্রহ করতে হয়েছে। কিন্তু সেইসঙ্গে কবির ঐতিহ্যচেতনা পারসিক ঐশ্বর্যে ভরপুর হয়ে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে ফিরে পেতে সক্ষম হয়েছে কাব্যের নিত্য-প্রবহমান অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতা।

প্রসংগত নজরুলের ব্যর্থতার উল্লেখ করে জনৈক সমালোচক লিখেছেন—

> তাঁর "কাব্যরীতির শব্দ-ব্যবহারের ব্যর্থতা সেখানেই যেখানে তিনি বক্তব্য প্রকাশের প্রবল গরজে শব্দের সীমাবদ্ধ অর্থকে স্বেচ্ছায় চূর্ণ করেননি। এই অনীহার কারণ কিছুটা নজরুলের সমসাময়িক যুগ-জীবনে এবং কিছুটা তাঁর ব্যক্তি-জীবনের মূলে নিহিত…কবিতার শব্দ যেমন কোনো বিশেষ জাতি অথবা গোত্রবদ্ধ নয়, তেমনি তার নিপুণ প্রয়োগও সব কবির আয়ত্তাধীন নয়।…"*

নজরুল নিজস্ব চারিত্র্যগুণেই অভিজ্ঞতার দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এর ফলে নিরীক্ষার ছাপ অনেকক্ষেত্রে ব্যাকরণসঙ্গত হয়নি। কিন্তু এই ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে যায় তাঁর উপলব্ধিজাত সত্যের আবেগমণ্ডিত প্রাখর্যের প্রসাদগুণে। সুতরাং শব্দ চয়নে তাঁর আপাত ত্রুটি সত্ত্বেও তিনি সামগ্রিকভাবে বিস্ময়কর সাফল্যে পরিপূর্ণ।

শব্দাবলী ব্যবহারের সঙ্গে ছন্দ সম্পর্কীয় আলোচনাটি সহজেই এসে পড়ে। শব্দের মতই ছন্দ নিয়ে কবি বিচিত্রতর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং, বলা বাহুল্য তাতে তিনি সাফল্যও লাভ করেছেন।

* নজরুল সমীক্ষা (নজরুল কাব্যে শব্দ ব্যবহার: আবেগ-উদ্দীপনার অনুষঙ্গ)—আবু হেনা মোস্তফা কামাল। সম্পাদনা—মোহাম্মদ মণিরুজ্জামান, পৃঃ ২২৭।

বাংলা ছন্দের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিনটি ধারা বর্তমান—যথা স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্ত। এছাড়া প্রস্বরের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ছন্দের নাম প্রস্বরমাত্রিক ছন্দের নামও উল্লেখযোগ্য। প্রস্বর ছন্দের চারিটি বিভাগের মধ্যে প্রথম স্বরটি মুক্ত হলেও পরবর্তী তিনটি স্বর বদ্ধ। নজরুল এই ছন্দের ব্যবহার করেছিলেন 'দীওয়ান-ই হাফিজ' কাব্যগ্রন্থে। সেখানে কবি প্রথম তিন পর্বে চারটি সিলেব্‌ল এবং সাতটি কলার সাহায্য নিয়েছেন।

প্রধানতঃ নজরুল যে সমস্ত শব্দ ব্যবহার করেছেন তাঁর মধ্যে আরবী ছন্দ 'মোতাকারিব', 'মোত্‌দারিক' ও 'মোজারাহ' ছন্দ অনুসরণে রচিত রচনাগুলি প্রধানতঃ উল্লেখযোগ্য। এছাডা সংস্কৃত ছন্দানুসরণে শার্দুল বিক্রীড়িত ছন্দের প্রবর্তনাও নজরুলই কবেছিলেন। এই ছন্দে প্রথম চরণটি নিটোল থাকলেও দ্বিতীয় চবণে চতুর্থ ও পঞ্চম স্বর মুক্ত না হয়ে থাকার ফলে ছন্দে কিছুটা কম্পন জাগে। 'চণ্ড বৃষ্টি-প্রপাত' ছন্দটিও সংস্কৃতাশ্রয়ী এবং নজরুল 'শরৎচন্দ্র' কবিতায় এব ব্যবহার কবেছেন।

প্রচলিত বাংলাব ঘরোয়া ছন্দ স্বরবৃত্তে যে পদ্ধতি এতকাল ছিল অর্থাৎ প্রথম ও তৃতীয় পর্বে চতুঃস্বর এবং দ্বিতীয় ও চতুর্থ পর্বে ত্রিস্বরের ক্ষেত্রে নজরুল ত্রিস্বর এবং পঞ্চস্বরের প্রচলন করেছিলেন। কারো কারো মতে, "স্বরবৃত্ত কবিতার মূল পর্বে সাধারণতঃ চাব সিলেব্‌ল ব্যবহৃত হলেই এ-ছন্দের স্বাভাবিক লাস্যগুণ প্রকাশ পায়। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে ছন্দে আসে গীতিকবিতার আমেজ।"* কিন্তু নজরুল সেই নিয়মকে অনুসরণ করেননি। চারমাত্রার বদলে ৩ + ৫ সিলেব্‌লের ব্যবহার ঘটানোর ফলে কবির স্বরবৃত্ত ছন্দের মাধুর্য কোথাও অনুপস্থিত নয়।

'মোতাকারিব' ছন্দে হ্রস্বস্বর, দীর্ঘস্বর ও বদ্ধস্বরের ব্যবহার ঘটলেও নজরুল মোতাকারিব ছন্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মুক্তস্বরের (syllable) প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন। 'মোত্‌দারিক' ছন্দের ক্ষেত্রে মোট আটটি পর্বের মধ্যে প্রায় সব কটির ব্যবহার ঘটেছে 'প্রবর্তকের ঘুর চাকায়' নামক কবিতায়। অপরদিকে, 'মোজারাহ' ছন্দে আটটি পর্বের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও পর্বগুলি চতুঃস্বর। চরণার্ধে প্রথমে প্রথম সিলেব্‌ল ও দ্বিতীয় পর্বের সিলেব্‌ল মুক্ত হলেও বাকী ছয়টি সিলেব্‌ল অমুক্ত। ইতিপূর্বে উল্লিখিত নজরুলের 'চণ্ড বৃষ্টি-প্রপাত' ছন্দ যা

* নজরুল ইসলামের কবিতার ছন্দ : আবদুল কাদের (নজরুল ইসলাম—সম্পাদনা মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, পৃঃ ২৬৫)।

প্রধানতঃ সংস্কৃতের ছাঁচে লেখা, তাতে মোট সাতাশটি অক্ষর লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই ছন্দে সংস্কৃত দুটি লঘু অক্ষরের বদলে বাংলায় বদ্ধস্বর ব্যবহার করেছেন। 'সন্ধ্যা' কাব্যগ্রন্থের কবিতায় এর উদাহরণ মেলে।

সংস্কৃত শিবাষ্টক স্তোত্র ছন্দাশ্রয়ী ছন্দ 'তোটক' নজরুলের প্রিয় ছন্দ। মূল সংস্কৃত তোটক ছন্দে প্রতি চরণে দুটি স্বল্পোচ্চারিত অক্ষরের পর একটি দীর্ঘ উচ্চারিত শব্দের অন্তর্ভুক্তি ঘটিয়ে মোট বারোটি অক্ষরের সমষ্টিতে ছন্দকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। নজরুল 'বিষের বাঁশী' কাব্যগ্রন্থে অনুরূপ ছন্দানুসরণে সামান্য পরিবর্তিত অবস্থায় তাকে ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ে প্রস্বরের বিন্যাস যথাযথ রক্ষা করে পরবর্তী পর্যায়ে ধ্বনিকে মাত্রাবৃত্তে আবদ্ধ রেখে ছন্দকে বাংলায় রূপান্তরিত করা হয়েছে। ফলে প্রতি চরণে দুমাত্রার অতিপর্ব ব্যবহারের পর যথাক্রমে তা তিনটি চার মাত্রার পরে একটি দুই মাত্রায় রূপান্তরিত হোলো। যেমন—

আজ ঘরে ঘরে জ্বলে শুধু শ্মশানে মশান,
হোক্ রোষ অবসান, ত্রাহি ত্রাহি ভগবান; (জাগৃহী)

আরবী ছন্দে রচিত গজলের মধ্যে কবি স্বরবৃত্তের সঙ্গে মাত্রাবৃত্তের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন। মাত্রাবৃত্তের অনুসরণের ফলে মুসলিম পুঁথি থেকে আহরিত শব্দ ও গ্রামীণ শব্দাবলীর ভাণ্ডারে তাঁকে প্রবেশ করতে হয়েছে।

ছন্দের ধ্বনিগত প্রাধান্যের জন্যে বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কবি মেতে উঠেছিলেন। ফলে তাঁর কবিতায় ছন্দ বিষয়ক ভাঙা-গড়া নিরন্তর ঘটেছে। সাত মাত্রাকে তিনি কখনো তিন-চার, কখনো বা দুই-পাঁচ-এর হিসেবে ব্যবহার করেছেন।* কবির সচেতন মনের কাছে এর প্রতিটি ব্যবহারই যেন নতুন হয়ে দেখা দিয়েছে। 'সেতুবন্ধ' নাটকে সাত মাত্রা সার্বিক মাত্রাবৃত্ত বাংলা ভাষায় এইভাবে ছাড়পত্র পেয়েছে কবির রচনার মাধ্যমে।

কবির রচনায় ব্যঞ্জনবর্ণের আধিক্য ও ঘন ঘন যুক্তাক্ষরের বিন্যাস ইংরেজী শব্দের কথা স্মরণে রেখে সৃষ্টি হয়েছে। এর ফলে আঘাতমূলক ছন্দ-স্পন্দের

* 'বিশ্বের সকল ভাষায় ছন্দেই (MORA) কলা হচ্ছে একটি হ্রস্বস্বরের অথবা একটি দীর্ঘস্বরের কাল-পরিমাণ (Duration of a short syllable or half of a long syllable)। বাংলা ভাষায় স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ-ভেদ সুব্যক্ত নয়, কাজেই বাংলা ছন্দে কলা হচ্ছে একটি মুক্ত-স্বরের অথবা একটি বদ্ধ-স্বরের অর্ধেকের কাল পরিমাণ।—আবদুল কাদির।

দ্রঃ একদা 'তোটক' ছন্দে লেখা 'জাগৃহী' কবিতাটি বিপ্লবীদের খুব প্রিয় ছিল।

প্রবর্তন ঘটেছে তাঁর কাব্যে। আবার পর্যাপ্ত হসন্তবর্ণ যতদুর সম্ভব বর্জন করে স্বর-প্রসারণের সুযোগ না দিয়েও বাংলা ছন্দে শব্দাংশগত ঝোঁক আনতে পেরেছিলেন।* যেমন—

ওরে হ'ত্যা-নযাজ সত্যাগ্রহ শক্তি | রুদ্ধে || ধন।

তুর্বল | ভীরু চু | প | হো-ও হে || থাম | কা—স্কন্ধ | মন ||

'খেযা পারেব তরণী' কবিতায় মাত্রাবিন্যাস ও যতির বৈচিত্র্য প্রয়োজনীয় ভাবানুযাযী ছন্দকে বক্ষা করতে সক্ষম হযেছে। প্রকৃতপক্ষে, ছন্দ এই কবিতায় ভাবের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে অত্যাশ্চর্য সাফল্য লাভ করেছে।

নজরুলের ছন্দ আলোচনার ক্ষেত্রে প্রকৃতি বিষযক প্রভাবের কথাও সহজেই এসে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে, বাংলা কাব্য বা বাংলা গানের মূলে রযেছে প্রকৃতি-প্রেবণা। কৈশোরেব ওস্তাদ গোদার সাহচর্য ছন্দের ক্ষেত্রে তাঁকে প্রাথমিক জ্ঞানার্জনেব সুযোগ এনে দিয়েছিল। উপবন্তু সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালে জনৈক মৌলভীব** কাছে উর্দু, আরবী, ফাবসী কাব্য ও সাহিত্যের শিক্ষা তিনি লাভ করেছিলেন। ফলে উক্ত ভাষাসমূহের ছন্দকৌশল ছিল কবির আযত্তাধীন। এছাড়া বাল্যকালে কবিব খুল্লতাত কাজী বজলের কাছে কবিতার প্রাথমিক শিক্ষালাভ কবাব সময় তিনি ছন্দের মৌলিক সূত্রগুলি জানবার সুযোগ পেযেছিলেন।

আববী ছন্দ সম্পর্কে তাঁর মত হোলো—

'আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ তেমনি তড়িৎ চঞ্চল, প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চম্‌কে-ওঠা-ওঠা ভাব। অনেক জাযগায ধ্বনি একরকম শুনালেও সত্যি সত্যিই একরকমের নয়,—তা একটু বেশ মন দিয়ে

* নজরুল ইসলামের ছন্দ—সৈযদ আলী আহসান (নজরুল ইসলাম—সম্পাদনা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম)।

** "এই মৌলভীকে না পেলে আমার জীবনে সত্যসুন্দর ও শিবের দর্শন পেতাম না। আমাব যা কিছু শিক্ষা তা এই মৌলভীর কাছেই।"—নজরুল।

বিঃ দ্রঃ—হুগলীতে সংস্কৃতজ্ঞ ও ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ তরুণ কবি গীপতি ভট্টাচার্য ও কবি সুবোধ রাযের কাছ থেকে সংস্কৃত ছন্দের আলোচনা ও শিক্ষা লাভ করেছিলেন্ কবি।

নজরুলের ছন্দ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি : "সত্যেন্দ্রনাথ ছন্দের ছন্দজ্ঞ ও নজরুল ছন্দের ছন্দ-সরস্বতী।"

দেখলে বা পড়লেই বোঝা শক্ত নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর অনুমাত্রায় বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি চপলতা ফুটে উঠেছে…"।* (সাপ্তাহিক 'বিজলী', ১৩২৬)

আরবী সম্পর্কে আমাদের অপরিশীলিত মন এই শব্দ বা ধ্বনির তরঙ্গ যথার্থভাবে উপলব্ধি বোধে অক্ষম। নজরুলের মতে, 'আরবী-ছন্দসূত্রের যেখানে যেখানে × বা + চিহ্ন দেওয়া আছে, সেখানে দীর্ঘ উচ্চারণ করতে হবে।'

নজস্ :

× ×
সূত্র : (১) 'মফা আয়লুন মফা আয়লুন
× ×
মফা আয়লুন মফা আয়লুন।

কটির কিঙ্কিন্ কাঁকন্ কম্পন্
চুড়ীর শিঞ্জিণ্ আকুল কন্ কন্
বাজায় রিন্ঝিন্ নাচায় মোর মন,
ঝিনিক্ রিন্ রিন্। অধীর দিন দিন।

রসজ :

(২) 'মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্
মস্তফ্ আলুন্ মস্তফ্ আলুন্।'

বিল্কুল নদীর বর্ষার মাতন
মন্ আজ অধীর, প্রাণ্ উন্ মাদন
ছল্ ছল্ দুতীর ঝঞ্ঝার কাঁদন
চঞ্চল অথীর। শন্ শন্ গতির

রমল্ : × × × ×
'ফা এলাতুন ফা এলাতুন'
× × × ×
ফা এলাতুন ফা এলাতুন।
খামখা হাঁস ফাঁস্ হাস্তে প্রাণ চায়
দীর্ঘ নিশ্বাস, অমনি হায় হায়

* কাজী নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

নাই রে নাই আশ বাজ্‌লো বেদনায়
মিথ্যা আশ্বাসে। ক্রন্দন-উচ্ছ্বাস।

×
মোতা কারেব্‌

× ×
(৪) ফাউলুন্‌ ফাউলুন্‌
ফাউলুন্‌ ফাউলুন্‌।

কলস-জল! রিনিক্‌ ঝিণ
আবার বল্‌— ঝিনিক রিণ
ছলাৎ ছল্‌ বলুক ফিন্‌
ছলাৎ ছল্‌। কাঁকন মল।

×
সরীএ :

×
(৫) 'মস্‌তফ্‌ আলুন্‌ মস্‌তফ্‌ আলন মফউলাতুন্‌'

লোকজন বেবাক্‌ কণ্ঠের গমক্‌
একদম অবাক্‌ চম্‌কায় চমক্‌
এম্‌নি গান গায়। বিজলী ঝঞ্ঝায়।

×
খফীফ্‌ :

× × × ×
(৬) ফা এলাতুন্‌ মোস্‌তাফ্‌ আলুন ফা এলাতুন।
আস্‌লো ফাল্গুন আস্‌মান জমীন হাস্‌লে বিলকুল!
গাইল বুলবুল শোন্‌ এই অলস ওঠরে খিলখুল!

ময়তস্‌ :

+ +
(৭) মস্‌তফ্‌ আলুন—ফা এলাতুন্‌
মস্‌তফ্‌ আলুন্‌— ফা এলাতুন্‌।

সই তুই শুধাস্‌— কেমনে কই হায়,
প্রাণ মন উদাস কোন সে বেদনায়।

উন্মন হিয়ার ক্লান্ত ক্রন্দন্
কোন্ মোর পিয়ার বক্ষপুট চায়।

মোজারা :

(৮) মফা আয়লুন্—ফা এলাতুন্
মফা আযলুন্-ফা এলাতুন্।

ডাগর চোখ তোর বিজলী চঞ্চল
কাহার চিন্তায় কান্না ছল্‌ছল ?
হিঙ্গুল-লাল্ গাল পাংশু পাণ্ডুব
অধব নীল রং, সিক্ত অঞ্চল।

কামেল্ :

(৯) মোতাফা আলুন্ মোতাফা আলুন্
মোতাফা আলুন্ মোতাফা আলুন্

কুহুতান মদির মন্-আগুন দ্বিগুণ
কবে প্রাণ অধীব, এ যে সেই ফাগুন,
জেগে ওঠ অলস এ যে সেই বাসর
চেয়ে ভাখ্ বধির! মদন আর রতিব'

পয়াফের্ :

(১০) মোফা আল্‌তুন্ মোফা আল্‌তুন্
মোফা আল্‌তুন্ মোফা আল্‌তুন।

কানের তার দুল্ দোদুল্ দুল্ দুল্
কোথায় তাব তুল্ কোথায় তার তুল্ ?
দুলের লাল্ চায় গানের লাল ছায়
শরম পায় গাল নধর তুল্‌তুল্।

মোত্‌দারিক্ :

(১১) ফা এলুন্ ফা এলুন্
ফা এলুন্ ফা এলুন্

তোর অথই (—) পাইনে থই
মন যতই পাইনে থই।
জিন্‌তে চাই মন শুধায়
সই ততই (—) কই সে কই ?

তবীল :

(১২) ফউলুন্ মোফা আয়লুন
ফউলুন্ মোফা আয়লুন্।

চোখের জল। তুহার তুল্
আবার আয় ভাই, দরদ্ বুঝবার
হিয়ায় মোর আপন জন
সোহাগ তোর চাই। এমন কেউ নাই।

মদীদ :

(১৩) ফা এলাতুন ফা এলুন
ফা এলাতুন ফা এলুন্।

হায় এ কান্নার কোন্ সে দূর পথ
নাইক শেষ অন্তে হায়,
কই মা শান্তির পান্থ-বাস যায়
কোন্ সে দেশ ? নাই মা ক্লেশ।

বসীত :

(১৪) মোস্‌তাফ্ আলন্ ফা এলুন্
মোস্‌তাফ্ আলন্ ফা এলুন্।

কোন্ বন্ এমন বুল্‌বুল্ ভ্রমর
শ্যাম-শোভায় বন-বিহগ
প্রাণ মন জুড়ায়, চঞ্চল এমন
চোখ ডুবায় ? আর কোথায় ?

মন্‌সরহ :

\+ +
(১৫) মফ্‌উলাতুন্ মস্‌তফ্‌ আলুন্

\+
মফ্‌ উলাতুন্ মসতফ্‌ আলুন্।

বাদ্‌লা-থম্ থম্ শূন্য ঘোর্ মোর
তায় ঘোর নিশীথ, নাই কেউ দোসর-
মেঘ্‌লা মাঘ্‌ মাস ঝুরছে বায় হায়—
হায় হায় কি শীত। অন্তর তৃষিত!

\+
করাব :

\+ + + +
(১৬) মফাআলুন্ মফাআলুন্ ফা এলাতুন্।

জীবন-সাধন পেলেম আদর
প্রাণের বাঁধন— পেলেম সোহাগ
হায় রে কান্নাই। মনটি পাই নাই।

যদীদ

\+ + + + +
(১৭) ফা এলাতুন্ ফ এলাতুন্ মফা আয়লুন্
রক্ত-লাল বুক ছিন্ন-কণ্ঠের
সিক্ত চোখ-মুখ কান্না শুন্‌বার
হাসায় লোক ভাই। ধরায় কেউ নাই।

মশাকেল

\+ + + +
(১৮) ফা এলাতুন মফা আয়লুন মফা আয়লুন

আজকে শেষ গান, বেদনা সইতেই
বিদায় তারপর জনম যার, নাই
বিদায় চাই ভাই! শান্তি তার নাই।*

* ছন্দ সম্পর্কে নিষ্ঠা আর অনুশীলনে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ নজরুলকে 'ছন্দ-সরস্বতীর বরপুত্র' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।
"নজরুলও গীষ্পতিবাবুর কাছে সংস্কৃত ছন্দের অনুশীলন করতে আরম্ভ করেন।

আরবী ভাষার উপরোক্ত আঠারোটি ছন্দ নিয়ে নজরুল যে চর্চা করেছিলেন তা থেকে তাঁর মুন্সীয়ানা ও সুগভীর নিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

লক্ষ্য করা গেছে যে আরবী ও ফারসীতে 'নোক্তা' ব্যবহার হয় বটে, কিন্তু বাংলায় নোক্তার ব্যবহার নেই। অথচ একটি ছন্দকে নজরুল চালু করেছেন হসন্ত ব্যবহারের মাধ্যমে। ফলে এই ছন্দের ব্যবহার কোথাও ভাষার ক্ষেত্রে বেমানান হয়নি। বরং এতে কাব্যসঙ্গীতের রূপরস মধুরতম ও রূপময় হয়ে ওঠে। এবং সেই নিষ্ঠার ফলশ্রুতি ঘটেছে তাঁর গজল গানের সুর, ছন্দ ও ভাষাগত বৈচিত্র্যে।

যে সমস্ত ছন্দ নিয়ে নজরুল অধিকতর চর্চা করেছিলেন তা হোলো তোটক, শার্দূল বিক্রীড়িতম, সিংহবিক্রড়, অনঙ্গ-শেখর, পঞ্চ-চামর, শিখরিণী, অনুষ্টুপ, মন্দাক্রান্তা প্রভৃতি। প্রয়োজনবোধে ভাব প্রকাশের স্বার্থে দু-তিনটি ছন্দ ভেঙে মিশ্র ছন্দের সাহায্যেও তিনি কবিতা রচনা করেছেন।

'কাজরী' নজরুলের অত্যন্ত প্রিয় ছন্দ। বিলম্বিত 'কাজরী' বা দ্রুত-লয় বিশিষ্ট কাজরী ছন্দ নিয়ে তিনি প্রচুর কবিতা ও গান লিখেছিলেন।

প্রসঙ্গতঃ, সংস্কৃত সাহিত্যের ছন্দ ও শব্দ সম্পর্কে কবির আশ্চর্য ব্যুৎপত্তির কথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন। হুগলীর ছন্দ বিশেষজ্ঞ গীষ্পতি ভট্টাচার্যের* সাহচর্যে এসে নজরুল একদা সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজী সাহিত্যের ছন্দ সম্পর্কে আলোচনা এবং অনুশীলনের প্রেরণা লাভ করেন। বস্তুতঃ, নজরুল সৃষ্ট বহু ছন্দের নামকরণ করেছিলেন স্বয়ং গীষ্পতি ভট্টাচার্য। আর এরই ফলে উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে কবি বিভিন্ন ছন্দকে প্রয়োজনবোধে ভেঙে মিশ্র ছন্দের সৃষ্টিকর্মে মেতে উঠেছিলেন। এই কার্যে কবি শব্দের ধ্বনিমাহাত্ম্য সম্পর্কে সবিশেষ সতর্ক। এলিয়ট Blank Verse সম্পর্কে এই ধ্বনিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। নজরুলও ধ্বনির মাধুর্যকে অপরিবর্তিত রাখার কথা ভেবেই 'যতি' ব্যবহারে সামঞ্জস্য রক্ষার ক্ষেত্রে নিরন্তর সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন।

নজরুলের স্বাভাবিক প্রবণতায় কাব্যরূপ ফুটে ওঠে শ্রুতিধর হিসেবে; ছন্দও ধরতে পারেন শোনার মাধ্যমে। কিন্তু কোন্ ছন্দের কি নাম তা ঠিক করে দেন গীষ্পতিবাবু। কখনও কখনও শব্দ কল্পদ্রুম নামক সংস্কৃত অভিধানের 'ছন্দ' পৃষ্ঠায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন উভয়ে।"—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

* সাপ্তাহিক বিজলী পত্রিকা (১৯২৯), প্রকাশিত (রচনা ১৯১১), পুনর্মুদ্রণ মাসিক বসুমতী (১৩২৯)। ('কাজী নজরুল' ১৯৫৫)।

বিশেষতঃ 'ধূমকেতু' ও 'আগমনী' কবিতায় একই সঙ্গে অমিত্রাক্ষর পয়ারের সাথে আরবী ছন্দের অনুপ্রবেশ লক্ষ্য করা যায়। লক্ষ্য করলে আরও দেখা যাবে যে শব্দচয়নের ক্ষেত্রে কবি প্রধানতঃ ছন্দের প্রয়োজনে বহুক্ষেত্রে 'শব্দ কল্পদ্রুম'এর সাহায্য গ্রহণ করেছেন। সম্ভবতঃ এই ব্যবহারের ফলে ছন্দের স্বার্থে কোনো কোনো অক্ষরমালাকে যথাযথ অনুসরণ করেও কবি যথাক্রমে লঘু এবং গুরু শব্দাবলীর 'যতি'কে কবিতায় সঠিকভাবে আয়ত্তে আনতে প্রয়াসী।

সুদীর্ঘ কবিতা 'ঝড'এর মধ্যেও ছন্দের বিচিত্র সংমিশ্রণ নজরে পড়ে। প্রয়োজনবোধে বিলম্বিত এবং দ্রুততাল ব্যবহারের মাধ্যমে এই কবিতায় কবি অমিত্রাক্ষর ও কাজরী ছন্দের প্রত্যাশিত অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। উপরন্তু লয়ের বিচিত্র ব্যবহারের ফলে কবিতাটির বিষয়বস্তু এবং কাব্যময়তা সহজেই পাঠকমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ, মেঘের খেলা, বৃষ্টির বিচিত্র রূপ বর্ণনা এবং কবির উল্লাস এই কবিতাটিকে পরিণতিতে নিঃসন্দেহে অনবদ্য করে তুলেছে। কবিতার শুরুতেই ছন্দের এই সুষম ব্যবহার যেন একান্তভাবে নিজস্বতারই পরিচায়ক। যেমন—

'ঝড়—ঝড—ঝড আমি—আমি ঝড
শন—শন—শন শন শন্—কড কড কড
বাঁধে মোর আগমনী আকাশ বাতাস বনানীতে,
জন্ম মোর পশ্চিমের অস্তগিরিশিরে'—
যাত্রা মোর জন্মি' আচম্বিতে
প্রাচীর অলক্ষ্য পথ-পানে।

'কাজরী' ছন্দের প্রতি কবির পক্ষপাতিত্ব এই ছন্দের একক ব্যবহারের ক্ষেত্রে কবিকে প্রধানতঃ উৎসাহিত করেছে বলা চলে।

'কাজরী' ছন্দের রূপটিও পাঠকের মনে বিচিত্র এক অনুভূতি জাগাতে সক্ষম। মনে হয় কোনো জলধারা তীব্রবেগে ঝরতে ঝরতে থেমে যাবে বা সামান্য বেগে নামতে থাকবে। গানের ক্ষেত্রে 'কাজরী' ছন্দের বাহার ও তার ব্যবহার অত্যন্ত নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশিত। যেমন—

এস মোর শ্যাম সরসা শ্রাবণের কাজলগুলি
খনিমার হিঙুল শোষা ওলো আয় রাঙিয়ে তুলি
বরষা প্রেম হরষা সবুজের জীবন তুলি
প্রিয়া মোর নীকস-লীলা মৃতে কর প্রাণ রঙিলা।

'শার্দূল বিক্রীড়িতম' ছন্দ :

উত্রাস ভীম ইন্দ্রের রথ
মেঘে কুচকাওয়াজ বজ্রের কামান
চলিছে আজ ; টানে উজান
সোন্মদ সাগর মেঘ-ঐরাবত
খায়রে দোল্। মদ-বিভোল ॥

'সিংহবিক্রড়' ছন্দ :

নাচাব প্রাণ রণোন্মাদ বিজয় গায় গগনময় মহোৎসব
রবির পথ অরুণ-যান কিরণ-পথ ডুবায় মেঘ মনার্ণব ॥

'অনঙ্গশেখর' ছন্দ :

এবার আমার যাত্রা-সুরু অনঙ্গ শেখরে।
পরশ সুখে আমার বুকে কদম্ব শিহরে ॥
কুসুমেষুর পরশকাতর নিতম্ব মন্থরা।
সিনানশুচি স-যৌবনা রোমাঞ্চিত ধরা ॥

উপরোক্ত আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি কবির উপলব্ধিজাত বেদনাও একই ছন্দে কবির অপূর্ণতাজনিত হাহাকারকে প্রকাশ করেছে। যেমন—

এবার আমার পথের সুরু তেপান্তরের পথে
দেখি, হঠাৎ চরণ-রাঙা মৃণাল কাঁটার ক্ষতে।
ওগো আমার এখনো যে সকল পথই বাকী
মৃণাল হেরি মনে পড়ে কাহার কমল আঁখি।

বোঝা যাচ্ছে নজরুল জেনেশুনেই ছন্দের এই বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতার মূলধন সংগ্রহ করতে চেয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ছন্দে কতকগুলি সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। এগুলির মধ্যে কয়েকটি ছন্দের গান 'ছন্দশ্রী' নামে চিত্ত রায়ের পরিচালনায় ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে নজরুল জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে মহাজাতি সদনে পরিবেশিত হয়েছিল। আরও কয়েক বছর পূর্বে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে এই ছন্দের কতকগুলি গান চিত্ত রায়ের পরিচালনায় প্রচারিত হয়।

বিভিন্ন ছন্দের মধ্যে কয়েকটি ছন্দ সহ সঙ্গীতের উল্লেখ করা হোলো :

(১) 'স্বাগতা' ছন্দ। এটি ১৬ মাত্রার ছন্দ। এই ছন্দটির গানের প্রথম লাইন 'স্বাগতা কনক চম্পক বর্ণা'। গানটির গতি এইরূপ—

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬ ৭ ৮	৯ ১০ ১১ ১২	১৩ ১৪	১৫ ১৬
স্বা ॰ গ	তা ॰ ক ন ক	চ ম্ প ক	ব র্	ণা ॰

(২) 'প্রিয়া' ছন্দ। এটি ৭ মাত্রার ছন্দ। এই ছন্দের গানের প্রথম লাইন 'মহুয়া বনে বন পাপিয়া'। গানটির গতি এইরূপ—

১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭	১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭
ম হু	য়া ॰ ব	নে ॰	ব ন	পা ॰ পি	যা ॰

(৩) 'মন্দাকিনী' ছন্দ। এটি ১৬ মাত্রার ছন্দ। এই ছন্দের গানের প্রথম লাইন হোলো 'জল ছল ছল এসো মন্দাকিনী'। গানটির গতি এইরূপ—

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬	৭ ৮ ৯	১০ ১১	১২ ১৩ ১৪	১৫ ১৬
জ ল ছ ল ছ ল	এ ॰ সো	ম ন্	দা ॰ কি	নী ॰

(৪) 'মঞ্জুভাষিণী' ছন্দ। এটি ১৮ মাত্রার ছন্দ। এই ছন্দটির গানের প্রথম লাইন 'আজো ফাল্গুনে বকুল কিংশুকের বনে'। গানটির গতি এইরূপ—

১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭ ৮ ৯ ১০	১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬	১৭ ১৮
আ জো	ফা ল গু	নে ॰ ব কু ল	কি ঙ্ শু কে ব র	নে ॰

(৫) 'মণিমালা' ছন্দ। এটি ২০ মাত্রার ছন্দ। এই ছন্দের গানের প্রথম লাইন 'মঞ্জুল মধুছন্দা নিত্যা তব সঙ্গী'। গানটির গতি এইরূপ—

১ ২	৩ ৪ ৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০
ম ন্	জু ল ম ধু	ছ ন্	দা ॰

১১ ১২	১৩ ১৪ ১৫ ১৬	১৭ ১৮	১৯ ২০
নি ত্	তা ॰ ত ব	স ঙ্	গী ॰

নজরুল মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, চারিদিকের ব্যবহৃত পরিচিত কাব্য-রাশিতেই কেবলমাত্র কাব্য নেই। তিনি বুঝেছিলেন কাব্য আছে সেই সব কথাস্রোতের মধ্যে যেখানে বাক্‌ছন্দ নিহিত তারই উজ্জ্বল অভিনিবিষ্ট প্রয়োগে। আর সেই জন্যে কবি এক গভীর স্বচ্ছতায় অবগাঢ় হয়েই চেয়েছিলেন তাঁর কাব্যের উত্তরণ। কেননা তিনি তাঁর সৃষ্ট এবং অধীতব্য বাক্‌ছন্দের বিনিময়ে সেই স্বচ্ছতার সমীপবর্তী হতে চেয়েছিলেন। নজরুলের ছন্দচর্চার সাফল্য এখানেই নিহিত।

নবম পরিচ্ছেদ

সামগ্রিক মূল্যায়ন ঃ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার

প্রখ্যাত ফরাসী কবি এলুয়ার একদা বলেছিলেন—

"...যত কবি আমি জেনেছি সবার মধ্যে আরাগঁই সেই কবি যাঁর আছে সবচেয়ে ন্যায়শক্তি—দানবদের বিরুদ্ধে যাবার ন্যায়শক্তি—এবং একদা আমার বিপক্ষেও। তিনি আমার কাছে উদঘাটিত করেছিলেন সত্যের পথ, আজ আবার তিনি উদ্ঘাটিত করলেন সবার কাছেই যারা বোঝে না যে অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে লড়াই নিজেদেরই জীবনের লড়াই, আশায় প্রস্ফুট জীবনের জন্যে, বিশ্বের প্রতি ভালোবাসার জন্যে।"*

ফরাসী ধর্মঘটী খনিকর্মীদের ওপরে সেনেগালী সেপাইদের অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন মানবপ্রেমিক কবি আরাগঁ। ফলে দণ্ডিত হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর কবিমানসের প্রত্যক্ষ পরিচয় মেলে অপর ফরাসী কবি এলুয়ারের সেই দণ্ড সম্পর্কে উপরি উল্লিখিত ভাষণে। অবশ্য আরাগঁ আজ সমগ্র পৃথিবীর মুক্ত মানসিকতা তথা প্রগতিভাবনা মিশ্রিত পাঠকের একান্ত গর্বের মানুষ। দেশের সাধারণ মানুষের একান্ত প্রিয় আরাগঁর সাথে নজরুলের মিল কিছুটা যেন আপেক্ষিক। আরাগঁ একদা যেমন বিদেশী ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে জঙ্গী সৈনিকের মর্যাদা অর্জন করেছিলেন নজরুলও তেমনি পেয়েছিলেন সমধর্মী বিমুক্ত মানসিকতার বৈপ্লবিক অকুতোভয় প্রাবল্যবোধ-সঞ্জাত চেতনা। আক্ষেপ হয় যখন অনেক সমালোচক সুচতুরভাবে আরাগঁ নামটি একবারও উল্লেখ না করে প্ররোচিত হন প্রধানতঃ বোদ্‌লেয়র অথবা র‍্যাঁবোর সঙ্গে প্রতিতুলনার একমুখী প্রবণতায়। অথচ নজরুল নিরপেক্ষ কাব্যভাবনার বিচারে অনেক বেশী পরিমাণে আরাগঁরই আত্মীয়। যেমন সাদৃশ্য মেলে নজরুলের সঙ্গে রুশী মায়াকভস্কী বা হতভাগ্য লরকার অথবা কমবেশী সমসাময়িক নাজিম হিকমত বা পাবলো নেরুদার কাব্যভাবনার দর্শনে। ফলে সেই নিরিখে নজরুলের কাব্যদর্শনের নবমূল্যায়ন করা সম্প্রতি অত্যন্ত জরুরী হয়ে উঠেছে।

বস্তুতঃ, নজরুল অপেক্ষাকৃত অধিক প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন তাঁর বৈপ্লবিক সত্তার

* সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—বিষ্ণু দে, পৃঃ ৯৩

যথাযথ উন্মীলনে। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদীদের যে ষড়যন্ত্র বিশের দশকে চলছিল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিকাল পরেই তার বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশঃ দানা বেঁধে ওঠে। সার্থক রুশ বিপ্লবের সংবাদ চোরাপথে এদেশে তখন পৌঁছে গেছে। সাম্যবাদী চেতনার সন্ধান মিলছে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। বিপ্লবী নায়ক লেনিনের রচনার অনুবাদ পর্যন্ত ছাপা হয়েছে তাতে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও সে-সময়ে অনুবাদ করেছেন এ জাতীয় কিছু কিছু রাজনৈতিক প্রবন্ধ। ফলে সেই জোয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া নজরুলের সচেতন কবিমানসের পক্ষে অসম্ভব ছিল। অবশ্য সমসাময়িক অনেকেই কাব্যভাবনার দিক থেকে বিচরণ করছিলেন একান্তই শৌখিন মার্গে। কেউ বা রোম্যান্টিকের ছাপ লাগিয়ে আশ্রয় নিলেন নিসর্গে অথবা স্বর্ণসুখ ভবিষ্যতে। আবার পাশাপাশি অনেকে হয়ে উঠলেন অতীতের মায়াকাননবাদে বিশ্বাসী অথবা বিশ্রাম উদ্দেশ্যে ছুটলেন নিরালম্ব কাব্যের সাত্ত্বিক-স্নিগ্ধ তপোবনে। ওদিকে ইয়োরোপে এরই ফাঁকে ফাঁকে চলছিল সামাজিক পন্থের নামে নির্ভেজাল ভাঁড়ামি। ফলে সার্থক লিরিসিষ্টদের সঙ্গে রোম্যান্টিক কবিদের কাব্যচর্চার গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে এল। জীবনমুখী সাহিত্যের চর্চা সেই থেকে ব্যাপ্তি পেল দেশে দেশে। বাংলা কবিতাও তখন হঠাৎ যেন নড়ে উঠল। সে-সময় থেকেই অর্থনীতির বেপরোয়া ধাক্কার গুণে সামাজিক রীতি পরিবর্তনের আভাষ মিলল এ দেশের সাহিত্যে। সুতরাং নজরুল অতি স্বাভাবিক নিয়মেই ফিরে তাকালেন তাঁর স্বদেশের দিকে। অনুভব করলেন রাষ্ট্রীয় অনৈক্যের অন্তহীন দুর্দশার ইঙ্গিত। সামাজিক কর্মকাণ্ডের দ্রুত পরিবর্তনের দিকেও তাঁর চোখ পড়ল। ফলে কাব্যের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে নজরুল স্থিতধী হওয়ার পরিবর্তে স্বচ্ছন্দ হতে চাইলেন। আর এইভাবেই চলল কবির নিজস্ব কাব্যচিন্তার নির্ভয় প্রস্তুতি। সুতরাং তাঁর কাব্যচর্চার অন্যতম অবলম্বন হয়ে উঠল সমসাময়িক সমাজ, রাজনীতি এবং মানুষ। তখন যে পরিবর্তনের আভাষ সমাজের সকল ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল তাকে অস্বীকার না করে বরং তাকেই স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে-ছিলেন নজরুল। প্রগতির স্বার্থে সেদিন কাব্যের স্বধর্মকে যুক্ত করেছিলেন কবি আপন প্রত্যয়ের সঙ্গে। কবির নিজের ভাষায়—

> "আমাকে "বিদ্রোহী" বলে খামকা লোকের মনে ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন কেউ কেউ। এ নিরীহ জাতিটাকে আঁচড়ে কামড়ে তেড়ে নিয়ে বেড়াবার ইচ্ছা আমার কোনো দিনই নেই। তাড়া যারা খেয়েছে, অনেক আগে থেকেই

মরণ তাদের তাড়া করে নিয়ে ফিরছে। আমি তাতে এক-আধটু সাহায্য করেছি মাত্র।"*

সুতরাং কবির বৈপ্লবিক চিন্তাধারা তাঁর মুক্তি মানসেরই প্রতিক্রিয়া মাত্র। আত্মচর্চার চেয়ে সমাজের মঙ্গল চিন্তাই তাঁর কাছে সে-সময় শ্রেয়তর মনে হয়েছিল। এ কার্যে কোনো জটিলতা বা অস্পষ্টতা ছিল না বলেই সম্ভবতঃ তাঁর বিশ্বাস ছিল, "সত্যকে জানবার জন্য বিদ্রোহ চাই। নিজেকে শ্রদ্ধা প্রশংসার লোভ থেকে রেহাই দেওয়া চাই···বিদ্রোহের মতো বিদ্রোহ যদি করতে পাব, প্রলয় যদি আনতে পার তবে নিদ্রিত শিব জাগবেই—কল্যাণ আসবেই।" তাঁর বিদ্রোহী সত্তাকে এই বক্তব্যের আলোকে বিচার করতে হবে। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তাঁর বিদ্রোহী সত্তা কোনো অর্থেই লঘিমা সিদ্ধির মাধ্যম হয়ে ওঠেনি। সমাজচৈতন্যই এর মূলে গভীরভাবে কাজ করেছে। অবশ্য তাই বলে ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার প্রবণতা কখনোই নজরুলের কাব্যে প্রশ্রয় পায়নি। এমন কি তাঁর বিদ্রোহের স্বাক্ষরবাহী কাব্যের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি রীতিমতো বর্তমান। বস্তুতঃ, এরই জন্যে কবির কাব্যশরীরে এসেছে ভাবের অনায়াসলব্ধ জীবনবোধের গভীরতা। এর জন্যে তাঁকে গভীর অ[illegible]তার পথে পা বাড়াতে হয়নি। তবু একথা মানতেই হবে যে, একমাত্র নজরুলই ত্রিশের কাব্যে বিচিত্র পথে ব্যাপকভাবে বিহার করেছিলেন। বোধহয় এর বিনিময়েই কবিমানসের কাছে ধরা পড়েছিল মানবমনের বিচিত্র কান্নাহাসির অনুভূতিময় প্রত্যক্ষ জগৎ। বোঝা যাচ্ছে নজরুলের চিন্তায় গাম্ভীর্য অপেক্ষা অন্তরঙ্গতার মূল্যই বেশী প্রতীয়মান হয়েছে। যদিও এই অভিরুচি কবির একান্তই নিজস্ব। সচেতন কবি ভেবেছিলেন সমাজের প্রয়োজনের কথা, সর্বোপরি ভিন্নধর্মী শব্দের প্রয়োগে কবি আয়ত্ত করেছিলেন একান্ত নব্য অথচ তীব্র সৌন্দর্য তথা ক্ষুরধার মাত্রার এক আশ্চর্য সার্থক সংগতি। নিশ্চয়ই সমগোত্রীয় প্রগতি-ভাবনার শরিক কবিদের মতোই নজরুলের যন্ত্রণার উৎস কবিপ্রকৃতির স্বভাবজাত দ্বন্দ্বে। ফলে কবির স্বকীয় প্রতিভার গুণে প্রায়শঃই এসেছে খণ্ডচৈতন্যের একাগ্র উপলব্ধি। বিনিময়ে ফিরে পেয়েছিলেন শিল্প-সাহিত্যের প্রয়োজনীয় সেই প্রাগাত্মচৈতন্য একদা যা পেয়েছিলেন মহামতি এলিয়ট। তবু স্মরণ রাখা

* সম্বর্ধনা সভায় ভাষণ (১৯৩৯ খৃঃ ১৫ই ডিসেম্বর), এলবার্ট হল, কলকাতা। [সভাপতি—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রধান অতিথি—সুভাষচন্দ্র বসু।]

প্রয়োজন যে কাব্যের রসবোধের বিচারে তাঁর উজ্জীবনী কবিতা কোনো বিশেষ মতবাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাঁর বিদ্রোহকে কবি স্বয়ং ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"উৎপীড়িত আর্ত বিশ্ববাসীর পক্ষে আমি সত্যবারি…আমি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করি নাই—অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি।…"*

কবির এই স্বীকৃতির পরিচয় তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট। বিদ্রোহ কবির কবিতার অন্তর্ভুক্ত বিষয় মাত্র। কাব্যের মৌলিক পটভূমিকার উপরেই এর প্রতিষ্ঠা। কবিজীবনের প্রথম পর্বের বিদ্রোহ তাঁর কবিতার উপজীব্য হলেও পর্বান্তরে বা পালাবদলের কালে ভিন্ন মানসিকতায় উত্তরণের ক্ষেত্রে তা বাধা হয়ে ওঠেনি।

নজরুলের কবিমানস একদা উত্তুঙ্গ জীবনমুখী সংগ্রামের মধ্যে লিপ্ত হলেও পরবর্তীকালে বিপরীতমুখী মানসিকতার মধ্যে আত্মস্থ হয়েছিলেন। কেমন করে কবি ফিরে গেলেন শান্ত স্নিগ্ধ রোম্যান্সের শুচিশুভ্র আঙিনায় এ নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। আত্মসচেতনতাই কি দায়ী ? হতে পারে কবি উচ্ছ্বাসেব উজ্জ্বল প্রাঙ্গণ থেকে একদা ছুটি চেয়েছিলেন। আসলে নজরুলের কাব্যভাবনাই ছিল নিরন্তর দ্বন্দ্বের দোলায় পরিপূর্ণ। ঈশ্বরবাদের বিরুদ্ধে জাগ্রত 'বিদ্রোহী ভৃগু' কবি তাই ঈশ্বরের চরণেই পরবর্তীকালে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে তাই নজরুলের কবিভাবনা নিরন্তর দ্বন্দ্বে মুখর অসংখ্য স্ব-বিরোধিতার পরিপূর্ণ প্রকাশ। তাৎক্ষণিকের বিচারে কোনোটাইকে অবহেলা করা যায় না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই রূপান্তর অবশ্য কবির পরিণতিরই পর্যায়ভুক্ত

প্রকৃতপ্রস্তাবে, কবির বিদ্রোহী সত্তার মধ্যে কবির প্রেমিক সত্তার অস্তিত্ব অদৃশ্যমান ঐক্যের স্বপক্ষে প্রথম থেকেই সক্রিয়। এই দুই ভিন্নধর্মী সত্তার মিলনেই নজরুলের কাব্যে এসেছে পরিপূর্ণতা। তাঁর প্রেম বিষয়ক কবিতার আর্তি বিদ্রোহী সত্তারই অন্তর্লীন একটি সুর হিসেবে বিবেচ্য। তাঁর প্রেমের আর্তি কোনো অবস্থাতেই বিদ্রোহের প্রেরণা হিসেবে দেখা দেয়নি। বিপরীত পক্ষে, কবির প্রেমভাবনা তাঁর বিদ্রোহী অনুভবকেই যেন সর্বদা ঘিরে রেখেছে। তাঁর রোম্যান্টিক মানসিকতা নিরন্তর সৌন্দর্য-অভিমুখী। তাই তাঁর লক্ষ্য ছিল সৌন্দর্যের সেই ভিন্ন জগৎ যেখানে বাস্তবতার অসংগতি বা সৌন্দর্যের দৈন্য অনুপস্থিত। অদেখা জগতের স্পর্শমান সৌন্দর্যের তিয়াসায় নজরুলের রোম্যান্টিক মানস ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সময়কে অতিক্রম করে তিনি পৌঁছোতে চেয়েছিলেন সৌন্দর্যের এক মায়াবী স্পর্শকাতর রাজ্যে। হয়তো

* রাজবন্দীর জবানবন্দী—নজরুল

তিনি চেয়েছিলেন স্বীয় অভিজ্ঞতার চেতনাপ্রসূত উত্তরণ যা তাঁকে পৌঁছে দিতে পারে বাস্তবের প্রবহমানতা থেকে অব্যয় আকাঙ্ক্ষিত ধ্রুবত্বে। ফলে সেই নিরুচ্চারিত আকাঙ্ক্ষা সম্ভবতঃ বেদনার রূপ ধরে তাঁর কবিতার কল্পনায় ক্রমশঃ প্রভাব বিস্তার করেছিল।*

একইভাবে তাঁর প্রেমের কবিতায় অনির্দেশ্যতা গুরুতর প্রভাব বিস্তার করেছে। অর্থাৎ, প্রেমবিষয়ক কবিতায় উপলক্ষ গৌণ হয়ে প্রেমের সংরাগই মুখ্য হয়ে উঠেছে। ফলে কবিতা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রধানতঃ কেবলমাত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিবেচ্য। পরিশেষে, যে আবেগপ্রধান মানসিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর সমস্ত কবিকেই আচ্ছন্ন করেছিল নজরুল নিজেও তাব ব্যতিক্রম ছিলেন না। স্মতরাং বেদনা তাঁর কবিতারই অন্যতম স্মর হিসেবে গণ্য। অবশ্য জীবনমুখী প্রবণতার আকর্ষণে কবি গীতিকবিতার মাধ্যমে যৌবনের স্বাভাবিক দেহতৃষ্ণা বিষয়ক ভাবনা-চিন্তা প্রকাশে দ্বিধান্বিত ছিলেন না। সম্ভবতঃ এরই ফলে তাঁর বর্ণনায় প্রেমের ক্ষেত্রেও শরীর-সর্বস্বতার দ্বন্দ্ব পরিণতিতে প্রেমের বিচিত্রমুখী প্রয়াসকে দান করেছে সম্পূর্ণ একান্ত অথচ এক নিজস্ব ভঙ্গিমা।

অপরদিকে, রোম্যান্টিক ভাবনাব ক্ষেত্রে কল্লোলের প্রভাবসঞ্জাত বাস্তবতার সন্ধানকেও কিন্তু নজরুল একমাত্র সিদ্ধান্ত .ল মেনে নিতে পারেননি। রোম্যান্সেব মধ্যেও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন বিশেষ পরিচালিত মানবিক বেদনা-মিশ্রিত আনন্দকে। ফলে প্রেমের শিল্পরূপের মধ্যে কবি অনুভব করেছিলেন স্মষমাময় অথচ স্মতীব্র সেই পরিচিত যন্ত্রণা, যে যন্ত্রণার কথা বলতে চেয়েছিলেন কল্লোলের অনেকেই। কিন্তু একমাত্র নজরুলই নিজস্ব পরিমণ্ডলে তাঁর স্বভাবের বহুবিধ অনিয়মের অনিবার্যতা নিয়েও পর্যাপ্ত কাব্যময় চাতুর্যালীর সঙ্গে তা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নিঃসন্দেহে এ কাজে তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর বহুবিধ শব্দাবলী যা তিনি অক্লেশে ব্যবহার করেছেন তাঁর কবিতায়।

* "'বিদ্রোহী' কবিতা যেমন রোম্যান্টিক আত্মময়তার ঘোষণায় মুখর, নজরুলের প্রেমের কবিতায় তেমনি রোমান্টিসিজমের অন্যদিক তার আরও বর্ণাঢ্য দিক, সৌন্দর্যলিপ্সার দিক ফুটে উঠেছে। রোমান্টিক কবিকুলের প্রেমের অভিজ্ঞতা এই কল্পনামণ্ডিত বর্ণাঢ্যতার জন্য অপরূপ সৌন্দর্যই শুধু পায় না, প্রেম সৌন্দর্যাকাঙ্ক্ষায় একটা রীতি যেন হয়ে ওঠে। প্রেম যেন একটি ঐন্দ্রজালিক চাবিকাঠি, সৌন্দর্যের অমরাবতীর দ্বার যার যাদুস্পর্শে খুলে যায়।"—আলী আনোয়ার (নজরুল ইসলাম ॥ সম্পাদনা, মুস্তাফা নূরউল ইসলাম, ঢাকা)।

তা সত্ত্বেও কবির রোম্যান্টিক কবিতার ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় ভিন্নমুখী টানের বহুবিচিত্র আকর্ষণ। তাই তাঁর কাব্যে সুন্দরের পাশাপাশি বাস্তব সত্যের টানকে কবি কখনোই অস্বীকার করতে পারেননি। প্রেমের কবিতায় সম্ভবতঃ তাই মাঝে মাঝে খণ্ড কবিতার ক্লান্তি থেকে সরে আসার প্রয়াস সহজেই নজরে পড়ে। এই আর্তি কোথাও কোথাও যেন রীতিমতো স্বগত সংলাপে পরিণত হয়ে ওঠে। অর্থাৎ পরিণতিতে কবির বহুবৈচিত্র্যপূর্ণ স্পর্শবাহী কবিতাগুলি আপন স্বভাব বা প্রবণতার গুণে সহজেই হয়ে ওঠে প্রেমের এক অবিমিশ্র উপহার। লক্ষণীয়, এতে রবীন্দ্রনাথের শুচিস্নিগ্ধ মাধুরীর পবিত্র প্রয়াসের পরিবর্তে পাঠক স্বল্পায়াসে পেয়ে যান অতি পরিচিত মানবিক আনন্দ-বিরহের তীব্র সংবাদ। রবীন্দ্রনাথের বিশালতা এতে অনুপস্থিত, অথচ তা সত্ত্বেও অনুভূতির ঘরোয়া একাত্মময়তায় নজরুলের কবিতাগুলি সহজেই কেমন অন্তরঙ্গতায় মুখর হয়ে ওঠে।

সম্ভবতঃ, রোম্যান্টিক নজরুলের মরমিয়া কবি সত্তা এই কারণেই প্রেম-ভাবনার উদ্বেলতায় ভরপুর। সে ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রবণতার আধিক্য সহজেই অনুমেয়। কোনো উদ্‌ভ্রান্তিসুলভ প্রজ্ঞান্বেষণ এই পর্বে অনুপস্থিত। বরং কাব্যিক বিধির বিচারে কবির সাফল্য এই জাতীয় কবিতায় সহজেই প্রতিভাত হয়েছে। কবির উৎসাহ এই রচনাগুলির ক্ষেত্রে সহজেই অতিক্রম করেছে নিজস্ব সাধ্যের সীমানা। অথচ এসব ক্ষেত্রে আত্মসচেতনতার সমস্যা নেই, নেই কোনো আত্মসচেতন কবিকর্মের আপাতগ্রাহ্য দ্বন্দ্বের সুস্পষ্ট ইসারা। কেবল-মাত্র মনোযোগী পাঠকের ক্ষেত্রে যেটা চিন্তার বিষয়, তা হোলো কবির জীবন-মুখী ভাবনায় ঐক্যের সমস্যা। প্রেমের সম্পূর্ণতা নজরুলের কাব্যেও অনুপস্থিত বলে সেই ঐক্যের সমস্যায় তীব্রতা ক্রমশঃই যেন বেড়ে ওঠে। সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রায়শঃই কবির বর্তমান দিকটির প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা হয়েছে। অথচ একদিকে প্রেমের তিয়াসের অনুভব, অন্যদিকে অতৃপ্তিজনিত হাহাকার কবিকে উপহার দিয়েছে স্মৃতির দৌরাত্ম্য এবং প্রতীকোৎসারী স্মৃতির অন্তহীন যন্ত্রণা। এরই ফলে কবি হয়ে উঠেছিলেন আবেগপ্রবণ অভিমানী এক শিল্পী যিনি বারবার অতৃপ্তের অন্তহীন পথে সহজেই পা বাড়িয়েছিলেন। এই অতৃপ্তিজনিত বোধই তাকে টেনে নিয়ে এসেছিল অধ্যাত্ম উপলব্ধির নিঃসঙ্গ শান্তিময় প্রাঙ্গণে। এই অভিযান যে আর্যোচিত তাতে সন্দেহ নেই। অনেকের মতে এতে বিপ্লবী সত্তার অপমৃত্যু ঘটেছে। বিপ্লবী নজরুল যখন প্রকৃতিপ্রেমিক নজরুল অথবা সাধক নজরুলে রূপান্তরিত হন তখন তাঁরা

স্বভাবতঃই হতাশা বোধ করেন। আবার বৈপ্লবিক ভূমিকার ফলেই নজরুল দীর্ঘকাল ধরে কোনো কোনো মহলে অবহেলিত ছিলেন। সম্প্রতি তাঁর সেই দুর্ভাগ্যের কাল উত্তীর্ণ। স্মরণ আছে একদা নজরুলকে বোহেমিয়ান বলে অভিহিত করার সৌখীন প্রবণতা রীতিমতো ফ্যাশানে পরিণত হয়েছিল। অবশ্য কাব্যের সামগ্রিক পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই পর্বান্তর প্রবণতা অতিশয় প্রাচীন এবং স্বাভাবিক। কিন্তু কবিকে শিল্পীর শুদ্ধতা নিয়ে নিরন্তর নূতনের সাধনায় মগ্ন থাকতেই হয়। অনেক প্রত্যাখ্যান ও বিসর্জনের ক্ষুরধার ও দুর্গম পথে তাঁর নব নব নিরীক্ষার যাত্রা। কাব্যের প্রতীক তাই শিল্পীর মতোই কবির কাছে প্রয়োজন মতো খুঁজে নেয় কবিতার সমস্বর। অনেকে এই পর্বান্তরে বেছে নেন বিভ্রান্তিকর দুর্বোধ্যতা অথবা অফুরান কোনো বিস্ময়করতা। নজরুল হাতে নিয়েছিলেন শেষতম সেই তূণটি। তাই তাঁর কবিতায় এত পর্বান্তর, এত স্ব-বিরোধিতা। স্মরণ রাখতে হবে এ ছাড়া কবির কাব্যের জগতে টিঁকে থাকার কোনো পথ নেই, বোধহয় অধিকারও নেই। যে কোনো শিল্পের সাধনায় প্রথম পর্যটি প্রেমের অর্থাৎ গ্রহণের, দ্বিতীয় পথ বিরাগ বা বিতৃষ্ণার। নজরুলের ক্ষেত্রে এর উল্টোটাই ঘটেছে। কিন্তু সাধনার বলে তিনি শেষোক্ত পথে যাত্রা করেও শেষ পর্যন্ত ফিরে আসতে পেরেছিলেন প্রেমের অন্তহীন সৌন্দর্যে। কাব্যবিচারকালে দুটোকেই সত্য বলে মেনে নেওয়া উচিত।

প্রসঙ্গতঃ, নজরুলের আবেগের কথাই এসে পড়ে। এই আবেগ-প্রবণতা একান্তই তাঁর স্বোপার্জিত। কাব্যের সূক্ষ্ম মননলোকে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত প্রকৃতির মূলে রয়েছে এই বিরোধ। অবশ্য আবেগ কাব্যেতিহাসেরই অন্তর্গত উপাদান। কিন্তু আবেগ পরিমাপযোগ্য নয়। সুতরাং আবেগই কোনো কবির একমাত্র বিচার্যের মাপকাঠি হতে পারে না। তাই বলে আবেগহীনতাও যে কবিকৃতির লক্ষণ নয় একথা স্মরণ রাখা উচিৎ। বরং দেখা যায় যে, আবেগই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবিজনোচিত সৌকুমার্যে কবিকে আবদ্ধ রাখে। বর্তমানে কোথাও কোথাও যে উন্মার্গ সৌখীন কাব্যিক চাল নজরে পড়ে যা মূলতঃ পীড়াদায়ক তা ঐ আবেগের ঘাটতির ফল। এই আবেগের স্রোতে নজরুল গা ভাসিয়েছেন বলে তাঁর কবিতায় মিলের লক্ষণ সুস্পষ্ট। আমাদের দুর্ভাগ্য, কর্মের দিক থেকে তাঁর নবতম আধুনিক প্রচেষ্টা কবিতায় নজরে পড়ে না। নজরুলের ভাষায় তাই অতীতের নিষ্ঠাযুক্ত প্রয়োগ থাকলেও এর প্রয়োগরীতিতে আধুনিক বা পাশ্চাত্ত্য নিরীক্ষার লক্ষণ অনুপস্থিত। আরবী-ফারসী কর্মকে

আশ্রয় করেই তাঁকে স্থান করে নিতে হয়েছিল বাংলা কবিতার দরবারে। তাঁর কবিতার কাব্যালঙ্কার বক্তব্যের জোরে পাঠকের মনে পরোক্ষে স্থান করে নেয়।

মিলের ক্ষেত্রে যে আবেগ তাঁকে তাড়িত করেছে তাই পরিণতিতে দান করেছে কবির ভিন্ন এক স্বকীয় জগৎ। সুতরাং, তাঁর কবিতায় আলংকারিক বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র মননের বুদ্ধিদীপ্ত চর্চার অভাবটুকুকে অভিযুক্ত করা অসঙ্গত। সমসাময়িক কাব্যধারার রবীন্দ্রানুসারী প্রবণতা অধিকাংশ কবিকেই সে-সময় গ্রাস করেছিল। কিন্তু নজরুল সেই প্রতিভার সুদূরপ্রসারী প্রভাব থেকে সরে আসারই পক্ষপাতী ছিলেন। সুতরাং তিনি প্রায় বাধ্য হয়েছিলেন বাংলা ভাষার নতুন শব্দান্বেষণে, গ্রহণ করেছিলেন বাংলা কাব্যে অব্যবহৃত ভিন্নভাষী শব্দাবলীকে তাঁর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন উদারপন্থী মানবতাবাদী। জীবনের নৈর্ব্যক্তিক রহস্য, পরমাত্মার স্পর্শলাভে তাঁর আকুতি একান্তই ঋষিসুলভ। কিন্তু নজরুলের কল্পনায় ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির আত্মীয়, 'প্রভু আমার প্রিয় আমার নহে'। যদিও জীবনের প্রথম পর্বের কবিতার লিরিকাল ভাব উন্মীলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রপ্রভাব এড়িয়ে যাওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। পরবর্তীকালে কবিকে নিজস্ব জগৎ খুঁজে নিতেই হয়েছে। যে শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা রবীন্দ্রনাথের অধীতব্য তাকে গ্রহণ না করে নজরুল স্বকীয়তাকেই পরবর্তীকালে গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রপ্রভাবের সীমানায় অনুপ্রবেশ করেও শেষ পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারাতেই তাঁর কৃতিত্ব। অবশ্য কাব্যিক স্থিতির স্বকীয় ভারসাম্য পেতে তাঁকে অভিজ্ঞতার সীমানার দ্বারস্থ হতে হয়েছে। অর্থাৎ সাধারণ মানুষের অনুভূতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। পাশাপাশি কেবলমাত্র মানবতাবাদী ভূমিকায় নিজেকে আবদ্ধ না রেখে নজরুল বৈপ্লবিকবোধের স্ফুরণে কবিতাকে ব্যবহার করেছিলেন। ব্যক্তিস্বরূপের বৈকল্য যেমন যৌবনের আবেশকে সংগতির বিচারে পরখ করে নেয় তেমনি বৈপ্লবিক অনুভূতিকেও তিনি আত্মস্থ করেছিলেন বাস্তবধর্মী সহমর্মিতায়। ফলে সাম্যবাদী ভাবনায় মানবতাবাদী ভাবনাকে অস্বীকার না করে কবিতাকে সাধারণ মানুষের আঙিনায় তুলে নিয়ে এলেন। এতে ধরা পড়েছে তাঁর নিজস্ব কবিচারিত্র্য। বিক্ষোভ আর যন্ত্রণা তাঁর কবিতায় প্রতিবাদের সুরেই কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং পরিণতিতে তা জয় করতে চায় মানবেতিহাসের অপরিহার্য ভবিতব্যকে। এক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণী ভঙ্গীর অনুভব কবির প্রাতিস্বিক জগতে বিপ্লব ঘটায়। নজরুলের ক্ষেত্রেও চেতনার স্বরূপায়তন ঘটে ঐ বিচিত্র দ্বন্দ্বের যুগল সম্মিলনে। বহির্জাগতিক

জগৎ থেকে কাব্যজীবনের প্রথম দুই পর্বে তাই কিছুই গ্রহণীয় ছিল না। তাতে ক্ষতি হয়নি তাঁর। কল্লোল যুগের অনমুশোচিত অসূয়া তাই কোনোক্ষেত্রেই তীব্র হয়ে ওঠেনি নজরুলের কবিতায়। লক্ষ্যের স্থিরীকৃত ভারসাম্য ভিন্নপথেও এনে দিয়েছিল আকাঙ্ক্ষিত কাব্যিক সাফল্য। এদিক থেকে যতীন্দ্রনাথও কিয়ৎ পরিমাণে তাঁর দোসর হয়েছিলেন। তাঁর রচনায় অতি স্বাভাবিকভাবে যে নির্ভুল পর্বপাত ঘটেছে তার মূলে রয়েছে তাঁরই কবিজনোচিত অকৃত্রিম ঋজুতা, এবং পর্বান্তরে কোনোক্ষেত্রেই তা নিজস্বতা থেকে চ্যুত হয়নি। ফলে একাভিপ্রায়ী হয়েও তিনি যথার্থই লক্ষ্যভেদী। রবীন্দ্রভাবানুষঙ্গকে অস্বীকার করার প্রবণতা তাঁর মধ্যে অহঙ্কারী সীমাবদ্ধ নাটুকেপনায় রূপান্তরিত হয়নি। বরং তাঁর কল্পনার ভাববসে রবীন্দ্রনাথ স্বীকৃত। এর সঙ্গে তাঁর কাব্যিক অভিজ্ঞানের কোনো বিরোধ নেই। যে ব্যঞ্জনার পরিচয় তাঁর কাব্যে মেলে তা কবির বিচিত্র অভিজ্ঞতারই দান। শব্দে অবয়ব ও আর্থ অবয়বের বিরোধ তাঁর কাব্যে তাই অনুপস্থিত। অবশ্য সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রত্যাশার ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে সৌভাগ্যের তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে কাব্যিক ভাবুকতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল কবির অভিজ্ঞতালব্ধ মানবিক ব্যঞ্জনা। অর্থাৎ অভিজ্ঞতার সোপান বেয়ে কবি কাব্যের অধিগত সাফল্যকেই ন করেছিলেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কবির নাটকীয়তার তীব্রতা। হয়তো এই নাটকীযতা তাঁর সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যেই নিহিত। যদিও 'অগ্নিবীণা' বা 'ভাঙার গান'-এর নাটকীয়তা পরবর্তীকালে 'চন্দ্রবিন্দু' বা 'দোলনচাঁপা'র মধ্যে অনেকখানি কমে এসেছে। সেখানে অনুভবগম্যতাই প্রধান। পর্বান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের এই অভিজ্ঞান আভাসিত হয়েছে তাঁর কবিতায়। কাব্যভাবনার অমোঘ নিয়মেই নজরুল অনুভব করেছিলেন কাব্যের অমল তিয়াসা। অতিসচেতন স্বদেশবীক্ষা একদা যেমন তাঁর কবিতায় বিশ্ববীক্ষার পটভূমিতে ব্যাপ্ত হয়েছিল তেমনি ব্যক্তিস্বরূপের দুর্মোচনীয় রহস্যই পরবর্তীকালে কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে ধরা দিয়েছে। অমোঘ শব্দের তুণ হস্তগত ছিল বলেই কবিকৃতির তরঙ্গকম্পনে তা ব্যর্থ হয়নি। শ্রাব্যকল্পের প্রসাদগুণও ছিল নজরুলের করতলগত। ঘটনার বহু ব্যাপ্তি উল্লেখের ফলে জীবনের সুবিশাল উপলব্ধিও তাঁর ভাবনায় স্পষ্টরেখ হয়ে উঠেছে। ঔপনিবেশিক যান্ত্রিকতায় কাতর কবির প্রতিবাদ কবির আন্তরসত্তার গূঢ়তর বাস্তবতার মধ্যেই প্রকাশিত। অবশ্য বর্ণনারীতিতে স্বভাবসিদ্ধ আলঙ্কারিক শব্দগুণের ফলে তাঁর রচনা পৌনঃপুনিকতায় আক্রান্ত। পালাবদলের সময় সেইজন্যেই নজরুলকে আয়ত্ত করতে হয়েছে ধ্বনির তাৎপর্যানুভূতি।

ফলে পরবর্তীকালে অধিকাংশক্ষেত্রেই কবি তা কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন। নতুন শব্দের বিনিময়ে তিনি পাঠকের অনুভূতির সঙ্গে মিলিয়েছিলেন নব নব উপলব্ধি। শব্দ ও প্রতীকের ক্ষেত্রে হেল্ডারলিন† যে ধ্বনিকল্প ব্যবহার করেছিলেন তা নব্য ক্লাসিকতায় পরিপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও কেবলমাত্র শৈল্পিক অন্বেষার গুণেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে শব্দকল্পের প্রয়োগকে কখনো যথেচ্ছ হতে দেননি। নজরুলের কবিতায়ও শব্দকল্পের প্রয়োগে কবির আবেগঘন মানসিক অবস্থার চূড়ান্ত পরিণতি বর্তমান। উপরন্তু, আবেগের তাড়নায় তা আশ্লিষ্ট হলেও কোথাও যথেষ্ট হয়ে ওঠেনি। বিশেষ করে নজরুলের লিরিকধর্মী রচনায় বাক্‌প্রতিমার সঙ্গে সঙ্গে এর সার্থক সংমিশ্রণ ঘটেছে। ফরাসী গ্যেতিয়ের* কাব্যিক মাদকতার আস্বাদ তার কাব্যেও অনায়াসলভ্য। বিনম্র ভাবরসে সিঞ্চিত কবিতার গুণে নজরুল মালার্মের** কাছেও ঋণী। মালার্মেও চেয়েছিলেন বাষ্পময় ফুলের শান্তি। সহজেই মালার্মে তাই বলেন, "নীলিমার পত্রদল বেয়ে ঝরা শুভ্র কান্না যত।—সে দিন পুণ্যাহ, পুণ্য সে তোমার প্রথম চুম্বনে।" এই ফরাসী মেজাজের অনুরণন ঘটেছে নজরুলের 'ছায়ানট' কাব্যগ্রন্থে। কিন্তু র‍্যাঁবোর‡ নাগরিকসুলভ নাটুকেপনা তাঁর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। ফরাসী মেজাজের সঙ্গে অপরিচিত নজরুলের কাব্যে ফরাসী মানসিকতার প্রভাব প্রধানতঃ তাঁর প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। পাঠকের বিস্ময় জাগে তাঁর কাব্যের রোম্যান্টিক প্রকরণে এলুয়ারের§ আশ্চর্য প্রতিবিম্ব দেখে। এলুয়ারের মতো নজরুলও চেয়েছিলেন প্রেমের সঙ্কেতকে ইন্দ্রিয়জ ভাবনার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে। বলা বাহুল্য, এতে নজরুল আশ্চর্য সাফল্যও লাভ করেছিলেন। কিন্তু লুই আরাগঁর£ মতো সামাজিক সচেতনতা থাকা সত্ত্বেও নজরুলের মধ্যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ-ধর্মিতার অভাব ছিল। আন্তর্জাতিক ভাবনার শরিক নজরুল আপন প্রেরণার গুণেই কাব্যের প্রকরণে সচেতন ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আরাগঁর দৃষ্টিভঙ্গী পাশ্চাত্ত্য ভাবনার সুচারু বিশ্লেষণধর্মিতায় শাণিত। তাই নজরুলের স্বভাবজাত সাবলীল প্রেরণাসঞ্জাত এক অনিবার্য প্রেরণা তাঁকে সর্বদাই পৃথক মর্যাদা দান করেছে। যদিও এলুয়ার ও আরাগঁ উভয়ের রক্তে ফরাসী উদ্দীপনার স্রোত প্রবাহিত বলে তাঁদের প্রকরণে উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিদীপ্ততা

† ফ্রিডারিক হেল্ডারলিন; * তেওফিল গ্যেতিয়ে (১৮১১); ** স্তেফান মালার্মে (১৮৪২); ‡ আর্তুর র‍্যাঁবো (১৮৫৪); § পল এলুয়ার (১৮৯৫); £ লুই আরাগঁ (১৮৯৭)।

আবেগকে যথাযথ স্রোতে পরিচালিত করেছে। কিন্তু অভিভাবকহীন নজরুল জানতেন না কোথায় থামতে হবে। কেননা পূর্বসূরীদের মধ্যে যৌবনদীপ্ত আবেগ ও উচ্ছ্বাসের উদাহরণ অনুপস্থিত। অথচ এলুয়ার বা আরাগঁ আপনাপন সিদ্ধির পথে কখনো পরিপূর্ণ অর্থে নৈঃসঙ্গ্য অনুভব করেননি। সুতরাং, প্রতিভার আলোতেই এই কবিত্রয়ের ভাবনাকে বিচার করতে হবে। এদিক থেকে বরং রিল্কের* চেয়ে কারোসার** সঙ্গেই নজরুলের ভাবনার মিল নজরে পড়ে। জীবনের অখণ্ড ঐক্যে আস্থাবান কারোসার মতো নজরুলও কাব্যের মৌলিক রূপায়ণের ক্ষেত্রে অখণ্ড জীবনবোধেই বিশ্বাসী ছিলেন। পাঠকের অভিজ্ঞতায় সেই জন্যেই কদাপি লঘুচিত্ত হাইনেও‡ কখনো বা গ্রহণ করেন শাশ্বত প্রেমভাবনার রহস্যপূর্ণ তন্ময়তা; যদিও বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে এই সংগতির অভাব প্রায় প্রথমাবস্থা থেকেই। সংগতির পীড়া এই শতাব্দীর অধিকাংশ বাঙালী কবির রচনায়ই সেদিক থেকে অনায়াসলভ্য। এমন কি মোহিতলাল বা জীবনানন্দের ব্যক্তিস্বরূপের কৈবল্যচিন্তাও এই ত্রুটি থেকে মুক্ত নয়। ফলে আত্মবঞ্চনার লোভ কবিতার রাজ্যে অনেক আগে সেই কল্লোল যুগেই বেনোজলের মতো প্রবেশ করেছে। একমাত্র ব্যতিক্রম যতীন্দ্রনাথ ও নজরুল। অনুভবের তীব্রতায় এঁরা জীবনকে গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তবের সুকঠিন প্রতারণা এদের ক্ষেত্রে কোথাও বাসা বাঁধেনি। এই যে অতৃপ্ত জীবনাসক্তি তাতে একদা সুর মিলিয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু নজরুলের পরে বলেই সুভাষ আসতে পেরেছিলেন 'পদাতিক'-এর নিশান নিয়ে, যেমন এসেছিলেন সমসাময়িক সুকান্ত। যদিও কল্লোলের জয়ডঙ্কার সঙ্গে সঙ্গে যাঁরা সাফল্যের সিদ্ধিতে স্থির ছিলেন 'উর্বশী' ও 'আর্টেমিশ'এর কবি বিষ্ণু দে তাঁদের অন্যতম। ক্ষমতাবান কবি বুদ্ধদেব বসু ভিন্নধর্মী রচনার চোরাবালিতে ইতস্ততঃ পা বাড়িয়েছিলেন। আর অমিয় চক্রবর্তীর প্রবাস জীবনের রচনায় ব্যঞ্জনার রসাভাস আগের তুলনায় উজ্জ্বল নয়। একমাত্র জীবনানন্দই মৃত্যুর পরে লাভ করেছেন সর্বজনীন স্বীকৃতি। কিন্তু এঁরা সকলেই সমসাময়িকতায় আবদ্ধ থাকলেও স্ব-স্ব বৈশিষ্ট্যে এঁদের সাফল্য অনস্বীকার্য। নজরুলের ক্ষেত্রে যা অনুমেয় তাও ঐ সময় সীমানার মধ্যেই সীমায়িত। তেইশ বৎসরের কাব্যকৃতিতে পর্বান্তর বেশী বলেই কবি তাঁর ভাবনায় কালের প্রহারে অনেক বেশী জর্জরিত। হয়তো এরই ফলে বিভিন্ন

* রাইনার মারিয়া রিল্কে (১৮৭৫); ** হান্স কারোসা (১৮৭৮); ‡ হাইনরিথ্ হাইনে (১৭৯৭)।

প্রেক্ষাপটে অনিবার্য পরিণতিকে কবি সোৎসাহে গ্রহণ করেছিলেন। সম্ভবতঃ কবির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল সঙ্কটকালের কোনো অনাগতের অশ্রুত পদধ্বনিতে। বারংবার এই আকাঙ্ক্ষা পালিত হয়েছে কবির অনুভূতির তন্ত্রীতে। সেইজন্য একান্ত ক্ষণস্থায়ী কোনো আশ্বাস কবির অভিপ্রেত নয়। নাগরিকসুলভ চালিয়াতিও তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত।

প্রথাগত বন্ধন থেকে যাঁরাই যখন বেরিয়ে এসেছেন তখন কী সাহিত্যে, কী শিল্পে বা রাজনীতিতে বিরুদ্ধবাদীদের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠাটাই ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার।

গণবিদ্রোহের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতার শিক্ষাই আমাদের নজরে পড়ে।* নজরুল সাহিত্যের ক্ষেত্রেও 'অগ্নিবীণা' প্রকাশকালে সমসাময়িক বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণ যথাযথ বিদ্যমান ছিল, যদিও তারুণ্যের সাড়ার তুলনায় সনাতন-পন্থীদের স্বার্থযুক্ত সমালোচনা গ্রাহ্য না করলেও চলে। বরং এই সবই ছিল তাঁর সৌভাগ্যের দ্যোতনা। কেননা তাঁর রচনায় অনুষঙ্গসৃজনী শব্দপুঞ্জ যেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে তাতে কবির কাব্যে বিমূর্তায়নের বদলে এসেছে গাঢ় এবং গভীরতর জীবনবোধ। ঐতিহ্যসচেতন কবির হাতে পরিণতিতে কাব্য তাই শিল্পশুদ্ধিতে তৎপর।

পাশাপাশি তাঁর কবিতার পয়ারেই অনির্দেশ্য ভবিষ্যতের অনুষঙ্গবাহী মেজাজটি ফুটে উঠেছে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, সামগ্রিক মূল্যায়নের বিচারে বাংলা তথা বিশ্বসাহিত্যের কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলের স্থান বা ভূমিকা কী হবে? মাত্র তেইশ বছরের মধ্যে কবির বিপুল সৃষ্টির পরিমাণ নিঃসন্দেহে বিস্ময়ের বস্তু। যদিও সামগ্রিক বিচারে তাঁর সব রচনাই শৈল্পিক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। তথাপি দেখা যাচ্ছে জনপ্রিয়তার বিচারে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান ইতিমধ্যেই স্বীকৃত। আগেই বলা হয়েছে যে, এর কারণ হোলো, রবীন্দ্রনাথের দুরতিক্রম্য প্রভাব সত্ত্বেও তিনি যে কেবল তা থেকে মুক্ত ছিলেন তাই নয়, বরং তিনি কাব্যের সৃষ্টির ক্ষেত্রে নতুন একটি ধারারও প্রবর্তন করেছিলেন। অর্থাৎ সম্পূর্ণ রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত কাব্যে যুগপৎ বিপ্লব ও যৌবনের জয়গানের পাশাপাশি প্রেমের বহু বিচিত্র অনুরাগকে কাব্যে নিঃশঙ্ক চিত্তে গ্রহণ করেছেন। এই ভিন্ন চরিত্রের গুণেই তিনি প্রথম থেকেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন।

---

* গরিব গণবিদ্রোহ এবং ভগবান—বিনয় ঘোষ।

এছাড়া তাঁর রচনার অন্যতম গুণ হোলো রচনার পৌরুষ। বাংলা সাহিত্যকে তিনি প্রচলিত নারীসুলভ স্নিগ্ধতার বদলে দান করেছিলেন অমিতবিক্রম তেজোদীপ্ত এক ভঙ্গী। বিশেষ করে দেশজ ভাবনার স্ফুরণ তাঁর কাব্যে ঘটাবার ফলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থান তখন থেকেই নির্দিষ্ট এবং নির্ধারিত। দেশজ ঐতিহ্য এবং শব্দালঙ্কার গ্রহণের প্রশ্নে নজরুল সিটওয়েল,* লরকা** ও মায়াকভস্কির ভাবনাকেই অনুসরণ করেছেন। কাব্যে মাইকেল প্রবর্তিত পৌরুষের নজরুলই যোগ্য অধিকারী। মাইকেলের পরবর্তীকালে সমাজমানসে বিপরীত বিন্যাস ঘটলেও নজরুল তাঁর পৌরুষধর্মী চেতনাকে উজ্জীবনের পথে প্রবাহিত করেছেন। যে ক্রোধ, পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ বাক্‌রুদ্ধ হয়েছিল তা তাঁর কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনতিবিলম্বে বিধ্বংসী অর্থনীতি ও ধনতন্ত্রী ব্যবস্থার পরিণতিতে ক্ষুব্ধ কবি সামাজিক অবস্থার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। যুগের দাবী তিনি যথাযথভাবে অনুভব করেছিলেন। তাঁর কবিতায় বিশেষ করে 'অগ্নিবীণা' বা 'ভাঙার গান' তাঁর সচেতন সমাজভাবনার দ্বন্দ্বোদ্ভব উপলব্ধির প্রতীক। কবিতার শক্তিতে ম্রিয়মাণ জাতির বুকে সঞ্চিত আঁধারের বুকে কবি জাগাতে চেয়েছিলেন জাগরণের রক্ত ঊষা। তাই প্রতিরোধের ভাষা তাঁর কবিতায় [illegible] হয়ে উঠেছে। নজরুলের কবিতা বাংলা কবিতার রাজ্যে এই বৈশিষ্ট্যের গুণেই চিহ্নিত।

কবির দীর্ঘ কবিতাগুলির মধ্যে কবির বক্তব্য কথ্য স্রোত-নির্ভর। এতে তাঁর শক্তিমান তীব্রতা অনুভব করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে পাঠকের সাথে যে আলাপন-প্রবণতাটুকু বর্তমান তাতে লোকালাপনীয় চিরন্তন মাধুর্যটুকু প্রকাশিত। ফলে এই লোকায়ত বাগ্‌ভঙ্গিমার মধ্যে কবির সক্রিয়তার পরিচয় মেলে। ধ্বনিবৈপরীত্যও অনেক ক্ষেত্রে দীর্ঘ কবিতাগুলিকে দান করেছে কবির সৃষ্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন কাব্যিক ব্যঞ্জনা। এছাড়া শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানবিক দুর্জ্ঞেয় বেদনার বদলে প্রাত্যহিক জীবনের অভাব-অনটন জাত বেদনাবোধই অধিকতর গ্রাহ্য হয়েছে। সমসাময়িক মানসিকতার বিচারে এই দৃষ্টিভঙ্গী ছিল একান্ত জনপ্রিয়। সামগ্রিকভাবে রাজনীতি এবং অর্থনীতির মৌলিক প্রশ্নগুলি তাঁর ভাবনায় অমর্ত্য ভাবনার স্থান দখল করেছিল বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছে।

ঐতিহ্যবোধের সঙ্গে সুগভীর আত্মীয়তার প্রয়োজন ও অপরিহার্যতা বোধ নজরুলের সমাজ-চৈতন্যেরই পরিচায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর ব্যবহার কবির

* এডিথ সিট্‌ওয়েল ; ** গার্থিয়া লরকা।

সমাজসত্তা ছাড়াও জীবনের গভীর উপলব্ধিকেই প্রমাণ করে। দেশাশ্রিত মন এবং অন্তর্নিহিত আবেগ মিলিত হয়ে কবির রচনায় ঐতিহ্যের নবরূপায়ণ ঘটেছে। কবির চিন্তায় মানবিক চেতনা ধর্মীয় চেতনার বদলে প্রাখর্য লাভ করায় বিষয়-বস্তুগত দিক থেকে তাঁর কবিতায় ঋতুবদল ঘটেছে বলা যায়। ইতিপূর্বে অধিকাংশ কবির রচনায় ধর্মকেন্দ্রিকতা অন্যতম উপাদান ছিল। এর ফলে মধ্যযুগের কাব্য গতানুগতিকতার শিকারে পরিণত। অথচ মধ্যযুগের কাব্যে পারসী বা ফারসীর প্রাধান্য ছিল উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ধর্মীয় প্রকরণের অত্যধিক প্রভাবের ফলে তার গতি স্বাভাবিক নিয়মেই রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে নজরুলের কাব্যে বিপরীতপক্ষে সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের নবরূপায়ণ ঘটেছে। এবং তাঁর রচনায় এর ফলে বাঙালীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও সামাজিক আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলনও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্যের সম্পর্ক মিশেছিল তাঁর রক্তে, তাতেই অর্জন করেছিলেন সাংস্কৃতিক সাফল্যের ঈর্ষাযোগ্য উত্তরাধিকার। অবশ্য নজরুল ঈশ্বর গুপ্তের মতোই কাব্যের বিষয়বস্তু অবলম্বন বা গ্রহণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উদার ও স্বাধীন। যতীন্দ্রনাথও ঈশ্বর গুপ্তের এই প্রবণতার শরিক ছিলেন।

ইতিপূর্বে ঈশ্বর গুপ্তের নব্যচেতনার কথা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রায়শঃই উল্লেখ করা হয়েছে। সমাজ সচেতনতা প্রসঙ্গেও তাঁকে উল্লেখযোগ্য স্রষ্টা বলে মনে করা হয়ে থাকে। কিন্তু গুপ্ত কবির কবিমানসে যে নাগরিকতার স্পর্শ মেলে তাতে সামাজিক চৈতন্যের পরিচয় পাওয়া যায় না। কেননা সমসাময়িক গণবিদ্রোহ সম্পর্কে তিনি ছিলেন ইচ্ছাকৃতভাবে উদাসীন। ১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহ আমাদের মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের জাতীয়তাবোধ সঞ্জাত চৈতন্যের প্রভাবে সমর্থন পায়নি। পরের বছর সিপাহী বিদ্রোহের বছরেই ঈশ্বর গুপ্ত লিখেছেন :

> চিরকাল হয় যেন ব্রিটিশের জয়।
> ব্রিটিশের রাজলক্ষ্মী, স্থির যেন রয় ॥
> এমন সুখের রাজ্য, আর নাকি হয়।
> শাস্ত্রমতে এই রাজ্য, রামরাজ্য কয় ॥

এই প্রবণতা আমাদের সাহিত্যে নতুন নয়। এমন কি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এ ইংরেজ প্রশস্তি সতর্ক পাঠকের নজর এড়ায় না। এই

বিচ্যুতির সমর্থন মেলে একমাত্র রমেশচন্দ্র দত্তের রচনায়।* 'বন্দেমাতরম' রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্রের মন্তব্য বাদ দিলেও সত্যানন্দ পরিষ্কার বলেন—

"মহাপুরুষ! শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজ্য। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়, এমন শক্তিও কাহারও নাই।"**

সামাজিক উপন্যাসে তাঁর অসাধারণ অপরাজেয় কর্মকৃতি ও দেশপ্রেম সত্ত্বেও এ দিকটার কথা ভাবলে নজরুলের সমাজচেতনার সঙ্গে এই দুজনের মতো অনেকেরই পার্থক্য অনুভব করা যায়। মধুসূদনের চিন্তাধারায় কিন্তু এই সংকট-কাল আসেনি, যদিও বাংলা কবিতা তাঁর হাতেই নতুনত্বের স্বাদ পেয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর মানসিকতার রূপায়ণ প্রাচীন দেবদেবী বিষয়ক চরিত্র চিত্রণের মধ্যেও ব্যাপৃত হয়নি। নজরুলও বিংশ শতাব্দীর মানসিকতাকেই তাঁর কাব্যের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের রচনায়, বিশেষ করে কাব্য রচনার ক্ষেত্রে, ঐতিহ্যের রূপায়ণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। তাঁর গীতিকবিতায় বিশেষ করে নাট্যধর্মী লিরিকে পাত্রপাত্রীর অন্তঃস্থিত অনুভূতি আর কবির অনুভূতিজাত উপলব্ধি পৃথক হিসেবেই চিহ্নিত। বলতে গেলে প্রথমটি দ্বিতীয়টির উপজীব্য বলেই মনে হয়। পাঠককেও স্বভাবতঃই এই দুই অনুভূতিকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে কবির ঐতিহ্যবোধপ্রসূত সচেতনতা। রবীন্দ্রনাথের বেশীর ভাগ গীতিকবিতায় উত্তর পুরুষ স্বয়ং কবি, কবির ভিন্ন কোন কল্পিত চরিত্র নয়। সেক্ষেত্রে কবির সমাজচেতনায় বিংশ শতাব্দীর সুস্থ আধুনিক মননশীলতার প্রতিফলনই ঘটেছে। কবির সৌন্দর্যভাবনা এবং সুপ্রাচীন ঐতিহ্য এ সব ক্ষেত্রে অন্যতম শর্ত। রবীন্দ্রনাথের ছোটো ইংরেজ বড়ো ইংরেজ ভাবনার মধ্যেও কোথাও কোথাও অযাচিত প্রশস্তি স্থান পায়নি। তাঁর সুবিশাল কাব্যিক পরিমণ্ডলে একাধিপত্যের কালেও তিনি গীতিকবি হিসেবেই যে সার্থকভাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন তার মূলেও কাজ করেছে কবির পৃথক অথচ স্বাধীন সেই সত্তা, পরিণতিতে যা বিরাট অথচ ক্লান্তিহীন। তাঁর গভীরতম প্রকৃতির পক্ষেই বোধ করি সহজ ছিল তাঁর কল্পিত প্রয়াসের সম্প্রসারণ অর্থাৎ সংহতির বদলে বৈচিত্র্য এবং বিস্তার। তাঁর সামাজিক সচেতনতা তাই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষাপটে অভিজ্ঞতায় পুষ্ট এবং দীপ্তিতে ভাস্বর।

* গরিব গণবিদ্রোহ—বিনয় ঘোষ। ** আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

অপরদিকে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রধানতঃ রবীন্দ্র পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও স্বতন্ত্র ভংগীতে ভাস্বর। তাঁর মধ্যে ঐতিহ্যের বিভ্রান্তি ঘটেনি। বরং তাঁর কাব্যিক নৈপুণ্যের বিনিময়ে ঐতিহ্যের প্রাপ্তিকে তিনি আপন স্বভাবের অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। লক্ষণীয়, সত্যেন্দ্রনাথের কাব্যে সমাজচেতনার নবমূল্যায়নের পাশাপাশি বাঙালী জীবন মানসের ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি জয়গানে মুখরিত। যে মূল্যবোধের দীপ্তিতে একদা আমাদের প্রাত্যহিক জীবন ছিল সোচ্চারিত তারই আভাসে সত্যেন্দ্রনাথের সমগ্র কাব্যমানস উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ এই কবির কাব্যে সম্পূর্ণ নিজস্ব যে একটি জগৎ সৃষ্ট হতে পেরেছে তার মূলে রয়েছে কবির অর্জিত কাব্যের ছন্দোবদ্ধ সুষমাবোধ। সম্ভবতঃ এই কারণেই নজরুল এবং সত্যেন্দ্রনাথ হাত বাড়িয়েছিলেন ভিনদেশী শব্দের মণিমানিক্যের ভাণ্ডারে। কাব্যিক মেজাজের দিক থেকে এই দুই কবির সাদৃশ্য পাঠকের মনোযোগ এড়ায় না।*

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে যা শাশ্বত নজরুলের কাব্যে তাই প্রতিদিনের নৈকট্যে মুখর। রবীন্দ্রনাথের বিশালতা কাব্যের যে মাধুর্যময় বৈচিত্র্যের প্রেক্ষাপটে পরিবেশিত সেখানে শিল্পের দাবীই অগ্রগণ্য। নজরুলের কাব্যে বুদ্ধি অপেক্ষা হৃদয়ের প্রাধান্য। যুক্তির চেয়ে আবেগের মূল্যই সেখানে বেশী। সত্যেন্দ্রনাথের শব্দভাণ্ডারে অসংখ্য শব্দের পরিবেশনে হৃদয়ের দাবী এত বেশী তীব্র ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের এইখানেই পার্থক্য।

লক্ষণীয় যে, তৎকালীন সমাজে যে ধর্মীয় সংস্কারাচ্ছন্ন চিন্তাধারার প্রভাব বর্তমান ছিল নজরুল কেবল তাকে যে বিরোধিতা করেছেন তাই নয়, বরং ধর্ম-নিরপেক্ষ মানবতাবাদী ভূমিকায় থেকে সমগ্র বাংলা কাব্যধারার স্রোতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন পথে প্রবাহিত করেছিলেন। এ সবই তাঁর আধুনিক মানসের পরিচায়ক।

* "অবশ্য কাব্যের অনুভূতি মাত্রেই জীবনের অনুভূতি থেকে একটু ভিন্ন পর্যায়ের—অপেক্ষাকৃত সাধারণীকৃত এবং নৈর্ব্যক্তিক। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক অনুভূতিটি কবিরই, কাজেই পাঠক যদি তাকে নিজ অন্তরের গভীরতম কক্ষে জায়গা না দিয়ে তাকে প্রেক্ষাগৃহের আসন থেকে দেখেন, তবে তিনি একটি গীতিকবিতাকে অবলম্বন করে স্বতন্ত্র নাটক রচনা করতেও পারেন, কিন্তু ঐ গীতিকবিতার মর্মে প্রবেশ করতে পেরেছেন কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ থেকে যাবে।" আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব, পৃঃ ৮৭। ('২য় পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, মার্চ ১৯৭১।)

মানবমনের বিচিত্র অনুভূতির ক্ষেত্রে এই আধুনিকতার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কবির মানবতাবোধ সেদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত। অন্যান্য কবি-শিল্পীর মানবতাবোধের সঙ্গে নজরুলের মানবীয় আদর্শের বা কল্যাণকামিতার পার্থক্য সম্ভবতঃ এইখানে যে, নজরুল যেখানে প্রত্যক্ষভাবে নির্যাতিতের আত্ম-প্রতিষ্ঠা কামনা করেছেন—সেখানে তাঁর বেদনাবোধ সবরকম শিল্পসুলভ রহস্যের অবগুণ্ঠন সরিয়ে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে উৎসারিত হয়েছে। নজরুল গানে ও কাব্যে তাঁর মানবীয় বোধ এবং বেদনার তীব্রতাকে কেন এতটা স্পষ্ট এবং বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরবার প্রেরণা অনুভব করলেন তা অনুসন্ধান করতে হবে তাঁর ঐতিহ্যবোধ, মানসগঠন ও সমকালীন যুগ-সমস্যায়।* এবং বলা বাহুল্য মানবীয় আদর্শের প্রেরণায় যেহেতু কবি আস্থাবান সেইহেতু তাঁর কাব্যে উচ্ছ্বাস বা প্রেরণা সব-কিছুই শ্রেয়োবোধের দ্বারা উজ্জীবিত। ফলে ভঙ্গী বা কোনো তুচ্ছ কৌশলের শিকার তিনি হননি।

সময়ের অনুভব্য তীব্রতায় নজরুলের কাব্য সেই সময় অকস্মাৎ জনপ্রিয়তা অর্জন করার সৌভাগ্য লাভ করেছে। উপরন্তু জীবনের সনাতনী ব্যবস্থার প্রতি সেটা ছিল মোহভঙ্গের কাল। নজরুলের কবিতা তৎকালীন মোহভঙ্গের পর্বকে আরো ত্বরান্বিত করেছে। কেননা, অনুজ কবিদের চোখে তির্যক দৃষ্টিতে এরই ফলে ধরা পড়েছে জীবনের অবক্ষয়ী বাস্তবতা। আধুনিক জীবনমানসের জিজীবিষা এই নিরিখেই বিচার্য। আবেগকম্প মাধুর্যকে অস্বীকার করার অর্থ আধুনিকতা নয়, পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতির সাথে পা মিলিয়ে চলার নামই আধুনিকতা। নজরুল তা বুঝতে বিলম্ব করেননি।

আধুনিক কাব্যগীতির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবিদের মধ্যে রবীন্দ্র-বিরোধিতার ঢেউ একদা সরাসরি বাংলা কাব্যকে বিভক্ত করে দিয়েছিল। রবীন্দ্রানুসারী কবিদের সঙ্গে ভিন্ন ধর্মীদের তৎকালীন বিরোধের কথা আজ আর প্রচ্ছন্ন নয়। দুর্ভাগ্যক্রমে নজরুলও এই বিরোধের শিকারে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনোই রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন না। তাঁর নিজস্ব মৌলিকত্বের গুণেই তিনি বাংলা কাব্যের জগতে স্বতন্ত্রতা লাভ করেছিলেন। বস্তুতঃ, প্রথমাবস্থা থেকেই নজরুল স্বীয় সিদ্ধির লক্ষ্যে অবিচল। ফলে তাঁকে কখনোই রবীন্দ্র-বিরোধিতার আবেগে নিজেকে যুক্ত করতে হয়নি। বাংলা কাব্যে নজরুলের শ্রেষ্ঠতম অবদান এই স্বাতন্ত্র্যবোধের প্রবর্তনায়।

* নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা—মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্।

'বিদ্রোহী' কবি আখ্যা অনেক সময় পাঠকের মনে বিভ্রম জাগিয়েছে। অথচ কাব্যাদর্শের দিক থেকে তিনি কি বিদ্রোহী? প্রকৃতপক্ষে কবি নিজেই জানিয়েছেন যে, তাঁর বিদ্রোহ কেবলমাত্র রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভণ্ডামীর বিরুদ্ধে। এই বিভ্রম সম্ভবতঃ তাঁর জীবনাধিকারের উচ্চকণ্ঠ ঘোষণার ফল। অথচ যতীন্দ্রনাথের সঙ্গেও এইখানেই নজরুলের তফাৎ। রবীন্দ্র মানসিকতার থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও এই দুই কবির কাব্যে ভিন্ন মানসিকতা প্রাধান্য বিস্তার করেছে। ফলে যতীন্দ্রনাথ যেখানে দুঃখবাদের তিমিরে অবগাহনে উৎসাহী সেখানে নজরুলের ভাবনায় দুঃখবাদের বদলে শুনি নব-জীবনের আহ্বান।

কাব্যবিচারে কবিতার গঠনপ্রকৃতির দিক থেকে নজরুলের অনেকাংশে চ্যুতিও ঘটেছে। সে ক্ষেত্রে কবি প্রধানতঃ স্বভাবজাত আবেগ ও অনুপ্রেরণাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কবির অর্জিত মৌলিক কাব্যক্ষমতার বলেই এমনটি হতে পেরেছে। সুবিশাল প্রাণ-প্রাচুর্যের ফসল 'অগ্নিবীণা', 'বিষের বাঁশী', 'ভাঙার গান', 'পূবের হাওয়া' ইত্যাদি। কিন্তু লক্ষণীয় যে, কাব্যশক্তির বিপুল বেগের তুলনায় স্বভাবতঃই তাঁর রচনায় কোনো কোনো অংশে ভাবসংহতির অভাব নজরে পড়ে। যুগচেতনাকে রূপায়িত করতে গিয়ে তিনি আবেগের হাতে ধরা দিয়েছেন। যতখানি কুশলতা তাঁর কাব্যে রূপায়িত তাতে মূলতঃ ছন্দ-নৈপুণ্যেরই প্রাধান্য। কিন্তু এই ত্রুটি সাফল্যের ঢেউয়ে সহজেই চাপা পড়ে যায়। তাঁর অনাড়ম্বর কারুকলাই প্রথম থেকে তাঁকে দান করেছে এক আশ্চর্য কাব্যিক স্বাতন্ত্র্যবোধ যার ফলে নজরুল আজ কাব্যের জগতে পেয়েছেন জিষ্ণুর সম্মান।

নজরুলের কাব্য কি পরিমাণে আধুনিক এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয় সমসাময়িক কাব্যপ্রবাহের মধ্যে। রবীন্দ্রোত্তর আধুনিকতার বিচারে বাংলা কাব্যের দুই ভিন্ন পথিক নজরুল ও যতীন্দ্রনাথ কেউই আধুনিক নন। জীবনমুখী প্রবণতা থাকা সত্ত্বেও এঁরা শিল্প রচনায় কেবলমাত্র বাস্তবতার মধ্যেই আবদ্ধ থাকেননি। বিশেষ করে নজরুল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে ধরণের রোম্যান্টিকতাকে কাব্যে গ্রহণ করেছেন রবীন্দ্রোত্তর কালের বিচারে তা আধুনিকতার প্রতিফলন নয়। রোম্যান্সের স্নিগ্ধ আহ্বান কবি প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই সমকালীন সমস্যা থেকে সরে আসার প্রবণতাও নজরুলের মধ্যে অনুপস্থিত। বলতে গেলে সেই প্রথম প্রচলিত ধারার বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার প্রয়াস উৎসাহ পেল। একদিকে রোম্যান্টিকতায় আকর্ষণ, অপরদিকে বাস্তবতাবোধ বিচ্ছিন্ন কাব্যাদর্শের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা—এই দ্বন্দ্বময় মানসের

মধ্যে তাঁর কাব্যিক প্রয়াসের অগ্নিপরীক্ষা। বস্তুতঃ, এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই আধুনিকতার লক্ষণ সুস্পষ্ট।

সমসাময়িক প্রভাবের ক্ষেত্রে নজরুলের কবিতা দু-এক দশককে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। অবশ্য তাঁর সমসাময়িক ঘটনাসম্বলিত কবিতা সম্পর্কেই একথা প্রযোজ্য। জীবনানন্দও স্বীকার করেছেন সে কথা।* কিন্তু জীবনানন্দের মতে, 'দশকের সীমা ভেঙে পড়েছে নানা দিক থেকে।' এটা ঠিক যে সাম্প্রতিক কাব্যবিচারে দশকের প্রশ্ন উঠতেই পাবে না। কেননা অবস্থার যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু তাঁর গীতিকবিতার সাফল্য সমস্ত সময়সীমাকে অতিক্রম করে অর্জন করেছে প্রতিষ্ঠার দৃঢ়ভূমি। কবি নিজেও প্রসঙ্গত সে কথা স্বীকার করেছিলেন। লক্ষণীয়, গীতিকাব্যের সাফল্যে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর স্থান। কল্লোল যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত এই যুগপৎ সাফল্য আর কেউ অর্জন করতে পারেননি। গীতিকবিতা রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রশ্নাতীত সাফল্য তাঁর অসাধারণ সাংগীতিক প্রতিভারই নিদর্শন বলা যায়। পাশাপাশি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যিক প্রকরণ অনেক বেশী পরিণত হওয়া সত্ত্বেও সাংগীতিক উপলব্ধির মিশ্রণাভাবে তা তেমন ব্যাপ্ত হতে পারেনি; যদিও কাব্যনাট্যের ক্ষেত্রে সম্প্রতি বুদ্ধ বসু আশাতীত সাফল্যলাভ করেছেন। ফর্ম সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বা চর্চা শুদ্ধ ইয়োরোপীয় কাব্যচর্চাপ্রসূত বলে উপরোক্ত রচনায় তা কার্যকরী হয়েছে। আত্ম-অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও নজরুলের সঙ্গে বর্তমান কবির সাদৃশ্যটুকু বর্তমান। অবশ্য অতৃপ্তিজনিত অগ্ন্যুদগার তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। নজরুলের মতো সুধীন্দ্রনাথের রচনায়ও এই অতৃপ্তিজনিত অগ্ন্যুদগার যথেষ্ট সক্রিয়।

নজরুলের সমাজ-চেতনাপ্রসূত অন্তঃপ্রেরণার প্রতিচ্ছায়া ভিন্নরূপে ধরা পড়ে বিষ্ণু দে'র কাব্যে। তিনি মূলতঃ সমাজসচেতন নাগরিক সুলভ পারিপাট্যে পরিপূর্ণ। বিষ্ণু দে'র সিদ্ধি বহু বৈপরীত্যের সার্থক ঐক্যসাধনে। তিনি সামগ্রিক কাব্যভাবনার ক্ষেত্রে সেদিক থেকে যথার্থই আধুনিক। কিন্তু তাঁর অবহিত চৈতন্যের মূলে রয়েছে নজরুলের সামাজিক সজ্ঞানতা। "কালের

* "...সুধীন্দ্রনাথের মতো তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকবার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জীবনপাঠ আজকের দু-এক দশকের মানসকে যেন বেশী আকর্ষণ করতে চায়, প্রেমেন ও নজরুলের কাব্যাত্মা বিগত দু'এক দশককে যেমন বেশী আকর্ষণ করেছিল।" কবিতার কথা—জীবনানন্দ দাশ, পৃঃ ৬৭।

সাম্প্রতিক ছন্দে ধৃত দেশ এবং বিশ্বে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন ঘাতে-প্রতিঘাতে, সহযোগে এবং দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানবিক চিদাকাশকে। সেখানে প্রতিটি অদ্যোতনী অতীত এবং আগামীর উষা-রজনীতে নিত্যস্থায়ী। ঐতিহ্য-প্রাণিত এই কবির চিন্তা শুধু বৌধিক স্তরেই আবদ্ধ নয়। চিন্তা তাঁর কাছে অভিজ্ঞতা।*" এই অভিজ্ঞতা রূপ পায় সামাজিক ভাবনার ভেতর দিয়ে। সামাজিক ভাবনার যে মার্কসীয় ধারণা প্রতিপালিত তার সন্ধান পাওয়া যায় দ্বিতীয় দশকের প্রতিবাদী মানসিকতায়। নজরুল সেই প্রতিবাদী মানসিকতার অগ্রজ সন্তান।

সমাজ চেতনা-কেন্দ্রিক অন্তঃপ্রেরণার দিকে সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য ও বিমলচন্দ্র ঘোষ নজরুলের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী এই দুই কবির কাব্য ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের কশাঘাতে মুখর। সমাজ-চেতনার প্রশান্ত প্রাঙ্গণে অবাধ গতায়াতের মধ্যে এই দুই কবির জাগ্রত চেতনাসঞ্জাত স্পর্শের পরিচয় মেলে। নজরুলের কবিতার প্রথম পর্বে সাম্যবোধের যে প্রেরণা সক্রিয় ছিল পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যভাবনায় বিশেষ কোনো মতাদর্শ তেমন প্রাধান্য পায়নি। পক্ষান্তরে বিশ্বমানবতার বাণী তাঁর কবিতায় সে-সময় স্থান পেয়েছিল। সুভাষের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তির শাণিত পরিচয় বর্তমান। সাধারণ মানুষের মুক্তিকামনা নজরুলের উজ্জীবনী কবিতার লক্ষ্য ছিল। অপরদিকে সুভাষের কবিতায় আঙ্গিকের উন্নত রূপ নজরুলের উল্লেখিত বক্তব্যের সমর্থনকেই আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। সুকান্ত যথাযথভাবে নজরুলের আবেগ ও উচ্ছ্বাসকে তাঁর কবিতায় আত্মস্থ করেছিলেন। কাব্যরীতির দিক থেকে সুকান্ত রবীন্দ্রনাথের কাছে ঋণী হলেও বক্তব্যের উদ্দামতায় তিনি নজরুলের প্রতিবেশী। জীবনানন্দকে ঠিক নজরুলের কাব্যাদর্শের প্রয়াসী বলা যায় না। কাব্যভাবনার দিক থেকে তিনি নির্জনতার কবি বলেই স্বীকৃত।* অবশ্য জনৈক সমালোচক জীবনানন্দের মধ্যে একটি প্রাণপূর্ণ বিদ্রোহী সত্তার আবির্ভাব** লক্ষ্য করেছেন। পরিপূর্ণ নাগরিক মেজাজে বিশ্বাসী কবি জীবনানন্দ বাংলাদেশকে প্রকৃতির মধ্যেই উপলব্ধি করতে প্রয়াসী। বাংলার পশুপাখী, বৃক্ষ, তৃণ-লতা, দিঘী, নদী প্রভৃতির ভেতর দিয়ে তাঁর নিরন্তর অন্বেষা কাব্যে রূপ পেয়েছে। কিন্তু শহরের প্রতিও তিনি সমান উৎসাহ নিয়ে আমাদের দুর্ভাগ্যের কারণ

* কবিতা কল্পনালতা—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ১৬৭।

** মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ : নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা, পৃঃ ৬৪।

অনুসন্ধান করেছেন। স্পর্শানুভূতির দিক থেকে নজরুলের দেশজ শব্দ চয়নের প্রতি জীবনানন্দের অনুরাগ পাঠকের নজরে আসে। তাঁর আবেগ এই দিক থেকে নজরুলকেই অনুসরণ করেছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতে, আবেগ-ঘন মন নিয়ে জীবনানন্দ যে নজরুলের দিকে ঝুঁকে পড়বেন তাতে অবাক হবার কিছু নেই।* প্রসঙ্গত স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, জীবনাদর্শের ক্ষেত্রে এই দুই কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন পথের পথিক। জীবনানন্দের মতে—

"কেউ কেউ কবিকে সবের ওপরে সংস্কারকের ভূমিকায় দেখেন, কারো কারো ঝোঁক একান্তই রসের দিকে। কবিতা রসেরই ব্যাপার, কিন্তু এক ধরণের উৎকৃষ্ট চিত্তের বিশেষ সব অভিজ্ঞতা ও চেতনার জিনিস—শুদ্ধ কল্পনা বা একান্ত বুদ্ধির রস নয়।" নজরুলের বিবেচনায় কবিতা তাঁর অব্যক্ত বেদনা, আনন্দ বা বিরোধ এবং উচ্ছ্বাসের শিল্পগত প্রকাশ।

অবশ্য রোম্যান্টিক প্রগাঢ়তার দিক থেকে পরস্পরের নৈকট্যটুকু পাঠকের নজর এড়ায় না। উপরন্তু কলকাতা বিষয়ক কবিতায় জীবনানন্দ নজরুলের বেদনাপ্রসূত ভাবনার শরিকে পরিণত। একই মিল অমিয় চক্রবর্তীর নষ্ট্যালজিয়ার মধ্যে প্রকাশিত। যদিও কাব্যগত আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এই কবিদ্বয়ের দুস্তর ব্যবধান সর্বজনস্বীকৃত। বস্তুতঃ, বিদেশী শব্দের ... মোহিতলাল এবং সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাদৃশ্য তৎকালীন স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়বাহী হলেও ভাবগত দিক থেকে এঁদের পার্থক্য অনতিক্রম্য। এবং সেদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র একদা নজরুলের আশ্রিত বিষয়বস্তুর প্রতি উৎসাহিত হয়েছিলেন যেমন পরবর্তীকালে হয়েছিলেন সুভাষ অথবা সুকান্ত। এঁদের সাদৃশ্য বহিরঙ্গে নয়, ভাবগত সাদৃশ্য স্ব-স্ব ক্ষেত্রে পৃথক শৈলীতে এঁদের কাব্যে রূপলাভ করেছে। ভিন্ন মেজাজের কবি সমর সেনের ইন্দ্রিয়জ কল্পনায় শহুরে ব্যঙ্গপ্রধান কাব্যানুভূতির মধ্যে পরোক্ষ মিল নজরুলের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সাম্প্রতিক কালে এই প্রবণতার লক্ষণ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শামসুর রাহমান ও শহীদ কাদরীর মধ্যে সুস্পষ্ট।

আন্তর্জাতিক পটভূমিকায় রেখে বিচার করলে নজরুলকে কেবলমাত্র তাঁর দুরন্ত আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতেই মূলতঃ দেখতে হবে। ফরাসী

* আধুনিক কবিতার ভূমিকা—সঞ্জয় ভট্টাচার্য, পৃঃ ৩০।

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে—জীবনানন্দ দাশ (ভূমিকা, জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠকবিতা)।

মেজাজ তাঁর কাব্যে অনুপস্থিত। কিন্তু কেবলমাত্র উদ্দীপনী ভাবরসের প্রেক্ষাপটে তাঁর সাদৃশ্য কিঞ্চিৎ মেলে ফরাসী কবিদের রচনায়। বিপরীতপক্ষে, তাঁর প্রেম-ভাবনার সঙ্গে ফরাসী কবি দেনস্* অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ জর্মন রিল্‌কের তন্ময়তাজনিত সাদৃশ্য উল্লেখ করা যায়। ইতালীয় কবিদের কাব্যে যে বিশেষ ধরণের অনুভবগ্রাহ্য প্রেম কল্পনার পরিচয় পাই তার স্পর্শ ছড়িয়ে আছে 'দোলনচাঁপা'র অধিকাংশ কবিতায়। কেননা একই বৎসরে জন্মেছিলেন বেতোচ্চি** এবং অতৃপ্ত যাঁর সুখের হাহাকার কাব্যে প্রেমের কল্যাণবোধে ফিরে পায় মানসিক শান্তি। তার সঙ্গে নজরুলের মিল ঐ বেদনাবোধের মধ্যেই নিহিত। উৎসাহী পাঠকের কাছে আর একটি আশ্চর্য মিল ধরা পড়ে স্পেনীয় কবি হতভাগ্য মানবপ্রেমিক লরকার কবিকর্মের সঙ্গে। তিনিও জন্মেছিলেন একই সালে, প্রাণ দিয়েছিলেন ফ্যাসিষ্ট ফ্র্যাঙ্কোর ঘাতকবাহিনীর হাতে মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে। তিনি কবি কেবলমাত্র এই অপরাধেই তাঁকে এক স্তব্ধ বিকেলে টেনে নিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নজরুলের মতো লরকাও অনুভব করেছিলেন পৃথিবীর তিক্ততম নগ্ন অভিজ্ঞতা। 'সাম্যবাদী' কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে লরকার 'পোয়েট ইন নিউ ইয়র্ক' কাব্যগ্রন্থের ভাবগত মিল সেইজন্যে পাঠকের নজর এড়ায় না। প্রকৃতপক্ষে, বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে পৃথিবীর অধিকাংশ সচেতন কবির কাব্যে লুণ্ঠিত মানবতার জয়গান প্রাধান্য পেয়েছে। অলক্ষ্যে এই প্রবণতার দ্বারা নজরুলও প্রভাবিত হয়েছিলেন। ফলে মায়াকভস্কির কাব্যধর্মের প্রভাব এই বাঙালী কবির মধ্যেও লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কাব্যরসাশ্রিত বহুমুখী গুণাবলীর পরিচয় থাকা সত্ত্বেও নজরুলের ক্ষেত্রে যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি যথাযথ মেলেনি তার মূলে রয়েছে টেকনিকের সমস্যা। ইতস্ততঃ যে স্বীকৃতি নজরুল কাব্যে প্রথমে দেখা যায় বক্তব্যের তীব্রতার গুণেই তা সম্ভব হয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বিশেষতঃ শাব্দিক চেতনার গুণে এবং গতিবেগের প্রাধান্যে তিনি সংগ্রামী গণমানসে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ শ্রমজীবী মানুষের কাছে নজরুল আর অপরিচিত নন। বিভিন্ন দেশে নজরুলের কবিতার সাম্প্রতিক অনুবাদ আজ তারই সাক্ষ্য দেয়।

বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে নজরুলের কবিতা প্রথম থেকেই যে জনপ্রিয়তা

* রোব্যার দেনস্ (১৯০০)।

** কার্লো বেতোচ্চি (১৮৯৯)

অর্জন করেছে তার মূলে রয়েছে সহজবোধ্য প্রকাশভঙ্গী। দুরূহতার ফাঁদে তিনি পা দেননি। শব্দের রহস্য সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ গীতিকবিতার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু তাঁর কাব্যে বিশেষ করে সমকালীন সমাজ-সম্পর্কিত কবিতায় উচ্চকণ্ঠের ফলে শিল্পগত ত্রুটির কথাও অনস্বীকার্য। দুর্লভ এক অনুপ্রেরণা এই ত্রুটিকে ঢেকে দিয়েছে বলে অনেকের বিশ্বাস। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে শুধু কাব্যিক বোধ বা আঙ্গিক উপলব্ধি ব্যতীত কোনো কবি চিরন্তন সাফল্যলাভে অক্ষম। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে নজরুলের লজিক্যাল বিচ্যুতি এবং ইমোশন্যাল প্রাধান্যের কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে, "রবীন্দ্রনাথ যুগোত্তর আর নজরুল একটি পরিপূর্ণ যুগ।"* অবশ্য এতে তাঁর মননধর্মী প্রবণতার ব্যর্থতা ঢাকা পড়ে না। একমাত্র অনুশীলনে পরিশুদ্ধ কল্পনা এবং মেধাবী অন্বেষার প্রেরণা বলে এই ত্রুটিগুলি কাটিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল। অপরদিকে, তাঁর এই আদর্শগত প্রেরণার উত্তরাধিকার প্রচ্ছন্নভাবে লাভ করেছেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কিন্তু এই দুই কবি মননসুলভ নিষ্ঠার সংহতিতে সমৃদ্ধ ছিলেন বলেই এঁরা কেবলমাত্র আবেগের দ্বারা পরিচালিত হননি।

যাই হোক, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে প্রধানত: বৃহত্তর মানবসমাজ এবং সমকালীন রাজনৈতিক গতিপ্রকৃতি ও সমস্যাকে স্মরণ রেখেই নজরুলকে বিচার করতে হবে। শুদ্ধ অনুভূতির অভাবজনিত ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে বলিষ্ঠ বক্তব্যের প্রাবল্য কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার্য। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, তিনি তাঁর কাব্যের মধ্যে বিচিত্র রসানুভূতির ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। বরং স্বভাবজাত প্রতিভার মৌলিকত্বের গুণে অধিকাংশ স্থলে চিত্রকল্প এবং রূপকল্পের সার্থক রূপায়ণ তাঁর কবিতায় সম্ভব হয়েছে। নজরুলের দীর্ঘ কবিতা বা উচ্চকণ্ঠ সম্বলিত রাজনৈতিক বক্তব্যপ্রধান কবিতার সমর্থনে মাহ্‌ফুজউল্লাহ বলেছেন, "নজরুলের এসব কবিতা এর শিল্পরূপের জন্য নয়, বরং বলা যেতে পারে অন্তর্নিহিত 'ইমোশান' বা আবেগের স্বতোৎসারণের জন্যই অধিক প্রিয়।" কিন্তু এ-সত্যও ধর্তব্যের মধ্যে নেওয়া প্রয়োজন যে, কবিতা শুধু আবেগের বা ইমোশনের স্বতোৎসারণের জন্যেই হৃদয়-সংবেদী হয় না, এরজন্য প্রয়োজন কবিতার ভিন্নতর মহিমাও। এ মহিমা কবিতার অন্তর্বয়নের মধ্যেই নিহিত। বলতে গেলে নজরুলের কবিতা ছন্দধ্বনি ঋজু বাচনভঙ্গী এবং বিচিত্র প্রবাহমানতার গুণেই সার্থকতা লাভ করেছে। এছাড়া গতিশীলতাই ছিল কবির অন্যতম মূলধন।

* সাহিত্য ও সাহিত্যিক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সেই সঙ্গে প্রকৃতির বস্তুনিচয় ও অনুষঙ্গের প্রাধান্যও একান্ত উল্লেখযোগ্য। প্রচলিত ভঙ্গীর সীমানা থেকে বেরিয়ে আসার দুঃসাহস দেখিয়ে কবি যে বাংলা কবিতায় নব মূল্যায়ন ঘটিয়েছিলেন তা স্বীকার করেছেন 'সমকালীন কবি বুদ্ধদেব বসু।* আসলে কবিতা কেবলমাত্র শিল্পচর্চার সীমানায় আবদ্ধ থাকেনি, সামাজিক মুক্তির অংশ হিসেবেই কবিতা তাঁর কাছে ধরা দিয়েছে। অপরদিকে অনুভূতির সুতীব্র মাদকতার গুণে তিনি আশ্চর্য সাফল্যলাভ করেছেন তাঁর গীতিকবিতার ক্ষেত্রে। গীতিকবিতার ক্ষেত্রে কবি তাই সামগ্রিকভাবে সার্থক শিল্পীর মর্যাদালাভের অধিকারী। শিল্পগত বিচ্যুতির মূলে সম্ভবতঃ সামাজিক দায়িত্বের প্রেরণাই দায়ী ছিল। যাই হোক, একথা অনস্বীকার্য যে, অন্তঃস্থিত কাব্যবোধ ও প্রতিভার একান্ত নিজস্ব মৌলিকতার বিনিময়ে নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে তিনি সাফল্যলাভ করেছিলেন। পাউণ্ড** ঠিকই বলেছেন,

"...Great art must be an exceptional thing. It cannot be the sort of thing anyone can do after a few hours practice..."

বস্তুতঃ, শিক্ষানবিশীর দৃষ্টিতে কবির সৃষ্টিকে পুরোপুরি বিচার করতে গেলে এই বিভ্রান্তি জাগাই স্বাভাবিক। কিন্তু কবিকে এইজন্যেই সামগ্রিকভাবে বিচার করতে হবে। বিশেষ করে নজরুলের কাব্যচিন্তা বিভিন্ন পর্বে পরস্পর বিরোধী প্রবণতায় নিরন্তর সক্রিয়। তাছাড়া, প্রধানতঃ নিত্যপ্রবহমান দ্বন্দ্বের ফলেই কবিকে অস্থির হয়ে সে-সময় প্রয়োজনীয় পদ্ধতি বা প্রকরণের দিকে হাত বাড়াতে হয়েছে। সুতরাং, বিক্ষিপ্তভাবে নজরুলকে বিচার করা সমীচীন হবে না।

আধুনিক সমালোচকের কাছে বর্তমান কবির প্রাণময় অগ্নিপ্রসূত নব নব

* "কৈশোরকালে আমিও জেনেছি, রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন, যা থেকে বেরোবার ইচ্ছেটাকেই অন্যায় মনে হতো—যেন রাজদ্রোহের সামিল, আর সত্যেন্দ্রনাথের তন্দ্রাভরা নেশা, তাঁর বেলোয়ারি আওয়াজের জাদু—তাও আমি জেনেছি। আর এই নিয়েই বছরের পর বছর কেটে গেল বাংলা কবিতার, অন্য কিছু চাইলো না কেউ, অন্য কিছু সম্ভব বলেও ভাবতে পারলো না—যতদিন না বিদ্রোহী কবিতার নিশান উড়িয়ে হৈ হৈ করে নজরুল ইসলাম এসে পৌঁছলেন। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভাঙলো"—বুদ্ধদেব বসু (সাহিত্যচর্চা)।

** Ezra Pound.

বিষয়ের দুর্বার প্রসারের কথা নিঃসন্দেহে আলোচনার বস্তু। সেদিক থেকে নজরুলের সমগ্রতা বস্তুতঃ তাঁর প্রাণময়তারই সূচক। সুতরাং মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সূত্রকে মনে রেখে সম্ভাব্য পরিণতিগুলির প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে।

অবশেষে স্মরণ রাখা উচিত কবির জীবনের অভিজ্ঞতাজনিত উপলব্ধি যা তাঁর কাব্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো সত্য। সত্যবোধের উন্মীলনে কবির প্রাণৈশ্বর্যের প্রকাশ ও তাঁর ফলশ্রুতি মেলে প্রাত্যহিক জীবনের দ্বন্দ্বমুখর উৎসে। নজরুল একদা সেই উৎসেরই সন্ধান পেতে চেয়েছিলেন। আর তারই জন্যে তাঁকে বেছে নিতে হয়েছিল স্বকীয়তার বৈচিত্র্য। এ কাজে তিনি কল্লোল যুগের মানসিকতাকে স্মরণে রেখে প্রায়শঃ উপহাস ও তীক্ষ্ণ ঠাট্টার ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ, এ সবের মূলে রয়েছে কবির চিরন্তন অন্তহীন জিজ্ঞাসা। কেননা, অভিজ্ঞতাকে কাব্যের অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়েই প্রয়োগের অনুরূপ পদ্ধতি নির্দ্বিধায় আত্মস্থ করেছেন নজরুল। এইখানেই তাঁর সমগ্র প্রচেষ্টার সাফল্য অন্তর্নিহিত। উপরন্তু কবি প্রথম থেকেই ছিলেন সমস্ত দুর্বোধ্যতা থেকে মুক্ত।

প্রসঙ্গতঃ, নজরুলের কবিচরিত্রে যে অস্থিরতা প্রথমাবস্থা থেকেই বিদ্যমান সে সম্পর্কে অসংখ্য প্রশ্ন পাঠকের মনকে প্রায়শঃই আচ্ছন্ন করে। সমালোচকের পরিশ্রমী বৈদগ্ধ্যও এই সংশয়বোধ থেকে মুক্ত নয়। সম্ভবতঃ, এত বিচিত্র ভাবের সম্মিলন সমসাময়িক কোনো কবির চেতনায় ঘটেনি। আর এই জন্যেই নজরুলকে ঘিরে এত কৌতূহল। তাঁর কাব্যমূল্য প্রসঙ্গে প্রথমেই যে প্রশ্নটি পাঠকের দৃষ্টিতে জাগে তা হোলো, তিনি সাহিত্যের বিশেষ করে কাব্যক্ষেত্রের কোন্ অংশে সর্বাপেক্ষা অধিক সাফল্য অর্জন করেছেন? কবিকর্মের বহুবিধ অংশের পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রবণতা তাঁর স্বাতন্ত্র্যতার পরিচায়ক। সেইদিক থেকে তিনি উদ্দীপনী ভাব, রোম্যান্টিক কল্পনা, ভক্তি-ভাব, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্বে কম-বেশী পরিমাণে সাফল্যলাভ করেছেন। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে নজরুল গীতিকাব্যের ক্ষেত্রেই যেন অপেক্ষাকৃত বেশী সার্থক হয়েছেন বলা যায়। সঙ্গীত সম্পর্কীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার বিনিময়ে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যে তাই অসংখ্য গীতিকবিতা উপহার দিতে পেরেছিলেন। দেশপ্রেম বিষয়ক কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর অত্যাশ্চর্য সাফল্য একান্তভাবেই সময়ের সীমানাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলেও কিছু কিছু রচনা সময়ের পরিধিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু অত্যাচারীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সরব কণ্ঠ মিশ্রিত কবিতাগুলি শোষিত মানুষের কাছে স্বীকৃতি পেয়েছে মূলতঃ তাঁর অন্তঃস্থিত গতিবেগের জন্যে। যাই হোক, তুলনামূলক বিচারে নজরুলের এই জাতীয় কবিতার চেয়ে গীতি-

কবিতার সাফল্য অবিসম্বাদিত। ওস্তাদ জমীরুদ্দিনের কাছ থেকে পাওয়া সাংগীতিক শিক্ষার প্রভাব প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য। আঙ্গিকের সার্থক রূপায়ণ ছাড়াও এই কবিতাগুলির মধ্যে কবির অন্তর্মুখী ভাবনার সার্থক-অভিযান লক্ষ্য করা যায়। কবির সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি তাঁর কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের বিভিন্ন রচনায় এই অভিযানকে রূপায়িত করার প্রবণতাতেই পরিব্যাপ্ত। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, কবি এর ভেতর দিয়ে কোনো আপতিক নৈরাজ্যের মধ্যে আশ্রয়লাভের প্রয়াসী ছিলেন। বরং সিটওয়েল, এলুয়ার, মন্তালে বা নেরুদা প্রভৃতির মতো তিনিও কাব্যে মেনে নেননি অসংলগ্নের মাহাত্ম্যকে। ফলে তাঁর অন্বেষা একান্তই কাব্যিক, এবং সৌন্দর্যাভিসার, প্রেমকল্পনা ও ব্যক্তিগত উপলব্ধির মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ। অর্থাৎ নৈপুণ্যের চকিত বিস্ময় ও অনুভূতির চূড়ান্ত চমকেই কবির উৎসাহ। গীতিকবিতার মধ্যে কবি ফিরে পেয়েছিলেন ভাবনার প্রার্থিত সংহতি। ফলে পরিণতিতে তা সংবেদ্য হয়ে উঠেছে। এই সংবেদ-প্রবণতা কবির সাফল্যকেই সূচিত করে।

কবির ঐতিহাসিক মূল্যায়ন সম্পর্কীয় যে প্রশ্নটি সাধারণতঃ নজরুল পাঠকের কাছে দেখা দেয় তাও আলোচনাকালে বিবেচ্য হওয়া উচিত। কবিরা তাঁদের সৃষ্ট কর্মকৃতির গুণে আপনাপন মূল্যায়নের নিরিখে প্রধানতঃ কাব্যিক অমরত্ব অর্জন করেন। মহাকবিরা চিরকাল এই বিচারেই কালোত্তীর্ণতা লাভ করেছেন। নজরুলের রচনা মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে তাঁর স্থান কী হতে পারে সে সম্পর্কে কৌতূহলী পাঠকের অনুসন্ধিৎসা থাকাই স্বাভাবিক। সেদিক থেকে নজরুলের কবিতার সর্বজনীনতার কথা স্মরণে রেখে এবং একমাত্র গবেষকের ন্যায় শুদ্ধ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করে এর উত্তর খুঁজতে হবে। প্রথমতঃ, জানতে হবে, কবির সৃষ্টি অমরত্ব পায় কী ভাবে? মানিকবাবুর প্রশ্ন ছিল, লেখক কে?—পিতার মতো যিনি দেশের মানুষকে সন্তানের মতো জীবনাদর্শকে বুঝিয়ে শিখিয়ে-পড়িয়ে মানুষ করার ব্রত নিয়েছেন। পিতার মতো, গুরুর মতো জীবনের নিয়ম-অনিয়ম, বাঁচার নিয়ম-অনিয়ম শেখান বলেই অল্পবয়সী লেখক-শিল্পীও জাতির কাছে পিতার মতো, গুরুর মতো সম্মান পান···দেশের লোকের সস্তা খাতিরকে লেখক-শিল্পী খাতির করেন না। দরকার হলে দেশের মানুষকে কান মলে শাসন করার অধিকার খাটাতে লেখক-শিল্পীর দ্বিধা বা ভয় হবার কথা নয়।* এই আলোকেই আমাদের বিচার করে দেখতে হবে যে নজরুল সেই কর্তব্য

* লেখকের কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃঃ ৮৩।

পালন করেছেন কি না। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে যে রাজনৈতিক মেজাজ দেখা দিয়েছিল তা থেকে বেরিয়ে এসে কবি সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি মানসিকতার প্রবর্তন ঘটিয়েছিলেন তাঁর কাব্যের মাধ্যমে। নির্বান্ধবযুক্ত এই কার্যে নির্ভীক নজরুল ছিলেন স্থিতপ্রজ্ঞ এক সৈনিক। সেই সময়ে একমাত্র নজরুলের কাব্যেই তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক বিদ্রোহের বিষাণ বেজে উঠেছিল। কারাবাসের পরেও তিনি আদর্শচ্যুত হননি। দ্বিতীয়বার কারাদণ্ডিত হয়ে সৌভাগ্যক্রমে কারাবাস করতে হয়নি গান্ধীজির তথাকথিত চুক্তির ফলে। আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের কোনো লেখক বা কবির পাঁচখানি কাব্যগ্রন্থ ও দুখানি প্রবন্ধ সংগ্রহ সমেত মোট সাতখানি গ্রন্থ শাসকশ্রেণীর দ্বারা বাজেয়াপ্ত ঘোষিত হয়নি। এক বৎসরের কারাভোগ কেবলমাত্র কবিতা লেখার অভিযোগে একমাত্র নজরুলেরই ঘটেছে। কিন্তু কোনো অবস্থাতেই তিনি দুঃসাহসী সমাজপ্রীতির আদর্শ থেকে সরে আসেননি। শুধু যে ভিন্ন রসবোধের প্রবক্তা হবার বাসনায় তিনি উদ্বিগ্ন ছিলেন তা নয়, অন্তঃস্থিত আবেগ এবং সুগভীর মানবপ্রীতির দ্বারাও তিনি গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। সুতরাং কাব্যিক সহধর্মিতার পাশাপাশি মানবপ্রীতির অতুলনীয় আবেগের বিনিময়ে আগামী দিনে স্বীকৃতির পুরস্কার পাবেন নজরুল। সঙ্গীতের রাজ্যে তিনি সুরের যাদুস্পর্শে এবং লিরিক্যাল মাধুর্যের জন্যে আপনি স্ব-প্রতিষ্ঠ। ফলে গীতিকাব্যের মূল্যায়নে তাঁর প্রাধান্যে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। তিনি নিজেও বহুভাবে তা স্বীকার করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে গীতিকাব্যের সার্থক স্রষ্টা এবং মানবপ্রেমিক, নিপীড়িত শোষিত মানবসমাজের সাথী, প্রতিবাদের কবি নজরুলও নিশ্চয়ই চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হবেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের তিনি জাতীয় মানসিকতার শ্রেষ্ঠ পরিপূরক। সঙ্গীতময়তার সঙ্গে তাঁর এই সত্তা একাত্মীভূত এবং শ্রেষ্ঠতম কৌলিন্যের পরিচায়ক বলেই চিহ্নিত হবে। সেই ইংগিত আজ কাব্যক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে সক্রিয় সাহিত্যক্ষেত্র থেকে অবসর নেবার পর আজও তিনি সমান জনপ্রিয় এবং তা ক্রমবর্ধমান। একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এই জনপ্রিয়তা নিঃসন্দেহে সমসাময়িক কবিদের ঈর্ষার বস্তু।

সময়োচিত আর্তিকে কবি গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উপলব্ধির ভেতর দিয়ে। হয়তো এই জন্যেই তাঁর উপলব্ধির মধ্যে কোনো কৃত্রিমতা দেখা যায় না। পাঠকের কাছে নজরুল কাব্য তাই তাঁর কালের প্রতিনিধি হয়ে দেখা দেবে। যুগোত্তীর্ণতাই যে-কোনো মহৎ কবির একান্ত আকাঙ্ক্ষা বা উদ্দেশ্যর প্রতীক।

সেদিক থেকে নজরুলের কবিতা ইতিমধ্যেই দেশ-কালকে অতিক্রম করে অর্জন করেছে জিষ্ণুর গৌরবদীপ্ত সম্মান। সময় তাঁর কাছে সোপানমাত্র।* বস্তুতঃ, তাঁকে বিষয়বস্তুর বিচারে নিঃসন্দেহে সমকালের জাগ্রত প্রতিনিধি বলা যেতে পারে।

* "The poems will continue to inspire and his songs, unusually rich both in melody and content, will always be sung. It has given to Nazrul Islam to work only a part of the appointed span of life; yet public acknowledgement of his creation, continued fulfilment of his inspiration and prospective continuation of his impact on the lives and mind of future generations, bid fair to ensure for him a lasting place in the annals of time."—Kazi Nazrul Islam by Basudha Chakraborty. P. 59.

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা

১। কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা—মুজফ্ফর আহ্মদ।

২। বাংলা সাহিত্যে নজরুল—আজহারউদ্দিন খান।

৩। নজরুল চরিত মানস—ডঃ সুশীলকুমার গুপ্ত।

৪। নজরুল ইসলাম ও আধুনিক বাংলা কবিতা—মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ।

৫। শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম—শাহাবুদ্দীন আহ্মদ।

৬। কাজী নজরুল—প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়।

৭। সংস্কৃতি কথা—মোতাহের হোসেন চৌধুরী।

৮। নজরুল সাহিত্য—সম্পাদনা, মীর আবদুল হোসেন।

৯। নজরুল সমীক্ষণ—সম্পাদনা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান।

১০। কবি নজরুল—আতাউর রহমান।

১১। নজরুল ইসলাম—সম্পাদনা, মুস্তফা নূরউল ইসলাম।

১২। নজরুল নির্দেশিকা—রফিকুল ইসলাম।

১৩। নজরুল-জীবনী— ঐ।

১৪। নজরুল জীবনের শেষ অধ্যায়—জুলফিকার হায়দার।

১৫। কেউ ভোলেনা কেউ ভোলে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়।

১৬। আমার বন্ধু নজরুল— ঐ।

১৭। চলমান জীবন (১ম ও ২য় পর্ব)—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়।

১৮। জ্যৈষ্ঠের ঝড়— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

১৯। কল্লোল যুগ— ঐ।

২০। নজরুল পরিচিতি— পাকিস্তান পাবলিকেশনস।

২১। নজরুল রচনা সম্ভার—সম্পাদনা, আবদুল কাদির।

২২। নজরুল রচনাবলী (১ম, ২য়, ৩য় খণ্ড)—সম্পাদনা, আব্দুল কাদির।

২৩। নজরুল রচনা সম্ভার (১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ষষ্ঠ খণ্ড)—সম্পাদনা, আবদুল আজীজ আল্ আমান।

২৪। যুগস্রষ্টা নজরুল—খান মুহম্মদ মঈনুদ্দীন।

২৫। নজরুল কাব্যে রাজনীতি—আমীর হোসেন চৌধুরী।

২৬। বিদ্রোহী নজরুল নীরব আজি—সুফী জুলফিকার হায়দার।

২৭। নজরুল কাব্যে শব্দ—শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ।
২৮। নজরুল প্রতিভা—মোবারেশ্বর আলী।
২৯। স্বদেশ ও সাহিত্য—শেরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর।
৩০। রবীন্দ্র-কাব্যরূপের বিবর্তন-রেখা—ডঃ গুণময় মান্না।
৩১। সংগীতে সুন্দর—ডঃ সাধনকুমার ভট্টাচার্য।
৩২। বঙ্গ সাহিত্যে হাস্যরসের ধারা—ডঃ অজিতকুমার ঘোষ।
৩৩। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য জিজ্ঞাসা—বিষ্ণু দে।
৩৪। সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—বিষ্ণু দে।
৩৫। ঊনবিংশ শতকের গীতিকবিতা সংকলন—শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
৩৬। স্বদেশ ও সংস্কৃতি—বুদ্ধদেব বসু।
৩৭। জীবনানন্দ দাশ—সঞ্জয় ভট্টাচার্য।
৩৮। নিঃশব্দের তর্জনী—শঙ্খ ঘোষ।
৩৯। কবি কিশোর নজরুল (পশ্চিমবঙ্গ নজরুল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত) —এ. কিউ।
৪০। কাব্যজিজ্ঞাসা—অতুলচন্দ্র গুপ্ত।
৪১। হাজার বছরের বাংলা গান—সম্পাদনা, প্রভাতকুমার গোস্বামী।
৪২। যাত্রী—সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৪৩। রবীন্দ্রনাথের গান— ঐ।
৪৪। সময় ও সাহিত্য—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত।
৪৫। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (আধুনিক যুগ)—মুহম্মদ আব্দুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান।
৪৬। উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য—ত্রিপুরাশঙ্কর সেন।
৪৭। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সাহিত্যে বিদ্রোহের চিত্র—সুকুমার মিত্র।
৪৮। বাংলা লিরিকের গোড়ার কথা—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা—অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়।
৫০। কবিতার কথা—বিমলকৃষ্ণ সরকার।
৫১। মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতা—মুহম্মদ হাই ও আহমদ শরীফ।
৫২। মেঘদূত পরিচয়—পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য।
৫৩। সঙ্গীত পরিক্রমা—নারায়ণ চৌধুরী।
৫৪। কিশোর নজরুল—এম. আবদুর রহমান।

৫৫। নজরুল জীবনের প্রেমের এক অধ্যায়—সৈয়দ আলী আসরাফ (সম্পাদনা)।
৫৬। আমার শিল্পী জীবনের কথা—আব্বাসউদ্দীন আহ্‌মদ।
৫৭। ঠাকুর বাড়ির আঙিনায়—জসীমউদ্দিন।
৫৮। এখন যাঁদের দেখছি—হেমেন্দ্রকুমার রায়।
৫৯। আত্মস্মৃতি—সজনীকান্ত দাস।
৬০। নজরুলকে যেমন দেখেছি—শামসুর নাহার।
৬১। আমি যাঁদের দেখেছি—পরিমল গোস্বামী।
৬২। পথহারার পথ—বরদাচরণ মজুমদার।
৬৩। সিম্ফনি (বিদেশী প্রেমের কবিতা)—সম্পাদনা, সুকুমার ঘোষ।
৬৪। লেখকের কথা—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬৫। নজরুল পরিক্রমা—আবদুল আজীজ আল্ আমান।
৬৬। বাংলা উপন্যাসের কালান্তর—সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬৭। কবিতা কল্পনালতা - ঐ।
৬৮। আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ।
৬৯। পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি—বদরুদ্দীন উমর।
৭০। মার্কসবাদ ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন—শি[illegible] ঘোষ।
৭১। রবীন্দ্রসংগীতের নানা দিক—সম্পাদনা, অরুণ ভট্টাচার্য।
৭২। রবীন্দ্রসঙ্গীত—ডঃ প্রিয়ব্রত চৌধুরী।
৭৩। সঙ্গীত ও সংস্কৃতি (ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস), ১ম খণ্ড—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ।
৭৪। নজরুল গীতি (নজরুল একাডেমী, ঢাকায় প্রকাশিত), ১ম-৫ম খণ্ড।
৭৫। সাহিত্য ও সাহিত্যিক—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।
৭৬। বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা (১ম ও ২য় খণ্ড)—গোপাল হালদার।
৭৭। ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম (১ম খণ্ড)—সুপ্রকাশ রায়।
৭৮। দেশের কথা—শ্রীসখারাম দেউস্কর।
৭৯। নজরুলের সঙ্গে কারাগারে—নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী।
৮০। নজরুল কথা—শান্তিপদ সিংহ।
৮১। আনন্দমঠ—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৮২। উনবিংশ শতকের বাংলা—যোগেশচন্দ্র বাগল।
৮৩। ছেলেদের নজরুল—রমেন দাস।
৮৪। কবি নজরুল— সংস্কৃতি পরিষদ।

৮৫। বিদ্রোহী কবি নজরুল—বিশ্ব বিশ্বাস।
৮৬। কালের পুতুল—বুদ্ধদেব বসু।
৮৭। নজরুল কাব্য সমীক্ষা—আতাউর রহমান।
৮৮। নজরুল প্রতিভা পরিচিতি—অশোককুমার মিত্র।
৮৯। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ও বাংলা দেশ—সম্পাদনা, রঘুবীর চক্রবর্তী।
৯০। বিদ্রোহী কবি নজরুল—আবুল ফজল।
৯১। নজরুলকে যেমন দেখেছি—সামসুন নাহার মাহমুদ।
৯২। নজরুল গীতি সন্ধানে—আবদুস সাত্তার।
৯৩। নজরুলের বিচার—গাজী সামসুর রহমান।
৯৪। আমার জানা নজরুল—মীর্জাসুর রহমান।
৯৫। নজরুল-মানস সমীক্ষা—মো: মনিরুজ্জামান।
৯৬। নজরুল সাহিত্যের নব মূল্যায়ন—দবিরুদ্দীন আহ্‌মদ।
৯৭। অগ্নিবীণা বাজান যিনি—অশোক গুহ।
৯৮। আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ—আবু সয়ীদ আইয়ুব।
৯৯। কবি রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু।
১০০। বাংলার লোকসাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য।
১০১। সংস্কৃতির রূপান্তর—গোপাল হালদার।
১০২। কবিতার কথা ও অন্যান্য বিবেচনা—সৈয়দ আলী আহ্‌সান।
১০৩। নজরুল কাব্য পরিচিতি—ডঃ কাজী মোতাহার হোসেন।
১০৪। নজরুল সাহিত্য বিচার—শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ।

ইংরেজী

1. The Sacred Wood—T. S. Eliot.
2. Literary Essays of Ezra Pound (Edited with an Introduction by T. S. Eliot). Faber & Faber Limited, U. K.
3. Marxism and Poetry—George Thomson.
4. The Fire and the Fountain—John Press (An essay on poetry).
5. The Problem of Style—F. Middleton Murry.
6. The Chequered Shade—John Press (Reflections on obscurity in poetry).

7. Illusion and Reality—Christopher Caudwell (A study of the sources of poetry).
8. Kazi Nazrul Islam—Basudha Chakraborty.
9. Communism and Bengal's Freedom Movement—Gautam Chattopadhyay.
10. International Relations—Raghubir Chakraborty.
11. A History of Brajabuli Literature—Sukumar Sen.
12. On Poetry and Poets—T. S Eliot.
13 The Anatomy of Poetry—Marjorie Boulton.
14. Poetry an introduction to its form and art—Norman Friedman Charles A Mclaughlin.
15 The Wonder of Words—Isaac Goldburg (An introduction to language)
16. The Poet and the Politician and other Essays—Salvatore Quasimodo (Translat[illegible] by Thomas G. Gergin & Sergio Pacifici, with a preface by Harry T. Moore.)
17. An Introduction to Poetry—Jacob Korg.
18. Folk Tales of Bengal—Benoy K. Sarker
19. The Music of India (The Heritage of India Series, 1921)—H. A. Popley.
20. The Physics of Music (1945)—Alexander Wood.
21. History of Music (Benn's Series, 1930)—C. Percy Buck.
22. History of Music—Chappell.
23. Indian Music of Various Authors (Part 1 & 2, 2nd ed.1882).
24. The Music of India (London 1902)—Fyzee Rahamin, Atiya Begam.
25. Folk Music and Folklore (An Anthology) Vol. 1.—Published by Folk Music and Folklore Research Institute, Calcutta.
26 Grundriss Zur Geschichte der Provenzalischen Literatur—Karl Burtsch.

(Ref : Trobador poets selected from the poems of eight trobadors.)

27. Appreciation—Walter Pater.
28. Oxford Lectures on Poetry—A.C.Bradley.
29. The Economic History of India (Vol. 1 & 2)—R.C. Datta.
30. Kazi Nazrul Islam—Mizanur Rahaman.
31. Introducing Nazrul Islam—Serajul Islam Chowdhury.
32. The Art of Poetry—Paul Valery (Vinyage Books, New York).
33. The Singing Englishman—A. L. Lloyd (Working Men's Music Association, London.)
34. Kazi Nazrul Islam—Gopal Halder (Sahitya Akademi).

নির্ঘণ্ট

ভ

ম